বর্ষ—১৮ সংখ্যা—১

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

১।	শ্রীমা	শ্রীঅরবিন্দ	১
২।	মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	৩
৩।	রাধার আকৃতি	"	৯
৪।	কালিদাসের পার্শ্ব-চরিত্র	শ্রীঅরবিন্দ	১০
৫।	শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ	শ্রীনরেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত	১৩
৬।	মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	২৩
৭।	যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ	শ্রীঅনির্বাণ	৪৮
৮।	ময়ূর-নৃত্য (কবিতা)	নিশিকান্ত	৬৬
৯।	পরমক্ষণ (")	শ্রীনলিনীকান্ত সরকার	৬৯
১০।	জননী ( )	রবি গুপ্ত	৭০
১১।	দেব-প্রয়াস ( )	শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৭৬
১২।	রক্ষা-কবচ (গান)	অরুণা দেবী	৭৮

মূল্য—২৲ টাকা

33·'58-750

P30248

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

বর্ষ—১৮ সংখ্যা—২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৩ এপ্রিল, ১৯৫৮)

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা ১২

মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	১
সাধু ও শিল্পী	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩
মিরাবো	"	৮
যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ	শ্রীঅনির্বাণ	১৬
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	৩৬
কলিকাতায় শ্রীমার জন্মোৎসব	জয়ন্তী মৈত্র	৫৯

মূল্য—১৲ টাকা

281-'58-750

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

18/3

বর্ষ—১৮ সংখ্যা—৩

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা	১
ভগবতী জননী	শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত	৫
শ্রীঅরবিন্দ	"	৬
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	১১
যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	৩৩
ভারতীয় শিল্প	শ্রীঅরবিন্দ	৪২
শূদ্রবাজ	শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত	৪৪
বিশ্বধর্মগ্রন্থ—গীতা	শ্রীঅনিলবরণ রায়	৫৭
জাগরণ (গান)	মিশিকান্ত	৫৪
পরম প্রেমের সাধনা	শ্রীমলিনীকান্ত সরকার	৫৩

মূল্য—২৲ টাকা

598-'58-750

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

বর্ষ—১৮ সংখ্যা—৪

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪ নভেম্বর, ১৯৫৮)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

মায়ের প্রার্থনা	শ্রীমা
যোগের প্রথম পাঠ	শ্রীঅরবিন্দ
আত্মদর্শনের স্বাধীনতা সাধনা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা
চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি	শ্রীঅরবিন্দ
বাসবদত্তা	”
যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ	অনির্বাণ
প্রাণের সন্ধানে জগদীশচন্দ্র বসু	শ্রীঅরবিন্দ

মূল্য—১৲ টাকা

888-'58-750

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস, পণ্ডিচেরী

২১ ফেব্রুয়ারী

১৯৫৮

নিত্যপরিবর্তনশীল এক দেহের জন্মোৎসব হৃদয়ের কিছু নিষ্ঠাবৃত্তির তৃপ্তি দিতে পারে।

শাশ্বত চেতনার আবির্ভাব-উৎসব করা যেতে পারে বিশ্ব-ইতিহাসের প্রতি মুহূর্তে।

কিন্তু নূতন একটা জগতের, অতিমানস জগতের, আগমনী-উৎসব অপরূপ অনন্তসাধারণ অধিকার।

শ্রীমা

শ্রীমা'র হস্তাক্ষর

সংস্কৃত

(ঈশোপনিষদ—ফরাসী ভাষায় অনুবাদ সহ)

জাপানী

হিব্রু

ईशावास्योपनिषत्

हरिः ॐ ।

ईशा वास्यमिदꣳ सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॥१॥

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतꣳ समाः ।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।
ताꣳस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चाऽऽत्महनोजनाः ॥३॥

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूर्वमर्षत् ।
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥

तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५॥

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति।

सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं ततो विजुगुप्सते ॥ ६॥

यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥ ७॥

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरꣳ शुद्धमपापविद्धम्।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतोऽर्थान्व्यदधा-

-च्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८॥

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाꣳ रताः॥ ९॥

अन्यदेवाहुर्विद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया ।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयꣳ सह ।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥११॥

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यꣳ रताः ॥१२॥

अन्यदेवाऽऽहुः संभवादन्यदाहुरसंभवात् ।

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥

संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयꣳ सह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याऽमृतमश्नुते ॥१४॥

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥१५॥

पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह ।

तेजो यत्ते रूपं कल्याणतम तत्ते पश्यामि योऽ

सावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥१६॥

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त शरीरम् ।

ॐ क्रतो स्मर कृतꣳ स्मर क्रतो स्मर कृतꣳ स्मर॥१७॥

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि

विद्वान् ।

युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥

इत्युपनिषद् ॥ इति वाजसनेयसंहितोपनिषत्संपूर्णा ॥

ॐ पूर्णमदः० शिष्यते ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

寒暖笑答知
喜歌雲天話
力猿雉外内
花原貞壽金
圖多皆魚鯉
池供村丸紙
神岡。河銀
青形音男糸

先月（センゲツ）　着物（キモノ）　自分（ジブン）　一羽（イチワ）　何羽（ナンバ）

十羽（ジッパ）　太郎（タロウ）　天子（テンシ）　野原（ノハラ）　貞童（テイドウ）

壽男（ジュナン）　内地（ナイチ）　大勢（オウゼイ）　學ぶ（マナブ）　よって食い（ヨッテクイ）

平假名（ヒラガナ）　片假名（カタカナ）　交り文（マジリブン）　音符（オンプ）　朝鮮（チョウセン）

臺灣（タイワン）　半分（ハンブン）　目盛（メモリ）　反物（タンモノ）　農家（ノウカ）

時計（ジケイ）　小馬（コウマ）　田植（タウエ）　汽船（キセン）　方角（ホウガク）

א	aleph	a	1
ב	beth	b	2
ג	ghimel	g gh.	3
ד	daleth	d	4
ה	hé	e hé	5
ו	vav	o ou u	6
ז	zaïn	z	7
ח	heth	h hé	8
ט	teth	t	9
י	ïod	i	10
כ ך	caph	k	20
ל	lamed	l	30
מ ם	mém	m	40
נ ן	noun	n	50
ס	samech	s	60
ע	haïn	ho h	70
פ ף	phé	ph f	80
צ ץ	Tsad	ts	90
ק	cof	c k o	100
ר	resh	r	200
ש	chin	ch	300
ת	thav	th	400

Hébreu

শ্রীমা

(১)

মায়ের চেতনা হল ভাগবত চেতনা, তার থেকে যে আলো আসে সে হল ভাগবত চেতনার আলো। মায়ের আলো যে গ্রহণ করে, স্বীকার করে, তার মধ্যে যে বাস করে সে সকল স্তরের—মনের প্রাণের দেহের—সত্তা দেখতে আরম্ভ করবে। সে বর্জন করবে যা কিছু অদিব্য—অদিব্য হল তামসী শক্তিদের মিথ্যা, অজ্ঞান, ভ্রান্তি—অদিব্য হল যা কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভাগবত সত্যকে এবং তার আলো ও শক্তিকে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক যা কিছু। সুতরাং অদিব্য হল যা কিছু মায়ের আলো ও শক্তি স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। তাই সর্বদাই আমি তোমাদের বলি—মায়ের সঙ্গে, তাঁর আলো ও শক্তির সঙ্গে সংযোগ রাখ, কারণ শুধু তা হলেই বিশৃঙ্খলা আর অন্ধকার থেকে নিষ্কৃতি পাবে, গ্রহণ করতে পারবে ঊর্ধ্ব হতে আগত সত্যকে।

যখন একটা বিশেষ অর্থে আমরা বলি মায়ের আলো বা আমার আলো, তখন আমরা একটা বিশেষ অন্তঃস্থ ক্রিয়ার কথা বলি—বলি অতিমানস থেকে আসে যে আলো সব তাদের নিয়ে কথা। এ ধারার ক্রিয়ার মায়ের হল শুভ্র আলো—তার কাজ শুদ্ধ করা, জ্ঞানালোকিত করা, তা সত্যের স্বরূপ ও নিয়ম পৃথিবীকে নামিয়ে আনে, রূপান্তর সম্ভব করে তোলে। কিন্তু উপর থেকে, সমুচ্চতম ভাগবত সত্য থেকে যে-কিছু আলো আসে তা হল মায়েরই।

মায়ের পথ ও আমার পথে কোন পার্থক্য নাই। আমাদের পথ একই, চিরকাল ছিল, এক তা নিয়ে যায় অতিমানস রূপান্তর আর ভাগবত সিদ্ধির দিকে—শুধু অন্তে নয়, আদি থেকে তারা বরাবর একই।

ভগবান মানুষী রূপ ধারণ করেন, মানুষের এই স্থূল বাহ্যিক প্রকৃতির মধ্যেই আসেন, যাতে পথ চলে সে-পথ আবার মানুষকে দেখাতে পারেন—এতে তাঁর 'ভগবানত্ব' নাস্তি হয়ে যায় না। এ এক ক্রমস্ফুট প্রকাশ, ক্রমস্ফুট ভাগবত চেতনার প্রকাশ—একে বলা যায় না মানুষের ভগবান হয়ে ওঠা। মা শিশুকাল থেকেই ভিতরে মানুষের অনেক উপরে ছিলেন। তাই এ সম্পর্কে 'অনেকের' মতামত ভ্রান্ত।

* * *

এক শক্তি কাজ করে চলেছে এই বিশ্বে ও ব্যক্তির মধ্যে, তা আবার রয়েছে ব্যক্তি ও বিশ্ব অতিক্রম করে। মায়ের মধ্যে প্রমূর্ত এ সবই, তবে সশরীরে এখানে কর্মরত তিনি যাতে এই জড় পৃথিবীর উপরই তিনি নামিয়ে আনতে পারেন এক অপূর্ব জিনিস, যাতে জীবন এখানে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে—এই কারণেই 'মা'কে তোমার দেখা উচিত সেই উদ্দেশ্য-সাধনে রত দিব্যশক্তিরূপে। এই দেহেও তিনি তা-ই, তবে তাঁর আপন পূর্ণ চেতনায় ভগবানের সর্বাংশের সঙ্গে তিনি একীভূত, সকল রূপের সঙ্গে যুক্ত অভিন্ন।

* * *

মায়ের শুধু একটি মাত্র রূপ নয়, কালান্তরে বহু বিভিন্ন তাঁর রূপ।
এই স্থূল দেহের অন্তরালে মায়ের রয়েছে বহু রূপ, বহুবা শক্তি, বহুবিধ ব্যক্তিত্ব

* * *

মায়ের চেতনা আর আমার চেতনা এক, দুয়ের মধ্যে একই দিব্যচেতনা, লীলার জন্যই এরকমের প্রয়োজন। তাঁর জ্ঞান ও শক্তি ব্যতিরেকে কিছুই করা যায় না, তাঁর চেতনা ব্যতীত কিছুই ঘটতে পারে না। কেউ যদি তাঁর চেতনা অনুভব করে তবে তাকে বলতে চাই যে সে-চেতনার পশ্চাতে আমি রয়েছি, আর আমাকে অনুভব করলে মায়ের ক্ষেত্রেও ওই একই সত্য।*

শ্রীঅরবিন্দ

---

* "Sri Aurobindo on the Mother" থেকে।

মায়ের প্রার্থনা

ডিসেম্বর ৮, ১৯১৬

আজ সকালে আমাদের এই আলাপ হল, ভগবান তোমার প্রেরণার যাদুকাঠি দিয়ে প্রাণ-সত্তাকে তুমি জাগালে, বললে তাকে : "ওঠ জেগে, দৃঢ় সঙ্কল্পের ধনুকে গুণ টেনে ধর, কর্ম্মের সময় আসছে ওই"। প্রাণ-সত্তা তখনি জেগে, উঠে বসল, হাত-পা ছড়িয়ে নিল, ঝেড়ে ফেলে দিল সুদীর্ঘ তন্দ্রার ধূলিরাশি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তৎপরতা দেখে সে বুঝলে যে চিরকালই ছিল সে বলিষ্ঠ কর্ম্মোন্মুখ। তোমার সর্ব্বজ্ঞতা ডাকে তাই অফুরন্ত বিশ্বাস নিয়ে সাড়া দিল সে "এই যে আমি, ভগবান, কি চাও তুমি আমাকে দিয়ে?" কিন্তু কোন উত্তর হবার আগেই মন এগিয়ে এল তার কথা বলবার জন্যে, জানাতে হয়ে জানালে তার আনুগত্য, বললে : "তুমি জান ত ভগবান, আমি তোমার কাছে সমর্পিত, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি তোমার সমুচ্চ ইচ্ছার একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ যন্ত্র হয়ে চলতে। কিন্তু আমি পৃথিবীর উপর দৃষ্টি-পাত করি যখন, দেখি মানুষের কর্ম্মক্ষেত্র, যতই তা বৃহৎ হোক না, সদাসর্ব্বদাই দারুণ সঙ্কীর্ণ। যে মানুষ মনে, এমন কি প্রাণেও, বিশ্বের মত, অন্ততঃ পৃথিবীর মত বিশাল, সে যখন কর্ম্ম সুরু করে, তখনই আপনাকে বেঁধে ফেলে স্থূল কর্ম্মের সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে, তার ক্ষেত্র যেমন ফলও তেমন হয় একান্ত সীমাবদ্ধ। ধর্ম্ম-স্থাপয়িতা হোক, রাজনীতিক সংস্কারক হোক, কর্ম্মে যে লিপ্ত হয়, সে হয়ে পড়ে বৃহদায়তন এক সৌধের ক্ষুদ্র নগণ্য একখানি ইষ্টক, মানব-জাতির কর্ম্মাবলীর বিপুল বালিয়াড়িতে বালু-কণা মাত্র। আমি ত দেখি না করবার মত উপযুক্ত কর্ম্ম এমন কি আছে যার মধ্যে সমগ্র সত্তাটি একমুখী হয়ে সমাহিত থাকতে পারে, তার অস্তিত্বের হেতু বলে গ্রহণ করতে পারে? প্রাণ-পুরুষ এ রকম অভিযানে খুসী হতে পারে, কিন্তু তোমার সান্নিধ্যের সচেতন যন্ত্র যে তার পক্ষে অনুচিত একটা শোচনীয় অভি-যানের মধ্যে তাকে ছেড়ে দিতে হবে কি?"—"ভয় নাই"—উত্তর এল—"প্রাণ সত্তাকে কর্ম্ম সুরু করতে দেওয়া হবে না, তোমারও সংগঠন-সামর্থ্যের সমস্ত প্রয়াসকে প্রয়োগ করতে বলা হবে না, যতক্ষণ না প্রস্তাবিত কর্ম্ম এতখানি বিশাল ও সম্পূর্ণাঙ্গ না হয়ে ওঠে যাতে সত্তার যাবতীয় গুণগুলি পূর্ণভাবে যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করতে পারে। কাজটি ঠিক কি হবে, তা তুমি জানবে যখন তা এসে উপস্থিত হবে। কিন্তু এখন থেকেই আমি তোমাকে জানিয়ে রাখি, যাতে তুমি তার জন্যে তৈরী থাকতে পার, তাকে ঠেলে না সরিয়ে দাও। আমি তোমাকে—আর প্রাণসত্তাকেও—জানিয়ে রাখি অনুদ্বেল সাম্যময় শান্তিময় ক্ষুদ্র জীবনের দিন চলে যাবে, দেখা দেবে প্রয়াসের, বিপদের, অপ্রত্যাশিতের, অব্যবস্থার অথচ তীব্রতার যুগ; এই ব্রতের জন্যেই তুমি তৈরী হয়েছ। এত সহস্র বছর ধরে তুমি সে-কথা ভুলে থাকতে

রাজি হয়েছিলে, কারণ সময় হয় নি, তুমিও তৈরী ছিলে না, কিন্তু এখন এই চেতনা নিয়ে জেগে ওঠ যে এই হল তোমার সত্যকার ব্রত, এরই জন্যে তুমি সৃষ্ট হয়েছিলে।"

প্রাণ-সত্তা সর্ব্বপ্রথম সে-চেতনা নিয়ে জেগে উঠল, তার স্বভাব-জনিত উৎসাহে বলে উঠল, "আমি তৈরী, ভগবান। আমার উপর তুমি নির্ভর করতে পার"। মন দুর্ব্বল ও ভীরু কিন্তু, যদিও অনুগত, সে বলল আরো, "তুমি যা চাও, আমিও তাই চাই, তুমি ত জান, ভগবান, আমি সম্পূর্ণভাবে তোমারি। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুযায়ী যোগ্যতা আমার আছে কি? প্রাণ-সত্তা যা বাস্তব করে তুলতে সমর্থ, আমার শক্তি আছে কি তাকে সুব্যবস্থিত করে ধরতে?" "এরই জন্যে ত তোমাকে তৈরী করে তুলছি আমি, এরই জন্যে ত তুমি নিজেকে সুনম্য করে সমৃদ্ধ করে ধরবার একটা সাধনার ভিতর দিয়ে চলেছ। কোন রকম কষ্টপ্রয়াস করতে যেও না—প্রয়োজন অনুসারে শক্তি আসে। প্রাণ-সত্তার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও নিজেকে ছোট ছোট সব কাজকর্ম্মে আবদ্ধ রেখেছিলে—তখন এ রকমের প্রয়োজন ছিল বলে, তৈরী হয়ে উঠবে যে-সব জিনিস, তৈরী হওয়ার জন্যে তাদের সময় দেওয়া দরকার বলে। কিন্তু ঠিক এই কারণে তুমি যে সে-সব ক্ষুদ্রতা পার হয়ে এসে তোমার সত্যকার আকারের উপযুক্ত কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বাস করতে পার না, তা নয়। অনন্ত কাল ধরেই ত তোমাকে আমি নির্ব্বাচিত করে রেখেছি, পৃথিবীর উপর তুমি আমার অপ্রতিম প্রতিভূ হয়ে থাকবে, অদৃশ্যভাবে গোপনভাবে নয়, প্রত্যক্ষভাবে, সকল মানুষের চক্ষুর সম্মুখে। যা হবার জন্যে তুমি সৃষ্ট হয়েছিলে তাই তুমি হবে।"

ভগবান, ভগবান, চিরকাল হয় যেমন, গভীরের বাণী তোমার নীরব হল আর তোমার মহামহিমময় সর্ব্বশক্তিময় আশীর্ব্বাদ আমাকে সর্ব্বতোভাবে ঘিরে রইল।

ক্ষণেকের জন্য যন্ত্রী ও যন্ত্র হয়ে গেল এক—শাশ্বত অনন্ত অদ্বিতীয়।

ডিসেম্বর ৯, ১৯১৬

ধ্যান থেকে উঠবার বহুক্ষণ পরে আমার বোধগম্য হল কি ধরণের জিনিস তা হয়েছিল।

আজও সন্ধ্যায় আর একবার আমি সেই অবস্থার মধ্যে গিয়ে পৌঁছিলাম, যেখানে চেতনা আপনাকে ছড়িয়ে দেয় নানাবিধ উপাদানের বৈপুল্যের মধ্যে, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত চেতনার বিবিধ কেন্দ্রের মধ্যে, কোন একটা কর্ম্মবিশেষ, অথবা সে-সব উপাদানের যত কিছু কাজ রয়েছে তা উদ্‌যাপন করতে।

বিদ্যুৎ-চমকের মত এক একটা বিশেষ বিন্দু হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে, তারপর মিলিয়ে যায়, আর একটির জন্য স্থান করে দেয়। চেতনার প্রত্যেক উপাদানটির পরিষ্কার জ্ঞান রয়েছে কি কাজ সে করছে: তবে সেই সঙ্গে আবার সমগ্রের জ্ঞান রাখা অসম্ভবই বোধ হয়, কারণ

তা হলে, সে-চেতনা অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে যার কর্ম নিষ্পাদনের জন্যে তার প্রয়োজনও হয় না।

ডিসেম্বর ১০, ১৯১৬

সময়ে সময়ে বাহ্যতঃ যা দুর্বলতা তাই তোমার কাজের বেশি সহায় হয়, ভগবান, একটা সুস্পষ্ট পরিপূর্ণতার চেয়ে। প্রকাশ্য পরিপূর্ণতা হতে পারে কেবল তারই তুষণ যে জগৎ থেকে এবং জগতের কর্ম থেকেও আপনাকে সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তুমি যাকে নির্বাচন করেছ পৃথিবীতে তোমার কর্মীরূপে, আমি স্পষ্টই দেখি, তার কোন কোন দুর্বলতা, কোন কোন ত্রুটি (অবশ্য তা হওয়া দরকার বাহিরের শুধু, সত্যকার নয়) তোমার দৃষ্টি অনুসারে যেন বেশি সাহায্য করে, সুতরাং তারা হল যেন পরিপূর্ণতার চেয়েও বেশি পরিপূর্ণ। পরিপূর্ণতার বাহ্যরূপকে ত্যাগ করা অর্থ বিচ্ছিন্ন আনিষের অজ্ঞান পূর্ণ ত্যাগ করা।

এই জন্যেই কি, ভগবান, সম্পূর্ণ একত্বের, পরিপূর্ণ চেতনার আত্মহারা আনন্দ তুমি আমায় এত অল্প দিয়ে থাক?

এক সময়ে তুমি আমায় অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়েছিলে। তুমি তোমার সান্নিধ্যে আমায় নিরন্তর থাকতে দিয়েছ...কিন্তু এখন মনে হয় যেন তুমি আমাকে শিক্ষা দিতে চাও, আধারের মধ্যেই অক্ষত আনন্দ কি রকম লাভ হয়, চেতনা আর অচেতনার পছন্দ-অপছন্দ না থাকে।

সকল বাসনা নির্মুক্ত হয়েও বাসনাযুক্ত জীবন যাদের তাদের অবস্থায় ডুবে যাওয়া... কি অদ্ভুত জিনিস!

কিন্তু সব চেয়ে অদ্ভুত হল সেখানেও আমি সমানে স্থির শান্ত তৃপ্ত। এই আঁধারেরই মধ্যে রয়েছে এক মহান শক্তি আমি বোধ করছি, আর এই রাত্রির গর্ভেই শোনা যেতে পারে স্বর্গের অনুপম সুর সব।

ভগবান, তোমার রাজ্যে আমাদের প্রতি পদক্ষেপে দেখা দেয় নূতন নূতন আশ্চর্যের হেতু।

ডিসেম্বর ১২, ১৯১৬

মন আমার চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিল, সদাসর্বদা সে এমন সব ক্ষুদ্র জিনিস নিয়ে পড়ে থাকে, আশু প্রয়োজনের, এমন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে চলা-ফেরা করে তা দেখে।

সকলের মধ্যে তোমাকে সে দেখতে শিখেছে, ভগবান, অতি ক্ষুদ্রতম জিনিসের মধ্যে তোমাকে দেখে, আনন্দ পায় তোমাতেই। কিন্তু তোমাতেই যদি আনন্দময় সে, তুচ্ছ হোক

আর বিপুল মহান হোক, সকল জিনিসের মধ্যে সকল ঘটনার মধ্যে যখন তোমাকেই সে চিনে নিতে পারে, তাহ'লে কতকগুলির চেয়ে আর কতকগুলি প্রাধান্যলাভ করবে কি করকে? এই ঝোঁকটার বিরুদ্ধে, প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে কতবার সে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে, মাসের পর মাস, কিন্তু সংগ্রামই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে—তার কারণ কি এই যে, তোমার ইচ্ছাই হল এ-রকমটি হোক, না মনের পক্ষে অন্যরকম হওয়া অসম্ভব? এ প্রশ্ন সে করছে, কিন্তু যেমন চিরকাল, তোমার হাসি এসে তাকে সান্ত্বনা দিল, কিন্তু সুস্পষ্ট উত্তর কিছু শোনা গেল না।

তবে এখন এ-মনের পক্ষে ক্ষুদ্রতম জিনিসও অতল রহস্যময় হয়ে উঠছে, প্রত্যেক বস্তুই নিত্য-নূতন আশ্চর্য্যের হেতু হয়ে উঠেছে।

ডিসেম্বর ১৫, ১৯১৬

আমার নতি, আমার প্রণতি গ্রহণ কর, ভগবান। আমি আর লিখব না, তুমি আমাকে বললে এসে, এখনকার ধ্যানের বিষয়ে একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, "আমাদের দুজনার যে গোপনে আলাপ হল, তা যেন তোমার নিজেরও বাহ্যশ্রবণ শুনতে না পায়।"

ডিসেম্বর ২০, ১৯১৬

দিন গেল, ঝড়ের বিক্ষোভের দিন সব—বাহ্যদৃষ্টিতে অন্ততঃ—কিন্তু অন্তরের বাস্তব সত্তায়, তা রয়েছে প্রশান্ত সবর্ব, সেখানে প্রতিফলিত ভাগবত ইচ্ছা। দিন সব গেল, প্রসারিত প্রকাশিত পরিপুষ্ট করে দিয়ে গেল আর একবার তোমার অশ্রান্ত দিব্যলীলার অপ্রত্যাশিত বৈচিত্র্যময় সমস্ত বৈভব। আর কি অপরূপ আশ্চর্য্যের তা, দেখি যেন তোমার শাশ্বত দিব্য ইচ্ছায় সৃষ্ট সব গতিধারা পরস্পরের মধ্যে ওতপ্রোত অনন্তভাবে—যখন এ জ্ঞান হয় সে-সমস্ত রয়েছে শাশ্বতকাল ধরে, শুধু আমাদের অপূর্ণ বুদ্ধিসকলের কাছে তা হয়ে ওঠে বস্তুরাজির নিরবচ্ছিন্ন পারম্পর্য্য, তার মধ্যে আমরা সহযোগী কিন্তু অজ্ঞান কর্ম্মীমাত্র। যাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাদেরই মত কর্ম্ম করে চলেছি আমিও অবচেতনভাবে অন্ধভাবে—তবুও আমি জানি, কর্ম্মী হলেও আমি আবার দ্রষ্টা। কিন্তু আমি এখনো ত তেমন বিশুদ্ধ হয়ে উঠি নি, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সম্মুখে ফল বা পরিণাম যা হবে তা সব সমগ্রভাবে খুলে ধরতে পার। কিন্তু কর্ম্ম করবার পূর্ব্বে ত আমি কেবল আংশিক ও অসম্পূর্ণভাবেই জানতে পাই, আর কাজ কেন করছি, তুমিই বা আমার কাছে থেকে কি চাও, তার সম্যক চেতনাও আমি পাই আংশিক ও অসম্পূর্ণভাবে। কবে আমার হবে সে শুদ্ধি, ভগবান! কিন্তু তার জন্যেও আমি আর অধীর নই, তাও তোমার কাছে আমি যাচঞা করি না। আমি ত দেখছি

এই তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর যন্ত্রটির মধ্যে তোমার বৈভব কি পরিমাণে আবৃত ও আচ্ছন্ন হয়ে আছে—কিন্তু তুমি, তুমি ত জান, কেন এ রকম—এই যত আঁধার দুর্বলতা, সে-সবও তুমি তোমার কাজে লাগাও, তোমার শাশ্বত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

যতটুকু তোমায় সে জানতে পারে বুঝতে পারে তারই সম্মুখে অন্তরাত্মা আমার প্রার্থনা-নিরত প্রেমভরে আনত। প্রার্থনা-নিরত অন্তরাত্মা আমার তোমার কাছে, নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে, এমন সর্বোচ্চ প্রবেগ-ভরে যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল অতিনু একাত্মতা। অন্তরাত্মা আমার প্রার্থনায় নিরত—আমার দেহ ও মন নীরব, মহানন্দের মৌনের মধ্যে।

(ধ্যানের পর বিকাল সাড়ে পাঁচটায় এই বাণী এল)

"আমার দিকে তুমি ফিরেছ যখন, তোমাকে তবে বলি আজ এই সন্ধ্যায়। তোমার হৃদয়ের মধ্যে আমি দেখছি রয়েছে একখণ্ড হীরক, তার চারদিকে ঘিরে সোনার আলো। শুদ্ধ ও তপ্ত সে জিনিস, প্রকাশ করে নির্ব্যাক্তিক প্রেম—কিন্তু এমন যে রত্ন তাকে কেন তুমি বন্ধ করে রেখেছ একটা কৃষ্ণাভ পেটিকার ভিতরে, গাঢ় লালের মোড়কে ঘিরে, তার সব উপর-কার আবরণটি হল অনুজ্জ্বল নিবিড় নীল, যেন সত্যকার অন্ধকারের বসন। দেখে মনে হয় তোমার প্রভা প্রকাশ করে দেখাতে তুমি যেন ভয় কর। প্রকাশ করে ধর তোমার জ্যোতি, ঝড়কে ভয় কোরো না—ঝড় অবশ্য তীর থেকে আমাদের বহুদূরে নিয়ে যায়, কিন্তু তাতে আমাদের দেখা হয় বিশ্বজগৎ। স্নেহভালবাসায় মিতব্যয়ী কেন তুমি হতে চাও? প্রেমের প্রস্রবণ ত অন্তহীন। তোমার ভয় হয় লোকে তোমাকে বুঝবে না? কিন্তু কোথায় দেখেছ মানুষে বুঝেছে ভগবানকে? চিরন্তন সত্য তোমার মধ্যে পায় যদি এমন কিছু যাকে ধরে সে আত্ম-প্রকাশ করতে পারে, তবে আর সব দেখবার তোমার কি প্রয়োজন? তুমি হলে তীর্থ-যাত্রীর মত, মন্দির থেকে বের হয়েছ, দরজায় দাঁড়িয়ে, সম্মুখে সব জনতার ভীড়—ইতস্তত: করছে সে, তার অমূল্য গুপ্তধনটি, তার পরম আবিষ্কার খুলে ধরবে কি না। শোন তবে, আমিও ইতস্তত: করেছি দিনের পর দিন—কারণ, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি দিয়ে আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম আমার বাণী, আমার বাণীর পরিণাম কি হবে শেষে—বুঝবার ও বুঝবার ক্ষমতালোপ। কিন্তু তবুও ত আমি পৃথিবীর দিকে, মানুষের দিকে ফিরেছি, আমার বাণী তাদের আমি দিয়েছি। "পৃথিবীর দিকে, মানুষের দিকে ফিরে দাঁড়াও"—এই আদেশই কি সর্ব্বদা তুমি শুনছ না তোমার হৃদয়ের মধ্যে,—হৃদয়ের মধ্যে, কারণ হৃদয়ই ত বয়ে নিয়ে আসে কৃপার আশার যারা তৃষিত হয়ে আছে তাদের জন্যে মঙ্গল-বাণী। ঐ যে হীরকখণ্ড তাকে এখন থেকে আর কিছুতেই আক্রমণ করতে পারবে না, অনাক্রম্যণীয় সে বস্তু, তার গঠন এমন নিখুঁৎ, এমন মধুর আলো তা থেকে বিচ্ছুরিত যে তাতে মানুষের প্রাণে বহু জিনিসই পরিবর্ত্তিত হয়ে যেতে পারে। নিজের সামর্থ্যে সন্দেহ তোমার, নিজের অজ্ঞানে ভয় তোমার? ঠিক ঐ জিনিসটাই ত বাহিরে

একটা কালো আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছে। তুমি সংশয়াকুল, ভয়-বিহ্বল গুপ্তরহস্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে—তোমার কাছে প্রকাশের রহস্য অনস্তস্থিতির রহস্যের চেয়ে ভীষণতর অপরিমেয় হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সাহসে ভর করে দাঁড়াতে হবে, গভীরের আজ্ঞা পালন করতে হবে। তোমাকে আমি জানি ও ভালবাসি, তুমিও যেমন আমাকে জান ও ভালবাস, তাই ত আমি এসেছি এই, তোমার দৃষ্টির সম্মুখে দেখা দিয়েছি সুস্পষ্ট রূপ ধরে, যাতে আমার কথায় তোমার কোন সন্দেহ না হয়। আর তোমার নিজের দৃষ্টির কাছেও ধরে দিলাম তোমার হৃদয়কে, যাতে তুমি দেখতে পাও পরমসত্য চান কি ধাতে আর সেখানে যাতে তুমি আবিষ্কার করতে পার তোমার আপন সত্তার দিব্যবিধানকে—জিনিসটি তোমার কাছে এখনো কঠিন বলে বোধ হয়, কিন্তু একদিন আসবে যখন তুমি জিজ্ঞাসা করবে এতদিন ধরে কেমন করে সব ছিল বিপরীত ধরণের!"

—শাক্যমুনি—

রাধার আকূতি*

শ্রীমা

যখনি তুলিনু আঁখি শু-মুখের পানে,
জানিলাম,—
তুমিই আমার পরম দেবতা,
সব-ছাওয়া হে আমার সত্তার ঈশ্বর!
লও, ওগো, লও মোর প্রাণের আহুতি।

আমার ভাবনা যত, আমার আবেগ,
হৃদয়ের উল্লসিত যত রসাপ্লুত,
ইন্দ্রিয়ের যা-কিছু বেদন,
জীবনে যে ছন্দের স্পন্দন,
এ-তনুর প্রতি অণু,
ধমনীর প্রতি রক্তকণা···
তারা যে তোমারই বঁধু, আমার তো নয়···
তোমারই যে তারা!

অবিশেষে তোমারই যে আমি···
কেবলই তোমার···
কুণ্ঠাহীন আত্মনিবেদনে ওগো তোমার···তোমার।
কী চাও আমার মাঝে?
বল···বল···তা-ই হব আমি।

কি দেবে আমারে তুমি?
মৃত্যু না জীবন, উল্লাস না শোক?
সুখ দেবে? দুঃখ দেবে?
যা দাও আপন হাতে, ওগো বঁধু,
তা-ই আমি বুকে তুলে লব।

যা-কিছু দাও না তুমি,
দ্যুলোকের নির্মালা সে—আনিবে বহিয়া
এ-হৃদয়ে নিতা শুধু অমৃতম আনন্দরভস॥

---

* ইংরাজি "Radha's Prayer"-এর অনুবাদ। অনুবাদক—অমিবাবু

কালিদাসের পার্শ্ব-চরিত্র

শ্রীঅরবিন্দ

এক হলেন কবি হয়ে যিনি নাটকের উদ্যানে অনধিকার-প্রবেশ করেছেন, অন্য হলেন স্বাভাবিক নাট্যকার ; শেষোক্ত শিল্পী তাঁর অপ্রধান চরিত্রগুলি চিত্রণে পর্যন্ত গভীর মনো-নিবেশ করেছেন। সত্যকার শিল্পীর কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়—বৃহৎ পটভূমিকায় বহুস্তর চরিত্রের সম্পর্কে যেমন ক্ষুদ্র পরিসরে সামান্যতম চরিত্রের ক্ষেত্রেও তেমনই তিনি প্রয়োগ করেন তাঁর শিল্পসাধনার সমগ্র নিষ্ঠা। শেক্‌স্‌পীয়র তো প্রাণের প্রাচুর্যে ভরে তুলেছেন তাঁর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র লোকটিকে ; তবে এর মূলে ছিল শেক্‌স্‌পীয়রেরই এক অমিত সৃজনীশক্তি। ভগবান যেমন বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন অনায়াসে, ইংরেজ কবিও তেমনি জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করেছেন অনা-য়াসে, এ না করে তাঁর উপায় ছিল না, এ তাঁর স্বভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল, তাই তার প্রকাশও অনিবার্য। তবে কালিদাসের সদাসতর্ক সদাপ্রসন্ন নাট্যপ্রতিভাতে নেই ঐশ্বরিক প্রাচুর্য—তাই লক্ষ্য করা যায় তাঁর সকল নাটকে সর্বদা রয়েছে শিল্পের এক উঁচু পর্দায় সুর বাঁধা। 'উর্বশী' নাটকে রাণী ঔশিনরী এই চমৎকার শিল্পের সেরা নিদর্শন ; তুলির কয়েকটি মাত্র টানে আঁকা অপ্সরাবৃন্দ খুঁটিয়ে দেখলে দেখি তার মধ্যেও পড়েছে শিল্পীর সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং সজাগ সতর্ক অভিনিবেশ ; তাদের প্রতিটি কথা সুনির্বাচিত—প্রতিটি সুর প্রতিটি ছন্দ প্রতিটি ভঙ্গিতে লেগে রয়েছে একটা প্রতিভার সুকুমার ও বিচিত্র স্পর্শ। চিত্রপটের এক কোণে ভীড় করে একদল উচ্ছল চরিত্র—এক তাদের অর্থ, এক তাদের পরিস্থিতি, এক তাদের স্বভাব, পার্থক্যের বড় একটা অবকাশ নেই তাদের মধ্যে ; তাহলেও দুই ভগিনীর মুখাবয়ব অভিন্ন নয়, প্রত্যেকের কথার পশ্চাতে নিজস্ব ব্যক্তিত্বটি পরিস্ফুট। বাক্‌বিদগ্ধ ও উন্নতশির যেমনকার আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে রম্ভার কত প্রভেদ—রম্ভা ভীরু, উৎসাহী অথচ অল্পেই হতাশ, স্নেহের ক্ষেত্রে অভিসারের ক্ষেত্রে যখন-তখন তার উচ্ছল আত্মপ্রকাশ। সহজন্যা আবার এদের চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির—স্বল্পভাষী, কিছু কম কল্পনাপ্রবণ এবং অধিকতর বাস্তববাদী সে, তবে তার প্রকৃতিতে রয়েছে এক নিবিড় ঋজুস্রোত। দানবের পলায়ন-পথ পুরুরবাকে বলে দিয়েছে এই সহজন্যাই, তারপর ভগিনীদের শঙ্কাকুল আলাপের সমস্তক্ষণই সে নির্বাক, তারপর পুরুরবার অন্তর্ধানের বাস্তব ঘটনাটি উঠতেই আবার তার কথা। এ-সংবাদও সে-ই দিয়েছে প্রথম। তার কথা সংক্ষিপ্ত, তবে অর্থপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক। যে কটি সামান্য কথা সে বলেছে তাতে রয়েছে ভরসার, আন্তরিকতার এবং সানর্ঘ্যের আভাস। তার কণ্ঠ আমাদের পরিচিত—চতুর্থ অঙ্কে পুনর্বার তাকে চিনতে আমাদের কষ্ট হয় না। তার বিশেষ

মনোভাবটি উল্লেখযোগ্য—সাহায্য করতে পারবে না বলে বৃথা বিলাপে সময় নষ্ট করতে সে চায় না। প্রেমিক-প্রেমিকাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে নিয়তি—নিয়তিই তাদের মিলন ঘটিয়ে দেবে। এই আশার কথা বলে হাতের কাজে মন দিয়েছে সে।

চিত্রলেখা অন্যান্য অপ্সরাদের চেয়ে সৌভাগ্যবতী—উর্বশীর সখী হিসাবে তিন অঙ্ক জুড়ে চিত্রপটের অনেকখানি সে অধিকার করেছে; তবে এই সৌভাগ্যই তার দুর্ভাগ্য হয়ে দাঁড়াল—সখীর উজ্জ্বলতর আলোর পাশে তাকে কিছু নিষ্প্রভ দেখাতে হবেই। নাটকের প্রয়োজনেই তাকে অতি-স্পষ্ট করে আঁকা যায় না—তাতে উর্বশীর পরিবর্তে তারই দিকে পাঠকের দৃষ্টি বেশি আকৃষ্ট হতে পারে। এত বিধি-নিষেধের মধ্যেও তার ব্যক্তিরূপটি বেশ ফুটে উঠেছে। অবশ্যই তার উদার স্নেহ, তার লীলাচপল সহানুভূতি, ক্ষণে-ক্ষণে সপ্রেম অধৈর্য প্রকাশ এবং বিজ্ঞতাপূর্ণ উপদেশ দান—সে-বিজ্ঞ উপদেশ প্রত্যাখ্যানে সে কিছুমাত্র বিচলিত নয়,—উর্বশীর আগ্রহ এবং অস্থিরতায় তার সস্মিত সম্মতি, প্রায় জ্যেষ্ঠা ভগিনীর একটা অভিভাবিকা-সুলভ ভাবভঙ্গি তাকে দিয়েছে অনুপম সৌন্দর্য ও মাধুর্য; তার বাক্যে আচরণে সর্বদা প্রস্ফুট অপ্সরাদের স্বর্গীয় সুষমা, লাবণ্য এবং কমনীয়তা। অপ্সরা-দলের বাহিরে সন্ন্যাসিনী সত্যবতী আর একটি কিঞ্চিৎ অপ্রধান অথচ সমান সুন্দর মূর্তি—তিনি শ্রদ্ধেয়া, সদয়া এবং আত্মসংযম অভ্যাসের ফলে খানিকটা যেন নিস্পৃহ। তবে এসবের মধ্যে দিয়েই ভাস্বর তাঁর মাতৃভাব ও বন্ধুভাব। মানবীয়তার অবলিন মাধুর্য কালিদাসের বৈশিষ্ট্য—তা তাঁর সকল নাটকের দিয়েছে একটা পরিবেশ, তা-ই আবার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে মালবিকাগ্নিমিত্র-র তপশ্চারিণী দুর্ভাগা বিদুষী সত্যবতী এবং কণ্বমুনির মতো সন্ন্যাসীর মধ্যে। নারী-চরিত্রের মধ্যে লঘুতর দিকটির সুন্দর পরিচয় বহন করে আনছে নিপুণিকা—চতুরিকা এবং প্রিয়ম্বদাধিনী নিপুণিকা। পারিপার্শ্বিক সংঘর্ষের মধ্যে কারো ক্ষতি না করে সে দাঁড়িয়ে চাতুর্যের প্রতিমূর্তি হিসাবে, রসবোধের জহুরী হিসাবে। পুরুষ-চরিত্রগুলি আঁকা আরো লঘু রেখায়—সে-রীতি একান্তই কালিদাসের নিজস্ব—তারা নারী-চরিত্রগুলির মতো ততো দৃঢ়মূর্ত নয়। সারথি এবং মৃগয়ার্থীরা অবশ্য সুস্পষ্ট আলেখ্য—তাদের কথাবার্তা অল্প, তবে তারা বিশেষ হয়ে উঠেছে পুরুরবার সঙ্গে নিত্য-সাহচর্যের ফলে তাদের আলাপের উপর পড়েছে সে স্বর্গাভার প্রতিচ্ছায়া তার দ্বারা। মানবক এবং আয়ু-র বিশেষ উল্লেখ করতে হয়—যদিও চরিত্র হিসাবে ততো না যতো তাদের স্থান হিসাবে—একটি কালিদাসের শিল্প-জীবনের শ্রীবৃদ্ধির ইতিহাসে, আর একটি সেই বহুল লাঞ্ছনা-প্রমাণের অন্তর্গত যা দেখিয়ে দেয় কালিদাস চরিত্র-চিত্রণে এনেছেন কী সৌকুমার্য, প্রায়-কৃপণ কী কঠোর ভাষা-সংযম যার সাহায্যে তাঁর নাটকে তুচ্ছকেও মহৎ, সামান্যকেও সুন্দর এবং মৃতকল্পকেও বৃহৎ সম্ভাবনাপূর্ণ করে তুলেছেন। বহু বৎসরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিশ্বাসী রাজমন্ত্রী অপরূপ তাঁর হাতে ফুটে উঠেছে এক কারুণ্য-প্রলেপে সিক্ত; এই বয়োজীর্ণ শ্রদ্ধেয় মূর্তির পরকেশ বারংবার এসেছে স্মরণ করিয়ে দিতে এক অন্তিম বিষাদের

কথা। নাটকে প্রচলিত ও সুপরিচিত এই চরিত্র এখানে কিন্তু একান্তই কালিদাসের নিজস্ব। পুরুরবা তপস্যার জন্যে বনবাসী হতে চলেছেন, পুত্রের অভিষেক উদ্যোগের আদেশ দিয়েছেন তিনি। তার উত্তরে করুণ সম্মতি এল তাঁর—'তথাস্তু'; এই একটি কথা এই বৃদ্ধকে মানুষী অনুভূতিতে আপূর্ণ করে দিয়েছে। ক্লান্ত বৃদ্ধকে এই শেষ দানও বহন করতে হবে। যে-প্রভুকে বার্ধক্যে পর্যন্ত সেবা করেছেন, যাঁর রাজ্য ও রাজত্ব পরিচালনার সঙ্গে তাঁর কতো স্মৃতি বিজড়িত তিনি আজ বিদায় গ্রহণ করছেন, আর সেই আসনে উপবেশন করছে এক অপরিচিত তরুণ। এই পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনও হারাবে সকল অর্থ। তবু তিনি প্রতিদিনকার প্রতিজ্ঞা শেষ বার উচ্চারণ করবেন বলে এসেছেন—'তথাস্তু' তাঁর বিশ্বস্ততায় সর্বত্যাগীর বিষণ্ণতা—নূতন পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন বর্ণাঢ্য প্রতিজ্ঞার বাণী করুণতর হয়ে বাজে,—'তথাস্তু'।*

* Kalidasa (2nd Series) থেকে।

শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীনরেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত

শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা আলোচনা করার পূর্বে ভূমিকা হিসাবে বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষা-ব্যবস্থা ও প্রাচীন ভারতের শিক্ষার কথা অতি সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন। মাত্র একশত বছর পূর্বেও যে শিক্ষা-পদ্ধতি জগতে প্রচলিত ছিল বর্তমানে তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

পূর্বে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মস্তিষ্কের শ্রীবৃদ্ধিসাধন (Intellectual development)। অর্থাৎ শিশুর ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে যে কোন প্রকারে নানা বিষয়বস্তু প্রবেশ করান। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার উদ্দেশ্য—শিশুর জীবনে তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ। তাই বর্তমান শিক্ষায় গোটা মানুষের পরিবর্ধনেরই কথা বিবেচনা করা হয়েছে। মানব-জীবনের—শারীরিক (physical), মানসিক (mental), ভাবমূলক (emotional), ইচ্ছামূলক (volitional), সৌন্দর্যমূলক (aesthetic), নৈতিক (moral), ও আধ্যাত্মিক (spiritual), প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্ধন বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য। পূর্বে শিশুজীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ছিল ঐরূপ ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থার কারণ—যা চলেছিল বহুশত বছর ধরে জগতের বিভিন্ন দেশে (প্রায় উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি)। পূর্বে শিশুকে বিবেচনা করা হত একটি ক্ষুদ্র মানুষ হিসাবে। ফলে শিশুশিক্ষা ছিল উপদেশমূলক (Instructive), অথচ তা হওয়া উচিত ছিল গঠন-মূলক (formative)। বর্তমান পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে ব্যাঙাচি যেমন একটি ক্ষুদ্র ব্যাঙ নয় কিন্তু পরিপূর্ণ ব্যাঙএ পরিণত হওয়ার পথে (A todpole is not a little frog but a frog in making), সেরূপ মানবশিশু একটি ক্ষুদ্র মানব নয়, পরিপূর্ণ মানবে পরিণত হওয়ার পথে মাত্র। শিশুর জীবনে বিভিন্ন স্তর রয়েছে,—যেমন অতি-শৈশবকাল (babyhood), শৈশবকাল (childhood), বাল্যকাল (boyhood or pre-adolescence), যৌবনকাল (adolescence) ও যৌবনোত্তর কাল (Post adolescence)। এই কারণেই বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে বিভিন্ন স্তর দেখা যায়,—যথা, কিণ্ডার গার্টেন, প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী ও ইউনিভারসিটি। এই বিভিন্ন স্তরে একই কারণে শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিভিন্ন। সাধারণভাবে এ পার্থক্য ছাড়া ও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিবেচনা করা হয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা (individual differences)। শিশুর

বুদ্ধির মান, বিশেষ কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বা ঝোঁক, পরিবেশ, বংশানুবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি বিশেষভাবে বিবেচিত হয়।

ডা: ফ্রয়েডের অবচেতন মনের উদ্‌ঘাটন বর্তমান মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনয়ন করেছে। এই অবচেতন মনস্তত্ত্ব (the depth psychology) বর্তমান শিক্ষাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। ডা: ফ্রয়েড মানব-মনকে ভাসমান একটি হিম-শৈলের সঙ্গে তুলনা করেছেন, হৈমশৈলের বেশীর ভাগই যেমন জলের নীচে থেকে যায় তেমনি মানব মনের অধিকাংশই তার অবচেতনে রয়েছে। ফ্রয়েডের মতে মানব-মনের বিভিন্ন স্তরগুলি হচ্ছে—চেতনমন (consciousness), প্রাক্‌চেতন (preconsciousness) ও অবচেতন মন (sub-consciousness) এবং মানব-ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন স্তর হচ্ছে এগো (ego), সুপার এগো (super-ego) ও ইদ্‌ (Id)। মানব-মনের এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের ফলে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে মানব-ব্যক্তিত্ব একটি সরল ও সহজ বস্তু নয়। সুতরাং শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য যদি চরিত্র-গঠন হয় তবে সে উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করতে হলে অবচেতন মনের শুদ্ধীকরণ ছাড়া উহা কখনই সম্ভব নয়, অথচ পাশ্চাত্য মনো-বিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে কোন কার্য্যকরী পন্থা দিতে পারেননি। এ বিষয়ে ভারতীয় মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। এঁদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মহামানব মনের গভীরতম প্রদেশে অবগাহন করে যে সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন তা বাস্তবিকই অতি বিস্ময়কর। শ্রীঅরবিন্দের মতে পাশ্চাত্য মনো-বিজ্ঞানীগণ অচেতন (unconscious) মনের অতি সামান্য একটু অংশের (only sub-conscious) রহস্য ভেদ করে ভাবছেন যে অচেতন মনের সবটাই জেনেছেন। এই আংশিক জ্ঞানের জন্য তাঁদের সিদ্ধান্ত অনেক সময়েই ত্রুটিপূর্ণ। শ্রীঅরবিন্দ এই সম্পূর্ণ অচেতন মনকে বলেছেন সাবলিমিনেল (subliminal) বা মগ্নচেতনা। এই মগ্নচেতনার উপরের অংশ অতিচেতন বা superconscient-এর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। এবং নীচের অংশকে, বলা যায় অবচেতন (subconscient or subconscious), তা রয়েছে অন্ধকারে পূর্ণ। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের এই মগ্নচেতনার পরিষ্কার ও যথাযথ ধারণা না থাকায় তাঁরা অবচেতন মনকে ধরে নিয়েছেন সম্পূর্ণ অচেতন মন বলে। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষাধারায় মূল বিষয়টি, অর্থাৎ 'মানব-ব্যক্তিত্বের সুসামঞ্জস্য বিকাশ ও পরিণতি' ঠিক থাকলেও, মানব-মনের ও ব্যক্তিত্বের ধারণা ও জ্ঞান যথেষ্ট না থাকায় এ শিক্ষায় অনেক ত্রুটি রয়েছে।

এখন যদি আমরা প্রাচীন ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে দেখতে পাই সেই সময় শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা হয়ে থাকলেও ঐ শিক্ষা ত্রুটি-বিচ্যুতিশূন্য ছিল না। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার এখানে একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে ঐ ত্রুটি কি ছিল বুঝা যাবে।

ভারতবর্ষ ধর্মকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে। ভারতবর্ষের সমাজকে বুঝতে হলে, তার রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সভ্যতা, দর্শন ও শিক্ষাকে বুঝতে হলে আমাদের বুঝতে হবে ধর্ম বলতে ভারতবর্ষ কি বুঝেছে। ভারতবর্ষের ধর্ম মন্দির, পুস্তক বা কোন ব্যক্তি-বিশেষের কথার মধ্যে নিবদ্ধ হয়নি। এ ধর্ম তাকে একদিকে আত্ম-অন্বেষণের পথে চিরদিন টেনে নিয়ে চলেছে ও অন্য দিকে বিশ্বজগতের সঙ্গে কোথায় তার যোগসূত্র তার সন্ধান যুগিয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব পড়েছে সব চাইতে অধিক।

বৈদিক যুগে শিক্ষা আরম্ভ হোত উপনয়নের পরে। উপনয়নকে বলা যেতে পারে ছাত্রজীবনের প্রবেশপত্র বা দীক্ষা ('ceremony of admission to studentship or Brahmacharya-Asram'), উপনয়ন-উৎসব অনুষ্ঠিত হোত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ছেলেদের যথাক্রমে ৮, ১১, ১২ বছর বয়সে। উপনয়নের পরে প্রত্যেক ছাত্রকে শিক্ষালাভের জন্য গুরুগৃহে গিয়ে থাকতে হোত প্রায় ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত। তখন ছাত্রদের শিক্ষা সমাপ্ত হোত সমাবর্তন (graduation) উৎসবের দ্বারা। এদ্বারা বুঝা যায় তখন ছাত্রদের প্রায় ১৫। ১৬ বছর ধরে শিক্ষালাভ করতে হোত, শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল আবাসিক এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছেলেদের শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক। তখন শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চরিত্রগঠন ও মোক্ষলাভ। কারণ ভারতবর্ষ কোনদিনই জীবনকে মৃত্যু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেনি। জীবন ও মৃত্যু একই সত্তার দুই দিক; তাই এ জীবনে সে মৃত্যুর রহস্য জানতে চেষ্টা করেছে, সুতরাং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলেছিল, এবং এরই ফলে হয়তো ব্যবহারিক জগতে তার কার্যকুশলতা মানের (material efficiency) অবনতি ঘটেছে।*

কিছু ব্যতিক্রম ঘটলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈদিক যুগের ন্যায় বৌদ্ধযুগও প্রায় একই পথ ধরে কাজ চলেছিল। এই ব্যতিক্রম বা পরিবর্তনের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে গেলে,—(১) বৌদ্ধযুগে শিক্ষাকে অধিক গণতান্ত্রিক করা হয়েছিল, কেননা বিদ্যালয়ের দরজা সকল জাতির ছেলেমেয়েদের নিকট উন্মুক্ত ছিল, (২) অনেকটা ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, (৩) শিক্ষার ক্ষেত্র গুরুগৃহ না হয়ে মঠে করা হয়েছিল, যার ফলে নালন্দা এবং তক্ষশীলার ন্যায় বিরাট বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল, এবং (৪) স্ত্রীশিক্ষার অধিক প্রচলন হয়েছিল। কিন্তু বৈদিকযুগের ন্যায় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বৌদ্ধযুগেও ছিল মোক্ষলাভ; ফলে ভারতবর্ষে পার্থিব উন্নতি আধ্যাত্মিক

* বৈদিক যুগে সংসারই মোক্ষ লাভের, জগৎ এড়িয়ে মুক্তিলাভের আদর্শ ছিল না—মৃত্যুকে জয় করা তাদের লক্ষ্য ছিল, মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে অমরত্বের অধিকারী হয়ে চলে যাওয়া নয়—ইহৈব তৈর্জিতঃ এই উপনিষদিক বাণী সে যুগেই মূল মন্ত্র ছিল—আধ্যাত্মিক চেতনার বলে জীবনের তত্ত্বি বৈদিক ঋষিরা পেয়েছেন—এ আদর্শ মলিন হয়ে এসেছে বৌদ্ধ যুগ হতে।—সম্পাদক

উন্নতির সঙ্গে সমান তালে পদক্ষেপ না করতে পারায় অনেক পেছিয়ে পড়ল, এবং বোধহয় এরই জন্য ভারতবর্ষে এসেছিল এক বিরাট অন্ধকার-যুগ। এই সময়েই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অন্তর্হিত হয়েছিল। এই অন্ধকার-যুগের শেষভাগে এসেছিল ইংরেজ। ইংরেজজাতির রাজত্বকালে ভারতবাসী শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও পেছিয়ে পড়ল সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা বড় রকমের লাভের মধ্যে ভারতবর্ষ আত্মবিস্মৃতির ঘুম থেকে জেগে উঠল ইংরেজজাতির সংস্পর্শে এসে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতবর্ষে অনেক মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন; তাঁদের অবদান জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ। শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীঅরবিন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। মহাত্মাজী-প্রবর্তিত 'নয়া তালিম' (Basic Education) ভারতগভর্নমেন্ট জাতীয় শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করেছেন, বিশেষভাবে শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে নিহিত রয়েছে বর্তমান প্রগতিশীল শিক্ষার প্রায় সমস্ত মূলসূত্রগুলি। এই প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা শিক্ষা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সংক্ষেপে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হবে।

শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে তাঁরা গোটা মানুষ সম্বন্ধে কি বলেছেন তা একটু বলা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জীবনের উন্নতির তুলনায় আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির উপর অনেক বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল, এবং এর ফলে বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েছিল। ঠিক বিপরীত দিকে আমরা বর্তমানে দেখছি পাশ্চাত্য শিক্ষায় বহির্জগতের দিকে অত্যধিক জোর দেওয়ায় অন্তর্জগতের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ভুলের কারণ শ্রীঅরবিন্দের লেখার মধ্যে সন্ধান পাই। তাঁর মতে ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন ঋষি,* যেমন বুদ্ধ শঙ্কর প্রভৃতি, তাঁদের সাধারণ চেতনাকে সমাধির অবস্থায় অনেক উন্নত স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা সাধারণ জাগ্রত অবস্থায় ফিরে এসে ঘোষণা করলেন,—এই ব্যবহারিক জগৎ যাকে সাধারণ ইন্দ্রিয় ও চেতনার দ্বারা পাওয়া যায়, তা মিথ্যা। তিনি বলেছেন,—বুদ্ধ ও শঙ্কর সেই স্তর থেকে দেখেননি যেখানে এই জগতের সঙ্গে পারমার্থিক জগতের প্রকৃত যোগসূত্র পাওয়া যায়। তাই একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া পার্থিব জ্ঞানকে তাঁরা অকিঞ্চিৎকর বা অপ্রয়োজনীয় বলে বোধ করেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের মতে এ জগতের কিছুই অবাঞ্ছিত বা মিথ্যা নয়; তবে এর পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটাতে হবে অতিমানসের অবতরণ ও নীচ থেকে আধ্যাত্মিক

---

* এঁরা ঋষি ছিলেন না—এঁরা ছিলেন সাধুসন্ত।—সম্পাদক

বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। শ্রীঅরবিন্দের মতে আমাদের দেহ অবাঞ্ছিত নয় ; কারণ অতিমানসের এই নরজগতে অবতরণের জন্য দেহ, প্রাণ, মন, সব কিছুর রূপান্তর ঘটান প্রয়োজন। তাই শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষাকে অতিশয় ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ সাধনা দ্বারা মানব মনের অতি গভীর ও গহন প্রদেশে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর মতে মানুষ একটি হোমোজিনিয়াস্ প্রাণী নয়, প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে রয়েছে অনেক ব্যক্তিত্বের সমাবেশ। মানুষের মধ্যে রয়েছে তার দৈহিক ব্যক্তিত্ব (Physical personality), প্রাণময় ব্যক্তিত্ব (Vital personality), মনোময় ব্যক্তিত্ব (Mental personality) এবং কেন্দ্রিয় ব্যক্তিত্ব (Psychic personality)। খুব বিস্ময়ের কথা মানুষের মধ্যে এই বিভিন্ন ব্যক্তিত্বগুলির মধ্যে কোন একতা ও সামঞ্জস্য বর্তমান নেই ; অহরহ দ্বন্দ্ব চলেছে এই বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে। একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে,—দৈহিক ব্যক্তিত্ব যখন দেহের জন্য আর বেশী আহার চায় না, প্রাণময় ব্যক্তিত্ব তার অত্যধিক বাসনা ও আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য বা ইচ্ছা এবং যত খুসী আহারের জন্য দৈহিক ব্যক্তিত্বকে বাধ্য করে ; মস্তিষ্ক যখন চায় বিশ্রাম বা নিদ্রা তখন মন হয়তো খুব একটি জটিল তত্ত্বের সমাধানে ব্যাপৃত,—ফলে দেহেতে ঘটে বিপর্যয় এবং আমাদের সমস্ত ব্যক্তিত্বগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব যায় আরও বেড়ে। আমাদের দেহ স্বভাবতই নিয়মকানুন মেনে চলে, প্রাণ-সর্বস্ব ব্যক্তিত্বের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল নয়। কিন্তু মন ও প্রাণের দেহের উপর এত অত্যাচার চলে বলেই সে এত কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে এবং রোগ, জরা ও অকালমৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হয়। যদি মানুষ তার অন্তঃপুরুষের (psyche) দ্বারা অন্যান্য ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে একমুখী করতে পারে, অর্থাৎ যে কেন্দ্রিয় আত্মা তার মধ্যে প্রায় সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে যদি তাকে জাগরিত করে সম্মুখে নিয়ে আসতে পারে তবে তার দেহ নীরোগ, স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর হয়ে উঠে, তার প্রাণ বাসনা ও কামনামুক্ত হয়, মন শান্ত চিন্তায় মগ্ন হয় এবং এরা সকলে এই ভাবে রূপান্তরিত হয়ে কেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে সত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। যারা ছিল পূর্বে স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল ও কেবল বহির্মুখী তারাই তখন অতিমানস অবতরণে সাহায্যকারী অতি শক্তিশালী যন্ত্রে পরিণত হয়।

এইজন্য শ্রীমা ও শ্রীঅরবিন্দ মানবের শিক্ষাকে এত ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নাম দেওয়া হয়েছে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা (Integral Education)। তাকে এইভাবে—ভাগ করা হয়েছে (১) দৈহিক শিক্ষা (physical education), (২) প্রাণতত্ত্বের শিক্ষা (education of the vital), (৩) মনের শিক্ষা (mental education), (৪) অন্তরাত্মিক শিক্ষা (psychic education) এবং (৫) আধ্যাত্মিক শিক্ষা (sipritual education)। এখানে প্রত্যেক ভাগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয় ; কয়েকটি মূল সমস্যা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যেতে পারে।

(১) শারীরিক বা দৈহিক শিক্ষা—এই শিক্ষা শিশুর জন্ম থেকে আরম্ভ হওয়া উচিত

এবং সমস্ত জীবন ধরেই চলতে থাকবে। জন্মের প্রথম দিন থেকেই দেখতে হবে যাতে শিশুর খাদ্য, ঘুম ও মলমূত্রত্যাগ যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। যদি এই তিনটি বিষয় গোড়া থেকে স্বাস্থ্যবিধি সম্মত অভ্যাসে পরিণত হয় তবে সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনে তাকে অনেক অসুবিধা ও ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে রক্ষা করা হবে। শিশুর খাদ্য হবে সুস্বাদু অথচ সরল, পুষ্টিকর এবং বয়সের অনুপাতে পরিমিত। খাদ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি সম্মত অভ্যাসের সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু তাবলে রোগের ভয় দেখিয়ে নয়, এতে শিশুর জীবনে নানারূপ ক্ষতি হয়ে থাকে। কেননা যা ভয় করা যায় তাকে ভয়ের সূত্র ধরে আক্রমণের সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। অনেক পিতামাতা শিশুকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করে শাস্তি দান করেন, এতে শিশুর জীবনে খাদ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। সুন্দর, সুগঠিত, স্বাস্থ্যবান লোকের প্রতি শিশুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করাতে হবে। কোন কোন শিশু কাজ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বা নিজের প্রতি দরদ আকর্ষণের নিমিত্ত রোগের ভান করে থাকে। এ কখনই অনুমোদন করা উচিত নয়। শিশুকে বলতে হবে দৈহিক অসুস্থতা একটি দুর্বলতার লক্ষণ, একটি সুবিধা আদায় করবার অস্ত্রহাত নয়। শিশুর পক্ষে মুক্ত হাওয়ায় সকাল ও বিকালে খেলাধূলা জগতের সকল ঔষধ হতে অনেক বেশী উপকারী ও কার্য্যকরী এবং বিশেষ কারণ না থাকলে ঔষধ খাওয়া কখনই উচিত নয়।

ঘুম শিশুর জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে ঘুমের সময় কম হবে, কিন্তু পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায়ও ৮ ঘন্টার কম যেন না হয়। স্নায়বিক বিশ্রাম ও সমতার পক্ষে রাত্রের প্রথমার্দ্ধের ঘুম বিশেষ উপকারী।

(২) প্রাণময় স্তরের শিক্ষা—প্রাণ স্তরটির নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্য বিধান করা সব চাইতে বেশী প্রয়োজন, অথচ শিক্ষার ক্ষেত্রে এর সম্বন্ধে প্রায় সকলেই উদাসীন থাকেন। মানবজীবনে এই স্তরের শক্তি সবচেয়ে বেশী—সাধারণতঃ তা স্বেচ্ছাচারী ও অসংযমী অথচ অতিশয় ক্ষমতাশালী। অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে এই দিকটি অবহেলিত থেকে যায় বলে অনেক সময় তারা ভাবাবেগে অতি গর্হিত কার্য্য করে থাকেন। এই শিক্ষা মানবজীবনে অতি শৈশব থেকেই আরম্ভ করতে হবে। এই শিক্ষার প্রধানত দুইটি দিক আছে। একটি হচ্ছে, ইন্দ্রিয়সমূহের যথাযথ অনুশীলন, সংগঠন ও প্রয়োগ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আত্মচেতনার উন্মেষ ও বিশ্লেষণ দ্বারা চরিত্র ও ব্যবহারের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা এবং শেষপর্য্যন্ত এর রূপান্তর ঘটান। আমাদের ইন্দ্রিয় গুলির ঠিকভাবে পরিবর্দ্ধন করতে পারলে তাদের শক্তি অনেক বেড়ে যায়; তখন অনেক দূরের জিনিষ বা ঘটনা দেখা, শ্রবণ করা ও স্পর্শ করা যায়। প্রকৃত সৌন্দর্য্যবোধের সৃষ্টি এই ইন্দ্রিয়সমূহের যথার্থ শিক্ষার দ্বারা হয়ে থাকে। এই সৌন্দর্য্যবোধটি যথাযথভাবে পরিরক্ষিত হলে অনেক অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং এ অবস্থায় কোন বর্বরসুলভ, পাশবিক বা অনুচিত কাজ করা আর সম্ভব নয়। 'চরিত্রগঠন' এই কথাটি

সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করতে হবে, কেননা চরিত্রে ঠিক পরিবর্তন আনতে হলে আমাদের অবচেতন মনের কার্য্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত তা সম্ভব নয়। কেননা, যে চরিত্রগঠনের ভিত্তি কেবলমাত্র উপরস্থ চেতন মন, তার পতন যে কোন মুহূর্তে।

(৩) মনের শিক্ষা—উচ্চ জীবন লাভের জন্য মনের শিক্ষার পাচটি প্রধান অঙ্গ আছে, যথা—

(১) একাগ্রতা ও মনোযোগ বৃদ্ধি।

(২) মনের সম্প্রসারণ ও উদারতা বৃদ্ধি।

(৩) কোন উচ্চ আদর্শকে কেন্দ্র করে ভাবসমূহের সংহতি।

(৪) চিন্তাধারার নিয়ন্ত্রণ, অবাঞ্ছিত চিন্তাসমূহের বিতাড়ন এবং অভিপ্রেত বিষয়ে মনোনিবেশ করার ক্ষমতা অর্জন।

(৫) মনকে শান্ত ও সমাহিত করার ক্ষমতা অর্জন এবং উর্দ্ধলোক থেকে প্রেরণা লাভের জন্য মনকে উন্মুক্ত রাখার শক্তি আয়ত্ত।

এই সমস্ত বিষয়গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা এখানে সম্ভব নয়। তবে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের কথা এখানে বলা যেতে পারে। এই বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানের পরিধি এত বেড়ে গিয়েছে এবং আমাদের মন এত অধিক বিষয়ে দিতে হয় যে মনকে কি ভাবে বিশ্রাম দেওয়া যায় তা বিশেষভাবে ভাববার কথা। কারণ দেহের ন্যায় মনের বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। মনকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলে এই বিশ্রাম কি করে দেওয়া যায় তা জানতে হবে। দিবাভাগে আমাদের বহু ও বিচিত্র কার্য্যে মন দিতে হয় সত্য, তবু এই কার্য্যের মধ্যেও আমাদের মনের উপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ থাকে, কিন্তু রাত্রিতে এ বিষয়ে আমরা একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ি; আমাদের দেহ নিদ্রামগ্ন থাকলেও মনের কার্য্য চলতে থাকে এলোমেলো ভাবে স্বপ্নের ভিতর দিয়ে। এতে মানসিক ক্লান্তি আরও বেড়ে যায় এবং তার শক্তিও ক্ষীণ হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীমা বলছেন,—মনকে যদি চিন্তাশূন্য করে নিস্তব্ধতার মধ্যে কয়েক মিনিটের জন্য ডুবিয়ে দিতে পারা যায় তবে ৫।৬ ঘন্টা সুনিদ্রা থেকে বেশী ফল পাওয়া যায়। আমাদের মন ঐরূপ বিশ্রামের দ্বারা অনেক শক্তিশালী ও কার্য্যক্ষম হয়ে ওঠে। মনকে যদি ইচ্ছামত শান্ত ও নিস্তব্ধ করা যায় তবে ঐ অবস্থায় অনেক জটিল ও দুরূহ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।

(৪) আন্তরাত্মিক শিক্ষা (Psychic Education)—অবচেতন মনের অন্ধ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিত্বকে জাগ্রত মনের দ্বারা চালিত করা এবং সেইভাবে ব্যক্তিত্বকে সংগঠন করার কাজ দৈহিক, প্রাণিক, ও মানসিক শিক্ষার দ্বারা হয়ে থাকে। কিন্তু অন্তরাত্মা বা অন্তঃপুরুষের শিক্ষা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি—জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, কেনই বা এই পৃথিবীতে এসেছি, আমাদের সত্যিকারের স্বরূপ কি, ইত্যাদি। আন্তরাত্মিক শিক্ষার মূল ভিত্তি হবে নিজের ভিতরে এমন একটি

সত্তা খুঁজে বের করা যা আমাদের শরীরের উপর নির্ভরশীল নয়, এবং নিজেকে মুক্ত করতে হবে জীবনের সেই সব পরিবেশ থেকে যার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের মানসিক ও সামাজিক সংস্কার, মাতৃভাষা, দেশগত অভ্যাস, ভৌগলিক গণ্ডী ও সমসাময়িক কাল থেকে। এই সব খণ্ড খণ্ড দেশ, কাল, সংস্কার, ধর্ম্ম ও দেশগত গণ্ডী ভেদ করতে পারলেই আমরা খুঁজে পাব আমাদের অন্তরে নিহিত সেই ব্যক্তিত্বকে যা ছড়িয়ে আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। তখন আমাদের এই কৃত্রিম বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব বা ক্ষুদ্র অহমিকার খোলসটি খসে পড়বে। সেই অবস্থায় আমাদের কাছে যা ছিল জড়, তা হয়ে উঠবে জীবন্ত। তখন বুঝতে পারব বৃক্ষ-লতা ও প্রাণীর সুখ দুঃখের কথা, তাদের সকলের ভাষা; কারণ তখন আমাদের চেতনার সঙ্গে তাদের চেতনার একটি যোগসূত্র স্থাপন হবে। আন্তরাত্মিক শিক্ষার এই হল প্রথম ধাপ।

জগতের যে সব পথিক অভিযান করেছেন হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গে, উত্তর বা দক্ষিণ মেরুতে অথবা আফ্রিকার গভীর ও গহন অরণ্যের রহস্য ভেদ করার জন্য, তাদের পথ চলার প্রচণ্ড বাধা বিঘ্নের কথা আমরা শুনেছি; কিন্তু যে সব ব্যক্তি অভিযান করেছিলেন ও করছেন তাদের কেন্দ্রিয় পুরুষকে আবিষ্কার করতে তাদের পথ আরও অনেকগুণে দুর্গম, পিচ্ছিল ও কণ্টকাকীর্ণ। এ পথে চলতে হবে হয়তো সবাকার, তাই আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে সকলের। যারা এই পথে যাত্রা করার জন্য বদ্ধপরিকর তাদের সুবিধার জন্য শ্রীমা যে সব বাণী দিয়েছেন তারই কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে,—মনের দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয়ের বিচার চলে না।

(২) আধ্যাত্মিক ও আত্মিক শিক্ষাক্ষেত্রে শুধু মন বা বুদ্ধি দ্বারা চালিত বিচার, মতামত সম্পূর্ণ-রূপে পরিত্যাগ করতে হবে।

(৩) সব কাজ আনন্দের সঙ্গে করতে হবে, কিন্তু আনন্দলাভের জন্য কোন কাজ করা চলবে না।

(৪) যা-ই ঘটুক না কেন, শান্ত ও সমাহিত থাকবে।

(৫) বহির্জগতে যা ঘটে তার বহিরাবরণের দ্বারা ভিতরের অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয়, কেননা এই ঘটনার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও অর্থ অনেক সময়আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয় ও চেতনায় ধরা পড়ে না।

(৬) কারও ব্যবহারের জন্য অভিযোগ করতে পার তখনই যখন তার প্রকৃতিতে যে দোষের জন্য ঐরূপ অন্যায় সংঘটিত হয়েছে তার সংশোধন করবার শক্তি তোমার আছে।

(৭) খাদ্য গ্রহণ করার পূর্বমুহূর্তে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য মনে একাগ্রতা এনে এই ভাববে যে এই খাদ্য তোমার শরীরে এমন শক্তি উৎপাদন করবে যা দ্বারা তোমার সত্য আবিষ্কারে সাহায্য হয়।

(৮) নিদ্রার ঠিক পূর্বে কয়েক মুহূর্তের জন্য এই ইচ্ছা করবে যেন ঘুম তোমার সব ক্লান্তি

(শারীরিক, মানসিক, স্নায়বিক) দূর করে জাগ্রত অবস্থায় এমন শক্তি এনে দেয় যা তোমার মহাবিজয়ের যাত্রাপথে সাহায্য করবে।

(৯) যখনই কোন কথা বলতে যাবে, তোমার মুখে ভাষা বেরবার পূর্ব মুহূর্তে এই সঙ্কল্প করবে, যেন কোন বাক্যই যা একান্ত প্রয়োজন নয় তা তোমার মুখ থেকে না বেরয়।

(১০) জীবনের কোন অবস্থায়ই এক মুহূর্তের জন্যও ভুলবেনা তোমার জীবনের মহা উদ্দেশ্য ও শেষ পরিণতি অনেক উর্দ্ধে।

(৫) আধ্যাত্মিক শিক্ষা—এ পর্য্যন্ত যা বলা হল তা আন্তরাত্মিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এখন প্রশ্ন হোল এই—আধ্যাত্মিক শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝব ? কোথায় এবং কি ভাবে সাইকিক্ শিক্ষার সঙ্গে তার পার্থক্য রয়েছে ? এই পার্থক্য বোঝা একটু শক্ত এইজন্য যে আন্তরাত্মিক ও আধ্যাত্মিক স্তরের অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই নেই।

অন্তরাত্মার (psychic) জীবন বলতে আমরা বুঝব ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডী পেরিয়ে সমস্ত স্বার্থপরতার উর্দ্ধে উঠে যাওয়া, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবন বলতে বুঝায় আমিত্বের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটান সুতরাং আধ্যাত্মিক শিক্ষার লক্ষ্য কি হবে সে কথা পরিষ্কার ভাবে নির্দ্দেশ করা খুব সহজ নয়। যদি বলা যায় ভগবানের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ একত্ব সাধন করা তবে প্রশ্ন জাগে ভগবান বলতে আমরা কি বুঝব ? তিনি কি শঙ্করের উপাধি-বিহীন নির্গুণ ব্রহ্ম না যে ভগবান প্রকাশিত রয়েছেন বিশ্বের সমস্ত পদার্থ ও সত্তার মধ্য দিয়ে ? শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য এর সমাধান দিয়েছেন ; তাঁর মতে ব্রহ্ম একাধারে সাকার ও নিরাকার, ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক (Personal and Impersonal) বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত (Transcendental and Immanent)। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ কি তা বুঝতে হলে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত ও কার্য্যকরী পন্থা হল এই মহাশক্তির নিকট সম্পূর্ণভাবে নিজকে সমর্পণ করা। এই আত্মসমর্পণ যত বেশী সম্পূর্ণ (entire) ও সামগ্রিক (integral) হতে থাকবে সত্তা উপলব্ধি তত বেশী ব্যাপক হবে। সমাধি অবস্থায় যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, আমাদের চেতনা যে স্তরে উন্নীত হয় সেখান থেকে ফিরে এসে সাধারণ অবস্থায় তা থাকে না। যদি সমাধি অবস্থায় এই তুরীয় চেতনা (super-consciousness) আমাদের সাধারণ জাগ্রত চেতনাতেও অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, এমন কি ঐ চেতনা যদি ঘুমের অবস্থায়ও একইভাবে বিরাজমান থাকে তবে অহমিকার আবরণ চিরতরে ঘুচে যায় এবং মহা দিব্যশক্তির প্রকাশ আমাদের সমস্ত সাধারণ দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্য দিয়ে হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—যদি এই জগৎকে, সে যে অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে সে-ভাবে তাকে রেখে কেবল নিজের মুক্তি চাওয়া যায় তবে তা পূর্ণ বাঞ্ছনীয় ও কার্য্যকরী হতে পারে না। জগতের এই বিকৃত অবস্থার রূপান্তর ঘটিয়ে সেখানে এমন অবস্থা

P30248

আনতে হবে যাতে এক নূতন, অবিকৃত ও সমৃদ্ধ জগতের আবির্ভাব হতে পারে। শোক, দুঃখ, দৈন্য, জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে এই জগতের উদ্ধার কোন ব্যক্তিবিশেষের মুক্তিদ্বারা হতে পারে না, অথবা জগতের সমস্ত জীবনের পরিনির্বাণ ঘটানর বা ব্যক্ত জগৎ অব্যক্তে ফিরে যাওয়ার মধ্য দিয়েও নয়; কেননা, তাতে সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। কিন্তু তা সম্ভব হবে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের রূপান্তর সাধনের দ্বারা কেবল সেই অবস্থায় এ জগতে আবির্ভাব হবে অতিমানব —একটি, দুইটি নয়, লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি। সেই অতিমানব-গোষ্ঠির সঙ্গে আমাদের বর্তমান মানবজাতির গোষ্ঠির প্রভেদ থাকবে সেইরূপ যা রয়েছে বর্তমানে মানবজাতির সঙ্গে পশুজগতের।

বর্তমান শিক্ষার ধারা বা গতি চলেছে নিম্ন থেকে উচ্চে, অসম্পূর্ণ থেকে সম্পূর্ণের দিকে, কিন্তু অতিমানসিক শিক্ষার গতি হবে উল্টো দিক থেকে, উচ্চ থেকে নিম্নে, অর্থাৎ অতিমানসের ঊর্দ্ধ থেকে নিম্নে অবতরণের মধ্য দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত রূপান্তর ঘটানো হবে এই বিশ্বের সমস্ত জড় দেহের ও জড় বস্তুর।

এখানে শ্রীমার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। এই সম্পর্কে তিনি বলছেন,—

"The supramental education will result not merely in a progressively developing formation of the human nature, an increasing growth of its latent faculties, but a transformation of the nature itself, a transformation of the being in its entirety, a new ascent of the species above and beyond man towards Superman, leading in the end to appearance of the divine race upon earth."

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

প্রশ্ন : প্রকৃত অ্যাড্‌ভেঞ্চার কী ?

উত্তর : গত বছরে যখন অতিমানস চেতনার এবং তার আলো ও শক্তিক্রিয়ার আসন্ন অভিব্যক্তির কথা তোমাদের জানিয়েছিলাম, তখন সেই সঙ্গে আমার আরো বলা উচিত ছিল যে এবার নতুন রকমের এক জগৎ দেখা দেবে, এ হলো তারই পূর্বসূচনা। কিন্তু সে সময়ে সেই নতুন জগতের চেহারা এই প্রাচীন জগতের আড়ালে এমনি ঢাকা পড়েছিল যে, এখনও পর্যন্ত খুব কম লোকেই জানতে পারছে সেই জগতের নবজন্মের কথা ও তার দ্বারা কত কিছু পরিবর্তন এসে পড়ার কথা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যুগান্তর আনয়নকারী নবশক্তি তার উদ্দিষ্ট ক্রিয়াগুলিকে অবাধে ও অপ্রতিহত গতিতে যথাপ্রয়োজন সুসম্পন্ন ক'রে চলেছে। দিনের পর দিন তার ফলাফল গুলিও প্রতি পদে অনুভূতির দ্বারা জানতে পারা যাচ্ছে। সংক্ষেপে ও সরল ভাষাতে তার সম্বন্ধে স্পষ্ট ক'রে বলাও যেতে পারে।

প্রথম কথা, এ শুধু অধ্যাত্ম জীবন সম্বন্ধে বা ভগবানের সম্বন্ধে একটা নতুন রকমের বিভাবনা মাত্রই নয়। শ্রীঅরবিন্দ এ সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ক'রে পুরোপুরি বলে দিয়েছেন। সংক্ষেপে তার সূত্রটা এই রকম বলা যায় :

প্রাচীন যুগের আধ্যাত্মিকতার কাজ ছিল জীবনকে ডিঙিয়ে ভগবানকে খোঁজা, জগৎ যেমন আছে তেমনি পড়ে থাক। কিন্তু আমাদের নতুন দৃষ্টি নিয়ে আমরা চাইছি এই বাস্তব জীবনকেই ভগবানের দিকে টেনে তুলতে, জড়জগৎকে দিব্য জগতে রূপান্তরিত করতে। এ কথা বহুবার বলাও হয়েছে, আর তোমাদের অল্পবিস্তর বোধগম্যও হয়েছে। আমরা যা চাই তার এই হলো সার কথা। তবে এ কাজ ধীরে ধীরে সহজ উপায়েও হয়ে যেতো, পুরোনো জগৎ যেমন ছিল তাকেই ক্রমশ আরো বড়ো ক'রে ও তারই ক্রমিক উন্নতি ঘটিয়ে। এই উন্নতি আসার সম্বন্ধে পরিকল্পনা যতই সঠিক বা যতই অনন্যপূর্ব হোক, যখন এটি উচ্চতর ভাবরাজ্যে রূপ নিয়েছে তখন তাকেই নতুন সৃষ্টির শক্তিগর্ভ বীজ রূপে লালন করা যেতে পারতো। কিন্তু ইতিমধ্যে বাস্তবে যা ঘটে গেছে তা সম্পূর্ণ এক আলাদা ব্যাপার, একটা নতুন জগৎই এখন জন্ম নিয়েছে। পুরোনো জগৎই যে নতুনে রূপান্তরিত হচ্ছে এখন আর সে কথা নয়, বাস্তবিক এক নতুন জগৎই এসে দেখা দিয়েছে।

বর্তমান মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি এই অদলবদলের ঠিক মাঝখানে, যেখানে পুরোনো আর নতুনে মেশামিশি ; পুরোনোর প্রভাব এখনও পূর্ণতেজে সাধারণ মানুষের চেতনার উপর আধিপত্য বজায় রেখে চলেছে, এদিকে নতুন জিনিস তারই মধ্যে মাথা গলিয়ে দিয়েছে।

যদিও নতুন এখনও মাথা নীচু ক'রে রয়েছে, আপাতত বাইরে থেকে তার কোনোই তেজ প্রকাশ পাচ্ছে না, এমন কি অধিকাংশ মানুষের চেতনার মধ্যে তার অস্তিত্বই দেখা যাচ্ছে না, তবু সে নিজের কাজটুকু ঠিকই ক'রে যাচ্ছে ; ধীরে ধীরে সে বেড়ে উঠছে, আর কেবল প্রতীক্ষা করছে সেই সময়টির যখন পূর্ণ প্রাবল্যের সঙ্গে সে প্রত্যক্ষভাবে আপন আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

সোজা কথায় বলা যায়, পুরোনো জগৎ ছিল শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেন অধিমানসের রচনা, তার উপর আধিপত্য করতেন মনের স্তরের উপরকার অধিমানস লোকের দেবতারা, মানব তাই দেবতাদের মেনে চলতো। সে ছিল ধর্মকর্মের যুগ। মানুষ তার নীচেকার অবস্থা থেকে আরো উপরে উঠবার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত কয়েক রকম ধর্মের পথ তৈরী করেছিল, যার দ্বারা বহুৎ আত্মারা অদৃশ্য জগতের নাগালও পেতে পারতেন। এরই চরম পরিণতি ঘটে আরো উচ্চতর উপলব্ধির দ্বারা ফুটে উঠেছিল সকল ধর্মের উপরকার একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর সম্বন্ধে ধারণা, যিনি অনির্বচনীয়, যিনি সকল অভিব্যক্তিরও উপরে—আর তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছনোই ছিল মানব আশ্পৃহার চূড়ান্ত। কিন্তু এ জিনিস একটা সীমান্তে গিয়ে থেমে যায় ; এটি পুরোপুরি অধিমানস স্তরেরই অন্তর্গত হয়ে থাকার ব্যাপার, তারই সৃষ্টির মধ্যে থেকে আরো উঁচু দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র করা, তখনও তা একটা ধারণা ছাড়া অন্য কিছু নয়, এমন এক নতুন সৃষ্টির সম্বন্ধে ধারণা মাত্র যাকে ভাবা যায় কিন্তু ধরা যায় না। কিন্তু তাকে যথার্থই ধরতে হলে ওর একটা ওলটপালটের দরকার। তখন অধিমানসের রাজ্য থেকে সরে আসতে হবে। সেই নতুন জিনিসটি এনে ফেলবার জন্যই দরকার হয়েছিল অধিমানসের জায়গাতে অতিমানসের সৃষ্টি।

এখন সেই পুরোনো জিনিসগুলি প্রাচীন ও অচল হয়ে পড়েছে, আগেকার সত্যের প্রাণহীন অনুকরণ মাত্র এখন হয়ে চলেছে।

কিন্তু নতুন অতিমানসের সৃষ্টিতে আগেকার মতো ধর্ম বা ধর্মমত বলে কিছু থাকবে না। সমগ্র জীবনটাই হবে বিভিন্ন রূপে অনন্তের দিব্য অভিব্যক্তি ও বিকাশ। মানুষ যাদের দেবতা বলেছে তারাও আর থাকবে না।

বড়ো বড়ো দেবতারাও নিজেরা এসে এই নতুন সৃষ্টির মধ্যে অংশগ্রহণ করবে, তার জন্য তাদেরও পৃথিবীতে নেবে অতিমানসের খোলস ধরতে হবে। তা যদি কেউ না নিতে চায়, স্থূলভাবে রূপগ্রহণ না ক'রে যেমন অবস্থায় আছে সেই ভাবেই থাকতে চায়, তাহ'লে এখানকার অতিমানস সত্তাদের সঙ্গে তাদের সমান সমান বন্ধুত্বের সম্পর্ক দাঁড়াবে, কারণ এখানকার সেই অতিমানস রাজ্যেও ভগবানের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি হতে থাকবে অভিব্যক্ত।

পৃথিবীর জড়দেহ যখন অতিমানসত্ব লাভ করবে তখন আর এখানে এসে জন্মানোকে নিকৃষ্ট বলা চলবে না, বরং তার দ্বারা এমন এক পূর্ণতা লাভের সুযোগ পাওয়া যাবে যা আর কোনো উপায়ে হতে পারা সম্ভব নয়।

কিন্তু এ সবকিছুই হলো ভবিষ্যতের কথা। সেই ভবিষ্যতের সবেমাত্র সূচনা হয়েছে, এখনও তা পুরোপুরি সফল হতে খানিকটা সময় লাগবে। ইতিমধ্যে আমরা পড়ে গেছি এক অসাধারণ অবস্থার মধ্যে, যেমন আর কখনই ঘটেনি। এই সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আমরা এমন এক নতুন জগতের নবজন্ম দেখছি যার আপাতত খুবই শৈশব অবস্থা, খুবই দুর্বল অবস্থা—ভিতরে বলহীন না হলেও বাইরে থেকে তেমনি দেখাচ্ছে—কাজেই একে এখন চেনা যাচ্ছে না, অধিকাংশ লোক এর আবির্ভাবের কথা অস্বীকারই করছে, কিন্তু তবুও তা ঠিকই এসে হাজির হয়েছে, ক্রমশ বেড়ে উঠতে চেষ্টা করছে, আর তার সাফল্য সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ। তথাপি যে রাস্তায় সে পরিণতি লাভ করতে পারবে তা সম্পূর্ণ এক নূতন রাস্তা, যে রাস্তা ইতিপূর্বে কখনই আবিষ্কৃত হয়নি, আজ পর্যন্ত কেউই সেই রাস্তায় চলেনি। সবেমাত্র তার শুরু হয়েছে, সবেমাত্র এক নতুন আরম্ভ, বিশ্বব্যাপী এক নবসূচনার ব্যাপার। সুতরাং এই হলো সব চেয়ে খাঁটি অ্যাড্‌ভেঞ্চার, যা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয়, অভূতপূর্ব।

অনেকে বিশেষ ক'রে অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাজই পছন্দ করে, তাদের সকলকে আমি এই কথাই বলতে চাই

এই মহা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের অভিযানে আমি তোমাদের সকলকে যোগ দিতে ডাকছি। এতে আগেকার মতো আধ্যাত্মিক সাধনার পুনরাবৃত্তি করবার দরকার হবে না, কারণ আমাদের প্রথম চালই শুরু হবে সে অবস্থাকে পেরিয়ে। আমরা চলেছি এক নতুন সৃষ্টির দিকে, যার সবটাই অভূতপূর্ব, যার মধ্যে অনেক ঝুঁকি অনেক সংকট, সব-কিছুই অদৃষ্টপূর্ব। এ হলো এক পুরোপুরি অ্যাড্‌ভেঞ্চার, যার শেষ প্রান্তে আছে নিশ্চিত বিজয়লাভ, কিন্তু যার পথটি হলো অজানা, সেই অচলা পথকে পদে পদে আবিষ্কার ক'রে অগ্রসর হতে হবে। বর্তমান বিশ্বে এমন কখনই হয় নি, ঠিক এই রকম কখনই আর হবে না। এ কথা শুনে যদি আগ্রহ জাগে মনে, তবে নেমে যাও এই পথে। কাল যে কোথায় পৌঁছবে, সে কথা আজ আমি বলতে পারবো না।

কিন্তু এ পথে নামতে হলে এর আগে পর্যন্ত যা কিছু এঁচে রাখা হয়েছিল, যা কিছু সংকল্প করা বা গড়ে তোলা হয়েছিল, সবকিছুকেই ছেড়ে আসতে হবে, অজানার মধ্যে ঝাঁপ দিতে হবে। তাতে যা হয় হোক।

* * *

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "অতিমানস অভিব্যক্তি" (The Supramental Manifestation) বইখানিতে লিখেছেন—"এমন নতুনতর মানবজাতি আসছে যাদের থাকবে, যাকে বলা যায় আলোকদীপ্ত মন, অর্থাৎ সে মন সত্যের মধ্যেই স্থিত হয়ে সত্যচেতনা লাভ করবে, আর জীবনের ক্ষেত্রে পরোক্ষ জ্ঞানের বদলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই অভিব্যক্ত করবে। তাদের মনশ্চেতনা অজ্ঞানতার ক্রিয়ার বদলে জ্ঞানালোকের যন্ত্র রূপেই ক্রিয়া করবে। সর্বোচ্চ অবস্থায় তারা অতিমানসে গিয়েও পৌঁছতে পারবে।"

উত্তর : হাঁ, শ্রীঅরবিন্দ আমাদের সম্বন্ধে ঐ রকমই প্রত্যাশা করেছেন, আর বলেছেন যে অতিমানব হবে ঐ ধরনের, এখনকার মানুষ আর অতিমানসপ্রাপ্ত মানুষের মাঝামাঝি, অর্থাৎ জন্তু পর্যায়কে তারা একেবারে ছাড়িয়ে যাবে, জান্তব চাহিদা তাদের কিছু-মাত্র থাকবে না।

এখন আমরা যেমন রয়েছি সে হলো সাধারণ জন্তু পর্যায়েরই অন্তর্গত, সুতরাং এর থেকে যদি আমাদের কোনো রূপান্তরও হয় তবু তার মধ্যে জন্তুর জড় থেকে যাবে। শ্রীঅরবিন্দ যে অতিমানস মানুষদের কথা বলেছেন তারা এমন জন্তুর নিয়মে তৈরিই হবে না, তারা সরাসরি এমন কিছু উপাদানে জন্মাবে যা আপাতত আমাদের কাছে অজ্ঞাত ; বস্তু উপাদান আর শক্তিতে মিলে সরাসরি এমন ভাবে দেহের আকার নেবে যা বর্তমান জন্তুসৃষ্টির প্রণালী থেকে একেবারে স্বতন্ত্র।

অবশ্য দুই রকমের মাঝামাঝি অবস্থার মানুষরাও তো থাকবেই। তাদেরই কাজ হবে কেমন ক'রে সেই অতিমানস জীব জন্ম নিতে পারে তার উপায় অনুসন্ধান করা, আর শ্রীঅরবিন্দ যখন ঐ কথা লিখে আমাদের জানিয়েছিলেন তখন নিশ্চয় এটুকু বুঝেছিলেন যে আমাদেরই সেই কাজে সাহায্য করার পালা।

আমার মনে হয়—আর আমি নিশ্চয় ক'রে জানিও তাই, যে তাঁর সেই প্রত্যাশাকে আমরা সফল করতে পারলো। এখন তা আর প্রত্যাশা মাত্র নেই, নিশ্চয়তায় এসে পৌঁছবে। কেবল তা বাস্তবে দেখা দিতে অল্পাধিক বিলম্ব হতে পারে, সেটা নির্ভর করছে আমাদেরই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রয়াস, ঐকান্তিকতা ও সদিচ্ছার উপর—আর আমরা এ ব্যাপারটিকে কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছি তারই উপর।

বাইরের থেকে যারা স্থূলভাবে দেখবে তাদের মনে হবে যে কোনো-কিছুই বদলায়নি, যেমন ছিল তেমনি আছে, কিন্তু যে অমন দেখাতে না ভুলে গভীরভাবে দেখতে জানে, সে বুঝবে যে ইতিমধ্যে অনেকটাই কাজ এগিয়েছে। এখন আমাদের প্রত্যেকেরই আপন আপন সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত ; হয়তো আর বেশী বছর অপেক্ষাও করতে হবে না, তার আগেই এমন কিছু প্রত্যক্ষ ফল হতে শুরু করবে যা সকলেই সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাবে।

জগতের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে এই বিষয়টাই বর্তমানে সব চেয়ে বড়ো কিনা তা নিজেরাই তোমরা বুঝে দেখ।

এমন এক সময় এসে পড়ে যখন স্থূলদেহটা পর্যন্ত বোধ করতে থাকে যে এই অচল অবস্থার রূপান্তর না হলে বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা, তা ছাড়া আর কিছুই চাই না, চাইবার মতো আর অন্য কিছু নেই। তখন মনে হয় যেন দেহের কোষগুলি পর্যন্ত নতুন আলো পাবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। তারা কাতরভাবে চাইছে যে আসুক সেই আলো, তাতেই মিলবে সব চেয়ে সেরা আনন্দ, আর তারা এও জানে যে এবার জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।

সেই আশ্পৃহা, সেই অভীপ্সার বার্তাই আমি তোমাদের অন্তরের মধ্যে পৌঁছে দিতে

চাই, সেই আগতপ্রায় আলোর মধ্যে রূপান্তরিত হতে পারবার অভীপ্সা—যার তোমরা নিজেরাই বুঝবে যে তা ছাড়া এ জীবনের সব-কিছুই অসার মূল্যহীন, তা ছাড়া আর যা কিছু মিলুক সমস্তই নিষ্প্রানন্দ, নীরস, নিরর্থক।

*

প্রশ্ন ভগবানের দিকে এই অভীপ্সাকে স্থূলদেহের মধ্যে জাগিয়ে তোলার উপায় কি?

উত্তর: উপায় অনেক রকমই আছে, তবে তোমার নিজের উপায়টি নিজের দিক থেকে খুঁজে নিতে হবে। প্রথম আরম্ভটি প্রত্যেকের পক্ষেই স্বতন্ত্র হতে পারে, আর এমনও হতে পারে যে একজনের পক্ষে যা সঠিক আরম্ভ অন্যজনের পক্ষে তা একেবারে উল্টো।

আগেকার কালে, অতি অল্প কয়েকজনের পক্ষে নিতান্ত পূর্বনিয়তির দরুন কিছু ব্যতিক্রম হওয়া ছাড়া, যোগ মানেই ছিল সাংসারিক জীবনের গণ্ডী কেটে সরে থাকা, তাই তখন সবাই বলতো যে বয়স পেরিয়ে বৃদ্ধকালেই যোগ করবার সময়। যখন জীবনের সব কিছুই দেখে নেওয়া এবং ভোগ করা হয়ে গেছে, তার সুখ দুঃখ, উল্লাস ও বেদনা, উত্থান-পতন ও ভারবহন প্রভৃতি মনুষ্যজীবনে যা যা হবার থাকে সমস্তই হয়ে গেছে, তখনই অতঃপর আসে যোগের সময়। জীবনের মোহ যখন অনেকটা ভেঙে গেছে তখনই মানুষ অন্যরকম বিষয়ে চিন্তা করবার উপযুক্ত হয়েছে। যখন দেহে আর সেই তারুণ্যের স্ফূর্তি নেই অথচ অনেক পরিতৃপ্তির ফলে জীবন একেবারে নিশ্চেষ্ট ও গুরুভার হয়ে পড়েনি, তখন ঐ ছাড়া আর বেশী কিছু চাইবার থাকে না।

অবশ্য সেই দিক থেকে দেখলে এ ভালোই কথা, জীবনের পথ ছেড়ে শেষে আধ্যাত্মিকের পথ ধরা হলো, কিন্তু দেহও যে এই রূপান্তরে অংশগ্রহণ করুক এমন প্রত্যাশা আর রইল না। ঐরূপ ব্যক্তিদের পক্ষে এ হলো খুব সোজা রাস্তা, কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে সমগ্র বাস্তব জীবনটা নিয়ে যদি দিব্যজীবনের দিকে ঝুঁকতে হয়, পার্থিব জীবনটাকেই যদি তার উপলব্ধির ক্ষেত্র ক'রে নিতে হয়, তাহ'লে যত দিনে বার্ধক্যের দ্বারা দেহ শিথিল ও নির্জীব হয়ে যোগের পক্ষে সব কিছু বাধা আপনা থেকেই ঘুচে যাবে, ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা না করাই উচিত। বরং তার অনেক আগের থেকেই এ পথে চুকে পড়া উচিত, যখন তরুণ বয়সে সক্ষম দেহের সম্পূর্ণ তেজ বজায় রয়েছে, যখন নিজের আত্মহার দিকে তুমি তোমার সকল শক্তিকে সতেজ সাগ্রহে ও পরিপূর্ণভাবে নিয়োগ করতে পারো। তখন আর তাহ'লে জীবনের বিগতকাম রিক্ততার সুযোগ নেবার অপেক্ষায় থাকতে হবে না, বরং অজানিতকে জানবার, নূতনকে ও পূর্ণতাকে লাভ করবার আভ্যন্তরীণ অদম্য উদ্দীপনাই সেখানে অনেক বেশী কাজ করবে।

আর যদি তোমার এমন সৌভাগ্য হয় যে বাল্যকাল থেকেই তুমি অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে থাকায় তখন থেকেই যথোচিত সাহায্য ও নির্দেশ পেতে থাকলে, তাহ'লে তখন থেকেই এ কথা বুঝতে শুরু করবে যে সাধারণ জীবনের ফেনিল ও ভঙ্গুর আনন্দে মত্ত থাকার সঙ্গে সাধারণসীমার বহির্ভূত পূর্ণতর সত্যময় জীবন ও তার উচ্চতর ক্রিয়ার কতখানি তফাৎ।

যখন তোমরা বয়সে তরুণ আর যাকে আমি বলি "সুজাত" হয়ে এসেছ, অর্থাৎ আত্ম-সচেতন চৈত্যসত্তা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছ, তখন জানবে যে তোমাদের স্বপ্নের মধ্যেই লেগে রয়েছে এই আশ্বাস। অর্থাৎ ঐ শিশুচেতনার মধ্যেই উঁকি মারছে এমন কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা যার ভিতর কেবল সুন্দরই আছে কিন্তু অসুন্দর নেই, ন্যায় আছে কিন্তু অন্যায় নেই, প্রেম ও করুণা আছে অপরিমিত, আর সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা চায় এমন কোনো সুনিশ্চিত চরিতার্থতা যা চেতনায় দীপ্ত, নিত্য সিদ্ধ ও চির আশ্চর্য। শিশুকালে তোমরা আশ্চর্যেরই স্বপ্ন দেখ, সেখানে মন্দ কোনো কিছু টিকতেই পারে না, দেশছাড়া হয়ে পালিয়ে যায়, যা দেখা যায় তা অতি সুন্দর ও দীপ্তিময় ও আনন্দময়। শিশু বয়সে তোমরা এমন সব গল্প শুনতে চাও যা বিয়োগান্ত নয় মিলনান্ত, যার শেষের দিকে সুখ ছাড়া দুঃখ নেই। এই জিনিসকেই বরাবর ধরে রাখতে হবে। দেহ যখন খুব কাতর হয়ে পড়েছে, নিজেকে নিতান্ত অক্ষম বোধ করছ, সেখানে তখন এনে ফেলবে এমন অমিত তেজের স্বপ্ন যার কোনো সীমা পরিসীমা নেই, এমন নির্মল সৌন্দর্য যা কখনো মলিন হয় না। সে স্বপ্ন হবে অদ্ভুত শক্তিমত্তার, যে শক্তি উপরে আকাশ পর্যন্ত ঠেলে উঠতে পারে, যেখানে যাওয়া দরকার সেখানেই গিয়ে হাজির হতে পারে, সকল বিপর্যয়কে খানিয়ে দিতে পারে, সমস্ত রোগ ব্যাধি সারিয়ে দিতে পারে,—যেমন সব স্বপ্ন তোমরা শিশুকালে দেখতে।

বড়োদের দলের পিতামাতা ও শিক্ষকেরা সাধারণত একে তাচ্ছিল্য ক'রে উড়িয়ে দেয়, বলে: "ও কিছুনা, নিতান্ত স্বপ্ন বৈ তো নয়, ভুয়ো জিনিস।" তাই না বলে বরং অল্পবয়স্কদের কাছে বলা দরকার "হাঁ, স্বপ্নে যেমন দেখেছ অমনি হতে পারা চাই, চেষ্টা করলে তা হতেও পারো, যদি তোমার ঐ ভিতরকার ছবির সঙ্গে জাগ্রতে নিজের যোগ রাখতে পারো, জীবনকে অমনিভাবে চালিত করতে পারো। তাহ'লে সাধারণ লোকে যাকে মিথ্যা মরীচিকা বলে তাকেই সত্য ক'রে তুলে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে জীবনের উন্নতি ক'রে যেতে পারবে।"

যাকে বলে মোটা রকমের হিসেবী কাণ্ডজ্ঞান, তারই অনুশীলনের শিক্ষা দিয়ে গোড়া থেকে সাধারণের দলে ভিড়িয়ে দেওয়ার বদলে শিশুদের ঐ ভাবেই গঠিত করা উচিত। নইলে এই মোটা কাণ্ডজ্ঞানের পরামর্শ নেওয়া শেষ পর্যন্ত এমন দুনিবার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় যে, যখনই দেখা যায় কোথাও ভালো কিছু হচ্ছে, অমনি তা অন্তরের মধ্যে উঁকি মেরে কু গাইতে থাকে: "ও, তা ভালোই হয়েছে বটে, কিন্তু এ জিনিস টিকবে না, টিকবে না।" যখনই নজরে পড়ে কোনো মানুষটি বেশ চমৎকার, অমনি সে গাইতে থাকে: "ও, এখনই

চমৎকার বটে, কিন্তু এমনটি তো থাকবে না, মিগ্‌গির বদলে যাবে।" কোনো একটা কাজ যদি খুব ভালো ভাবে ক'রে ফেলতে পারলে, অমনি সে গেয়ে ওঠে : "ও, এবার দৈবাৎ অমনি হয়ে গেছে, কিন্তু কাল আর এমন হচ্ছে না।" সত্তার মধ্যে এ জিনিস থাকে যেন তীব্র অ্যাসিডের মতো, সব কিছু আশা, উৎসাহ, ভবিষ্যতের সম্বন্ধে প্রত্যাশা এই অ্যাসিডে পুড়িয়ে ক্ষয় ক'রে দেয়।

যখন কোনো শিশু মহা উৎসাহের সঙ্গে একটা উদ্দীপনার বার্তা নিয়ে এসেছে, তখন তাকে দমিয়ে দিয়ে কখনই বলবে না "থাক থাক, বাস্তব জীবনে অমনটি বাপু হয় না।" তার বদলে বরং তাকে আরো উৎসাহ দিয়ে বলবে "বেশ বেশ, বাস্তবে যদিও অমন কিছু দেখা যায় না বটে, কারণ সবই এখন বিগ্‌ড়ে গেছে, কিন্তু তার আড়ালে লুকিয়ে আছে অমনি সুন্দর জিনিস, একদিন বেরিয়ে পড়বে। তাকে আগের থেকে চিনতে শেখো, নিজের দিকে তাকে টেনে আনো, তাই হোক তোমার স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার লক্ষ্যবস্তু।"

ছেলেবেলা থেকে যদি এমনি বলতে থাকা হয়, তাহ'লে পরে আর মন্দশিক্ষার কুফল দূর করবার জন্য বেগ পেতে হয় না,—আর যে বোঝা কাণ্ডজ্ঞান জীবনের কোনো কিছুকেই ভালো দেখে না, জীবনকে যে নীরস ও বিরক্তিকর বোঝার মতো দেখে, সকল রকমের আশা প্রত্যাশা ও সুন্দর জিনিসের স্বপ্নকে দূর থেকেই তাড়িয়ে দেয়, তাকে তাড়াবার জন্যও বেগ পেতে হবে না। সুতরাং প্রথম থেকেই ছেলেদের বলবে, আর ছেলেমানুষি মন না থাকলে নিজেকেও বলবে : "আমার মধ্যে উঁ কি বারে যা অবাস্তব, অসম্ভব, কাল্পনিক, সেইগুলোই সত্যিকার অকৃত্রিম জিনিস, অসম্ভব না ভেবে সেই সত্যকে লালন ক'রে যাবো। যখন আমার মধ্যে এমন আস্পৃহার তেজ রয়েছে যা অক্ষমতার অজুহাতে কখনই দমে যাবার নয়, তখন এই নিশ্চয়তাকেই নিজের মধ্যে প্রবল করে তুলবো যে ঠিক জিনিসই আমি ধরেছি, আর একেই শেষ পর্যন্ত সফল ক'রে তুলতে হবে।"

তখন দেহের কোষগুলির মধ্যেও সেই বিশ্বাস বাস্তব হয়ে জেগে উঠবে। তখন দেখবে যে দেহের তরফ থেকেও তাতে সাড়া মিলছে। স্থূলদেহ পর্যন্ত বোধ করতে থাকবে যে ভিতরের ইচ্ছা যখন সহায় রয়েছে, সেখান থেকেও জোর পাওয়া যাচ্ছে, ইঙ্গিত এবং প্রেরণা পাওয়া যাচ্ছে, তখন যা কিছু দোষত্রুটি বা দুর্বলতা ভিতরে থাক তাও আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে।

তার পরে যখন প্রথম অনুভূতি আসতে শুরু করবে, হয়তো অল্প বয়সেই কোনো আভ্যন্তরীণ গভীর আনন্দের স্পর্শটুকু পেয়ে যাবে, সেই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের, আভ্যন্তরীণ আলোর প্রথম সাক্ষাৎও পেয়ে যাবে, তখন তুমি অকস্মাৎ না বলে পারবে না : "ঠিক ঠিক, এই আশ্চর্য জিনিসই তো আমি চাইছিলাম।" সে জিনিসকে তারপর আর কখনও তুমি ভুলবে না, তাকেই অনবরত স্মরণ করতে থাকবে, আর তাকেই সুমুখে তুলে ধরে নিজের মনে বলতে থাকবে : "একবার যখন এর স্বাদ পেয়ে গেছি, তখন আবারও তা পাবোই।

এ কখনো মিথ্যা হতে পারে না, মাত্র এক মুহূর্তের জন্য দেখা দিলেও এ জিনিস আমার কাছে অনন্ত সত্য। যেমন ক'রে হোক একে ফিরিয়ে আনতেই হবে।" দেহকে তুমি তারই সন্ধানে লাগিয়ে রেখে সতত উৎসাহ দিতে থাকবে, আর এই বিশ্বাস নিয়ে চলতে থাকবে যে, আমার দেহের মধ্যেই রয়েছে অনন্ত রকমের সম্ভাবনা, এর দ্বারা তেমন জোরের সঙ্গে চাইতে থাকলে নিশ্চয় একদিন সে জিনিস আবার ভালো ক'রে মিলে যাবে।

অল্প বয়স থেকেই এগুলি অভ্যাস করা দরকার। যখনই নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেবার সময় পাবে তখনই এগুলি করবে, নিজের ভিতরের দিকে চেয়ে নিভৃতে নিজের আরাধির খোঁজ করবে।

আর তখন এটাও দেখতে পাবে : যখন তুমি সরল ও স্বাভাবিক অবস্থাতেই রয়ে গেছ, ভুল শিক্ষা ও কুদৃষ্টান্তের দ্বারা বিকৃত হয়ে যাওনি, সুশৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে সহজ অবিকৃত অবস্থাতে বাস করছো, তখন দেখবে, কোনো দিন যদি অসুস্থ হয়ে পড়ো তাহ'লে তৎক্ষণাৎ আপনা থেকেই বুঝতে পারবে যে নিশ্চয় তুমি এমনিতেই সেরে উঠবে, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই এর জন্য দেহ-মন-প্রাণের সঙ্গে কোনো পরামর্শ ক'রে জানার দরকার হবে না। আশপাশ থেকে ভুল শিক্ষা পেয়েই দেহটা ক্রমে ক্রমে জানতে শুরু করে যে রোগ হলে আর তা সহজে সারে না, কোথাও ভেঙেচুরে গেলে আর তা সহজে জোড়া লাগে না, দেহের বার্ধক্য নিশ্চয়ই এবার দেখা দেবে,—এমন সব সন্দেহের কথায় বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়, আস্থা হারিয়ে যায়। কিন্তু এই সব বিকার না জন্মালে একজন সহজ স্বাভাবিক ছেলের পক্ষে, আমি মনের কথা বাদ দিয়ে শুধু দেহের কথাই বলছি, তার দেহের চেতনাতে আপনা থেকেই এ বোধ জন্মায় যে কোথাও কিছু গোলমাল হলে তা আপনা থেকেই সরে যাবে। এমন বিশ্বাস যেখানে নেই, সেখানে জেনো যে দেহ তার স্বাভাবিক পর্যায়ে নেই, সেখানে অস্বাভাবিকতা ঢুকে গেছে। দেহের পক্ষে সহজ সুস্থ হয়ে থাকাই স্বাভাবিক, বিকল হওয়া বা অসুস্থ হওয়া অস্বাভাবিক। সহজাত প্রবৃত্তি, একটা সহজ অনায়াস প্রবৃত্তিই, তাকে ভরসা দিয়ে রাখে যে সে অটুট ও সক্ষম থাকবে। ভুল ভাবনাই তার এই বিশ্বাস নষ্ট ক'রে দেয়। দুর্ভাগ্যবশত যতই তোমরা বড়ো হতে থাকো ততই মনও উত্তরোত্তর বিকারপ্রাপ্ত হতে থাকে, চারিদিকের প্রভাব ও পাচজনার প্ররোচনার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসো, আর দেহটিও ক্রমে তার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে—আর আত্মবিশ্বাস গেলে যখন দেহের কিছু বিকল হয় তখন আর সেই দেহের সানন্দস্য ফিরে পাবার সহজ স্বাভাবিক ক্ষমতাটুকুও লোপ পায়।

ছেলেবেলা থেকে যদি সেই সব কথা শোনো যাতে দেহকে প্রবঞ্চিত করে, নিরুৎসাহ করে, ভেঙেচুরে দেয়, তাহ'লে তার পরেও সেই দেহ অসুস্থ হলে সেরে ওঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু সে তখন দূষিত শিক্ষার বিপথগামী হয়েছে, মিথ্যাচ্ছন্ন হয়েছে, তার ভিতরকার সেই সহজ শক্তির উপর নির্ভরতা আর নেই, সমুচিত প্রতিক্রিয়া এনে ফেলার তেজটি নষ্ট হয়ে গেছে।

কিন্তু যদি দেহকে ঐভাবে বিকারপ্রাপ্ত হতে না দাও, তাহ'লে জয় করবার নিশ্চিত আস্থা তার মধ্যে থাকবেই। আসলে মনকেই আগে নষ্ট ক'রে ফেলা হয়, তার ফলে দেহও নষ্ট হয়ে গিয়ে তার নিজের আত্মাটুকু হারিয়ে ফেলে।

অতএব প্রথম কথাই হলো এই যে ছেলেমেয়েদের আভ্যন্তরীণ নিশ্চয়তাকে নষ্ট হতে না দিয়ে বরং তাকে আরো বাড়িয়ে তুলতে হবে। তাহ'লে কোনো আশাকে সফল করবার জন্য আর প্রাণপাত করতে হবে না, আপনা হতেই তার সাফল্য ফুটে উঠবে, জয় সম্বন্ধে আভ্যন্তরীণ নিশ্চয়তা আপনিই কাজ করবে। দেহের মধ্যে রয়েছে তার দিব্যত্ব। সে দিব্যত্ব যদি হারিয়ে ফেলে থাকো, আবার তাকে খুঁজে বের করো।

তাহ'লে কোনো শিশু যদি কোনো আশ্চর্য স্বপ্নের কথা তোমাকে শোনাতে আসে, কত রকম আশ্চর্য শক্তির কথা ও সুন্দরের কথা বলতে থাকে, তখন যেন আদৌ তাকে এমন কথা বলোনা "ও, এ সব বাস্তব জীবনের কথা নয়," তাতে খুবই ভুল কাজ করা হবে। তার বদলে বরং এই কথাই তাকে বলো "বাস্তব জীবনেও এমন হতে পারে, আর নিশ্চয়ই তা একদিন হবে!"

* * *

প্রশ্ন : কখন বলা যেতে পারে যে আমি পূর্ণ যোগের পক্ষে উপযুক্ত?

উত্তর : যখন সকল রকম অবস্থাতেই তুমি আত্মার মধ্যে পুরোপুরি সমতা রাখতে সক্ষম হয়েছ। এটি অপরিহার্য, সব চেয়ে দরকারী ভিত্তিস্বরূপ; খুবই স্থির, খুবই প্রশান্ত, অবিকম্প অবিচল হয়ে থাকা, আর ভিতরে ভিতরে অটল শক্তি বোধ করতে থাকা। তা জড়তার নিশ্চেষ্ট নিশ্চলতা নয়, ভিতরে এমন কেন্দ্রীভূত শক্তি সঞ্চিত থাকবে যাতে কিছুতেই তোমাকে ভয় দেখিয়ে টলাতে পারবে না, সকল অবস্থাতেই তুমি অখণ্ড সমতা রেখে যাবে, এমন কি জীবনের দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যেও।

এ অবস্থাটি আসবার আগে এমন কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় যাতে বেশ বোঝা যায় যে অনেকটা তুমি এগিয়েছ।

যেমন মনে করো, এমন এক সময় আসে যখন স্পষ্ট দেখবে যে সাধারণ চেতনার গণ্ডী-টুকুর মধ্যে তুমি নিতান্ত বন্দীর মতো হয়ে আছো, অতি সংকীর্ণ সেই কঠিন বদ্ধ কারাগার চারদিক থেকে তোমাকে পিষে মারছে। তোমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, অসহ্য অবস্থার মধ্যে হাঁপিয়ে উঠে নিজেকে প্রাণপণে মুক্ত করতে গিয়ে যেদিকে ফিরছো সেই দিকেই দেখছ বস্তুধাতুর সুকঠিন দেয়াল, তাতে অনবরত মাথা ঠুকে যাচ্ছে।

এর মানে তখন তোমার চেতনা এমন অবস্থাতে গিয়ে পৌঁছেছে যখন বাইরের সেই সংকীর্ণ ছাঁচের নির্দিষ্ট সীমার গণ্ডীটুকু আর তোমাকে ধরে রাখতে পারছে না। সাধারণ জীবন, সাধারণ কাজকর্ম, সাধারণ মনুষ্যসম্পর্ক সমস্তকেই মনে হচ্ছে অতি অকিঞ্চিৎকর,

অতি তুচ্ছ ! তখন তোমার মাঝে এক প্রবল শক্তি চাড়া দিয়ে উঠেছে, যে এই সংকীর্ণ খোলসটিকে ফাটিয়ে দিয়ে মুক্ত চেতনাতে বেরিয়ে আসতে চায়।

আরো এক লক্ষণ এই যে, যখনই তুমি আশ্পৃহা নিয়ে তার মাঝে তন্ময় হয়ে থাকবে, তখনই দেখবে একটা তেজ, একটা আলো, একটা শান্তি তোমার ভিতরে নেমে আসছে,—যখনই তুমি আশ্পৃহাতে উন্মুখ হয়ে উঠছো তখনই তার কিছু জবাব এসে পড়ছে। এমন হলে বুঝবে যে উপরের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে।

* * *

প্রশ্ন যখন বোধ আসবে যে ভয়ংকর সংকীর্ণতায় আমি বন্দী, তখন কি করা উচিত ?

উত্তর সব চেয়ে প্রথম কথা, কোনো জোর করতে যাবে না। তাতে ফল কিছুই হবে না, কেবল নিজেই ক্লিষ্ট হয়ে পড়বে।

নিজের ভিতরকার আলোকশিখাটির সম্বন্ধে যদি অবহিত থাকো, তাহ'লে সমস্ত আশ্পৃহাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত ক'রে তীব্র একাগ্রতার সঙ্গে কেবল তাকেই চাইবে। যা-কিছু তোমার আছে সমস্ত তাতেই আহুতি দেবে, সমস্তই তাতে জ্বলে উঠুক, কিন্তু নিজে থাকবে স্থির প্রশান্ত হয়ে। যদি নিজে চঞ্চল হয়ে ওঠো, অস্থির ও বিচলিত হয়ে পড়ো, তাহ'লে কিছু লাভ হবে না। ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে, বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকবে, তাতে জবাব নিশ্চয়ই আসবে।

আর যখন তুমি সমস্ত শক্তি ও আশ্পৃহা নিয়ে সেই শিখার মধ্যে একাগ্র হয়ে অবস্থান করছো, তখন ধীরে ধীরে বাইরের আবরণগণ্ডীর উপর ক্রমাগত চাপ দিতে থাকবে, জোর ক'রে নয় কিন্তু নির্বন্ধসহকারে, কিছুমাত্র ব্যস্ত, বিরক্ত বা উত্তেজিত না হয়ে।

এতে নিশ্চয় ফল পাবে। প্রথম চেষ্টাতেই কিছু হবে না এটা ঠিক কথা, কিন্তু যতবার পারো আর যতক্ষণের জন্য পারো এই চেষ্টা শুরু ক'রে দাও, তারপর হঠাৎ এমন দিন আসবে যখন একেবারে মুক্ত হয়ে তুমি বেরিয়ে আসবে সীমাহীন জ্যোতিঃসমুদ্রের মধ্যে।

* * *

প্রশ্ন বুদ্ধকে শ্রীঅরবিন্দ অবতার বলেন, কিন্তু বুদ্ধের সেই সব শিক্ষা ও অনুশাসনগুলি বর্ত্তমানের ক্ষেত্রে অতিমানস অভিব্যক্তির সহায়ক হবে না প্রতিবন্ধক হবে ?

উত্তর : যার দ্বারাই মানবের অগ্রগতি হবে তাই হবে সহায়ক, আর যার দ্বারা তার গতিরোধ হবে তাই হবে প্রতিবন্ধক।

বুদ্ধ প্রভৃতি যাঁদের মধ্যে যতবার ভগবৎশক্তি অবতাররূপে প্রকাশ পেয়েছিল তার প্রত্যেক

স্বলেই একটা বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্ববিবর্তনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে তার সময়ানুযায়ী বিশেষ কিছু কাজ করবার ছিল, কিন্তু মূলতঃ তা একই বস্তু ও একই সত্তার বিভিন্ন দিকের বিকাশ ; তার মধ্যে তফাৎ ছিল কেবল কর্মবৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে, নতুবা সে একই সত্য, একই শক্তি, একই শাশ্বত জীবন, কেবল বিভিন্ন আকৃতিতে তার অভিব্যক্তি ঘটেছে বিশেষ বিশেষ হেতু ও উদ্দেশ্য নিয়ে। ইতিহাসে চিরদিনই এমনি ঘটে চলেছে, নতুন কিছু উন্নতি আনতে হলেই তখন তার কিছু নতুন রূপ নিয়ে নতুন ক'রে আসবার দরকার হয়। আগেকার অবতারের দেওয়া পুরনো জিনিসটিও তখন বজায় থাকে, স্পন্দন বা ধ্বনির রেশের মতো, কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে তার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা ছিল কেবল সাময়িক, অতঃপর আরো বেশী প্রগতির জন্য পূর্বরূপের বদলে আবার নতুন রূপের দরকার হয়েছে। মানুষ কিন্তু এই ভুলটি করে, সে চিরদিন কেবল পিছনের জিনিসকেই আঁকড়ে থাকে, সে চায় যে অতীতে যেমন চলেছিল তেমনি চিরদিনই চলতে থাকুক।

আবার ব্যক্তি-উন্নতির বেলাতেও সেই কথা। প্রত্যেকের বেলাতেই একটা ক্রমিক ইতিহাসের স্থান রয়েছে, সুতরাং আগেকার ঐ সব শিক্ষা যতদিন পর্যন্ত বাস্তবিক তোমার কাজে লাগবে ততদিন পর্যন্ত অবশ্যই তাকে গ্রহণ করবে। ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে তখন তুমি ধম্মপদের নির্দেশ মেনে চলতে পারো, কিন্তু যখন সে ধাপ পার হলে তখন আবার অন্য কিছু ধরবে, তখন দেখবে যে আপন ইতিহাসে এক সময় যা খুবই কাজের ছিল এখন আর তা নেই। যারা কতকটা উন্নতির স্তরে গিয়ে উঠেছে আর মনের উপর খানিকটা দখল পেয়ে গেছে, তাদের আমি কখনই বলব না যে "ধম্মপদ পড়তে থাকো আর তারই ধ্যানে লেগে থাকো"। তাতে কেবল সময় নষ্ট হবে। যারা অতটা ধাপ পার হয়নি তাদেরই দরকার বুঝলে আমি তাই করতে বলব।

কিন্তু মানুষ ঘাড়ের উপর যত খুশি কেবল বোঝাই চাপাতে থাকে। অতীতের কোনো কিছুকেই সে ফেলতে চায় না, কেবল তার অনাবশ্যক বোঝার ভারে নিজেই নুয়ে পড়ে।

খানিকদূর পর্যন্ত তুমি পথ দেখাবার একজন নির্দেশক পেয়েছিলে, সে ভালো কথা। তার পর যখন সে রাস্তাটি পার হয়ে এলে তখন রাস্তা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকেও তুমি ছেড়ে দাও, এখন আরো আগের রাস্তা ধরো। এই সহজ কথাটি লোকে বুঝতে চায় না। যার থেকে কিছু কাজ পেয়েছে তাকেই ধরে বসে থাকবে, সেখান থেকে আর নড়তে চাইবে না। খ্রীষ্ট-ধর্ম ধরে যারা কিছু এগিয়েছে তারা আর সেটিকে ছাড়বে না, তারই বোঝা বইতে থাকবে ; বৌদ্ধধর্ম ধরে যারা কিছু এগিয়েছে তারাও সেটিকে ছাড়বে না, তারই বোঝা বইতে থাকবে, তাতে গতি যতই মন্থর হোক কিংবা আগুয়ান হতে যতই বিলম্ব হোক।

একটা ধাপ যখন পেরিয়ে গেছ তখন সেটি ছেড়ে দিয়ে তার কথা ভুলে যাও। আবার পা দাও নতুন ধাপে।

*

প্রশ্ন : জগতের বর্তমান অবস্থা যাতে পাল্টে যায় সে বিষয়ে কী রকমে সাহায্য করা যেতে পারে ?

উত্তর : এমন অনেক মানুষ আছে যারা জগতের বর্তমান অবস্থার দিকে চেয়ে যথার্থই হতাশ হয়ে আক্ষেপ করতে থাকে "জগতের এত বেশী খারাপ অবস্থা এলো কেন ?" কিন্তু তাই নিয়ে শুধু বিলাপ ক'রে কোনো ফল নেই, এমন অবস্থাকে বদলানোই এখন দরকার। খারাপ তো হয়েই পড়েছে—সকলেই এ সম্বন্ধে একমত—যেমন হওয়া উচিত তেমন নেই, অতএব সকলেরই উচিত যাতে এখনকার অবস্থা অন্যরকম হয়ে-দাঁড়ায় তাই করা।

কিন্তু উপায় কি ? ব্যক্তিগতভাবে আমরা কতটা কি করতে পারি ?

এক উপায় আছে যা প্রত্যেকেরই সাধ্যের মধ্যে : নিজেকে বদলানো। নিজেকে যদি এই কথা শোনাতে থাকো "নিজে কেমন তা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু যে সব জিনিস রয়েছে আমার উপাদানের মধ্যে তাই নিয়েই আমার কাজ, সেই কাজ যদি আমি সাধ্যমত ভালোভাবে ক'রে যাই তাহ'লেই আমার পক্ষে সব চেয়ে বড়ো কর্তব্য করা হবে।" এই ভাবটি নিয়ে আপাতত শুরু করা যেতে পারে, তাতেই যথেষ্ট হবে। এটুকু করা অসম্ভবও কিছু নয়, তোমার সাধ্যসীমার বাইরে কিছুই করতে বলা হচ্ছে না। তোমার সামর্থ্যের অনুপাতে খানিকটা কর্মের ক্ষেত্রও তোমার হাতে রয়েছে, সে ক্ষেত্র নানা দিকে বিস্তৃত ও নানা সম্ভাবনাপূর্ণ, তা কম কিছু নয়, তোমার উৎসাহ আসবার পক্ষে তাই যথেষ্ট, সেও এক অজ্ঞাত জগৎ যার ভিতর থেকে তুমি অনেক নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারো।

তুমি হয়তো বলবে : "কিন্তু এ তো স্বার্থপরতা হলো, নিজের দিক দেখাই হলো।" তা হতে পারে যদি তুমি নিজের লাভ হচ্ছে ভেবে নিজেরই দিকে নজর রেখে ওগুলি করতে থাকো। যেমন মনে করো, তুমি শক্তি বাড়াতে চাইছ যাতে নিজে অন্যের উপর প্রভুত্ব ফলাতে পারো, যাতে নিজের জীবনকে আরামে রাখার উপায়গুলি তোমার আয়ত্তে আসে। এমন যদি হয় তাতে স্বার্থপরতার কাজ হবেই। আর, মনে রেখো, ওতে কোনো লাভও হবে না। তখন নিজেই নিজেকে ঠকাতে শুরু করবে, উত্তরোত্তর ভ্রান্তির মধ্যে জড়াতে থাকবে, আরো গভীরতর তমসার মধ্যে ডুবে যেতে থাকবে। তোমার ধারণা-বুদ্ধি থই পায় না, এমনই ভাবে রয়েছে জিনিসের সব ব্যবস্থা।...আসল দরকার হলো নিজের কথা বাদ দিয়ে ভগবানের কাজকে সফল ক'রে তোলা, তারই জন্য আস্পৃহা জাগিয়ে রাখা, আর সেই আস্পৃহাকে পুরোপুরি ঐকান্তিক ক'রে তোলা।

ঐভাবে যদি কাজ করতে শুরু করো, তাহ'লে আমি নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলতে পারি, তোমাদের জীবনযাত্রা এতই চিত্তাকর্ষক হবে যে সাফল্য আসতে বিস্তর সময় লাগলেও সেজন্য কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করবে না। যদি থাকে দৃঢ়সংকল্প, অধ্যবসায় আর প্রফুল্লতা, যদি সমস্ত বাধা ও দোষত্রুটিকে হেসে উড়িয়ে দাও, তাহ'লে তার শেষফল ভালো হবেই।

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "অতিমানস অভিব্যক্তি" (The Supramental Manifestation) বইখানিতে লিখেছেন—"অতিমানসের অবতরণ হলে যে তাকে গ্রহণ ক'রে সত্যচেতনায় সিদ্ধ হবে, তার পক্ষে দিব্যজীবনের সকল সম্ভাবনাই সফল হবে। আধ্যাত্মিক জীবনে যত কিছু অসাধারণ অনুভূতির কথা আমাদের আগের থেকেই জানা আছে কেবল সেইগুলিই নয়, কিন্তু যাকে আপাতত আমরা ঐ সম্ভাব্যের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে থাকি তাও আসবে আয়ত্তের মধ্যে।" কোন জিনিসকে সম্ভাব্যের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়?

উত্তর : তা নিজেদেরই উপর নির্ভর করে। এখানে আমরা বলে থাকি যে কোনো কিছুই বাদ দেবো না। তাই হলো ঠিক কথা। মানুষের পক্ষে সম্ভাব্য সকল রকম জিনিসই আমরা ওর অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়েছি, এমন কি যা আদৌ আধ্যাত্মিক বলে ধরা হয় না তাও। অবশ্য এ কথা স্বীকার করি যে তেমন স্থূল জিনিসের প্রকৃতি বদলানো খুব কঠিন। কিন্তু আমরা সেই চেষ্টাই করি, ঐকান্তিক শুভ-ইচ্ছা যথাসম্ভব তাতে প্রয়োগ করি।

প্রশ্ন তবে যে বলা হয় অতিমানসের অবতরণে সব রকমের পরিবর্তন আনা সহজ হবে?

উত্তর : তা হতে পারে। কেবল দুই জায়গায় প্রবল বিরোধিতা রয়েছে—রাজনীতির দিকে আর অর্থনীতির দিকে। এই দুই বিষয়ে মানুষের মনোভাব বদলানো সব চেয়ে কঠিন।

মূল সূত্র হিসাবে আমরা বলে থাকি যে রাজনীতির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই, আর বাস্তবিকই তাই, বর্তমান রাজনীতির ত্রিসীমানায় যাই না। কিন্তু রাজনীতি জিনিস-টাকে যদি তার প্রকৃত অর্থে ধরা হয়, অর্থাৎ এক দেশের মানবগোষ্ঠিকে নিয়ে তার রাজ্য গড়া ও সেখানকার শাসনপদ্ধতির যা-কিছু বিলিব্যবস্থা করা, তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা ও অন্যান্য মানবগোষ্ঠির সঙ্গে অর্থাৎ অন্যান্য জাতি ও দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা তাহ'লে তাও এসে পড়বে অতিমানস রূপান্তরের প্রশ্নের মধ্যে, কারণ যতদিন পর্যন্ত জাতীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ বর্তমান অবস্থাতে রয়েছে ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে অতিমানস-জীবন আসা অসম্ভব। সুতরাং এ জিনিস বদলানো দরকার, এবং তার জন্য সমুচিত চেষ্টারও দরকার।

অর্থনীতির প্রশ্ন—অর্থাৎ যার কল্যাণে সম্ভব উৎপাদন ও বিনিময়—তা কিন্তু চাই সহজ, অর্থাৎ তার সহজ হওয়া দরকার। প্রাচীনকালে যে পদ্ধতি ছিল এক জিনিস দিয়ে তার বিনিময়ে অন্য জিনিস নেওয়া, তার চেয়েও সহজ হওয়া চাই। জগতে সকলের

অস্তিত্বের পক্ষে সর্বজনীন প্রয়োজনের দিকটাই আগে দেখা চাই, জীবনকে সহজ ক'রে আনতে হলে তা অতি অপরিহার্য। এমনই কিন্তু মনুষ্যচরিত্রে যে ঠিক তার উল্টো ব্যাপারই চলেছে, আর তা বর্তমান কালে এমনই সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রাখা অসম্ভব হচ্ছে, অর্থ-বিনিময়ের যে প্রখ্যাত পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক লেনদেনের কাজটিকে সহজ ক'রে আনতে, তা এমনি জটিলতায় পরিণত হয়েছে যে শীঘ্রই তা অচল হয়ে পড়বে,—এমন অবস্থার কাছাকাছি এসে পৌঁছনো গেছে যে অনেক-কিছু করবার থাকতেও কোনো কিছুই করা যাবে না। সামান্য জিনিস যদি অন্য দেশ থেকে এ দেশে আনাতে চাও তাহলে তার জন্য এত জটিলতার ভিতর দিয়ে যেতে হবে ও এতই কষ্ট স্বীকার করতে হবে যে তোমার মনে হবে, এর চেয়ে ঘরে বসে নিজের জমিতে আলুর চাষ ক'রে খাওয়াই ভালো, জগতে কোথায় কি হচ্ছে আর কোনখানে কি জিনিস জন্মাচ্ছে তার খোঁজ নেবার দরকারই নেই।

রাজনীতি আর অর্থনীতি (finance), এই দুটি দিকেই সব চেয়ে বেশী বাধা। মানব চেতনার রাজ্যে এরা বাসত্ব করছে অজ্ঞানের ও নিশ্চেতনার শক্তির আর ব্যাপকভাবে কু-মৎলবের। এরা উন্নতির পথে ও সত্যের পথে যেতে নারাজ, আর ব্যক্তিগত মানুষের মধ্যে এরাই দাঁড়ায় প্রতিবন্ধক হয়ে, তাদের রেখে দেয় নির্বোধ ও সংকীর্ণচেতা ক'রে, যাতে অভ্যস্ত হয়নি এমন কোনো কথা তারা বুঝতেই চায় না। অতএব এই ব্যাপারের মধ্যে রূপান্তর আনতে চেষ্টা করা প্রকৃত বীরত্বের কাজই বলতে হবে। কিন্তু তাও চেষ্টা করা হচ্ছে, কারণ তদ্ভিন্ন পৃথিবীর এই অচল অবস্থাকে বদলানো অসম্ভব হয়ে উঠবে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বদলানোর চেয়ে ধনবৈজ্ঞানিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে বদলানো অপেক্ষাকৃত সহজ। ধনবৈজ্ঞানিক ও সমাজনৈতিক ব্যাপারে মানুষের মন পেয়েছে কতকগুলি ব্যাপক ও বস্তুতান্ত্রিক ধারণা, খানিকটা মুক্তি ও প্রসার, এমন একটা সৃষ্টি-গত বা যৌথ প্রতিষ্ঠান বা একান্ত নিরর্থক বা অলভ্য নয়। কিন্তু যেমনি অন্য দুটি বড়ো জায়গাতে হাত দিতে যাবে, বিশেষত রাজনীতির ব্যাপারে, অমনি সব জিনিস ধরে অন্য চেহারা··· ঐরূপ আর্থিক জটিলতা থেকে বিমুক্ত জীবন সম্বন্ধে কল্পনা করা যায়, যদিও—শুধু মুখের কথাই নয়—তা হবে বাস্তবিক নিষ্প্রভ দরিদ্র জীবন। এই যা আনে আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা, অর্থনৈতিক উপায় সব, তার মধ্যে নিহিত বিপুল ঐশ্বর্যের সম্ভাবনা; যদি অবশ্য সব সঠিক মনো-ভাব নিয়ে সঠিক রাস্তায় সদ্ব্যবহার করা যায়, তাহলে মানুষের উন্নতির সকল প্রয়াস ও সকলের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধও তা সহজ করে দেয়, জীবনের যে বৈচিত্র্য আর অন্য কোনো উপায়ে পাওয়া যেতো না তা-ও এনে দেয়। কিন্তু কেন জানিনা, হয়তো সর্বোত্তম অবস্থা আসবার ঠিক আগেই সর্বাধম অবস্থা এসে উপস্থিত হয় তাই, কিন্তু বর্তমানের অবস্থাটা এমনই বিসদৃশ হয়েছে যে—যদিও এখন এরোপ্লেনে মাত্র দুদিনের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যেতে পারো; যদিও এখনকার নানা আবিষ্কারের দ্বারা জীবনের সব কাজই আগের চেয়ে

অনেক "সংক্ষেপে" সারা যায়, সেই আশী দিনের বদলে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা যায়,—তবু কিন্তু টাকাকড়ির বিনিময়ের ব্যাপারটা এতই গোলমেলে যে নিজের গণ্ডীর বাইরে দেশ ছেড়ে অনেকের বিদেশে যাবার উপায় নেই, কারণ বিদেশে গিয়ে থাকার মতো অর্থাদি তাদের মিলবে না, কর্তৃপক্ষের কাছে তা চাইতে গেলেই তাদের শুনিয়ে দেওয়া হবে : "যদি বিদেশে যাওয়া খুবই দরকার হয়ে থাকে তাহ'লে কিছুকাল সবুর করো, কারণ তেমন অর্থ-বিনিময় দিতে পারা আপাতত আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন।" এ হাসির কথা নয়, প্রকৃতই এমনি হচ্ছে। বিজ্ঞান যদিও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে এমন কাছাকাছি ক'রে এনেছে যে কোনো এক বিশেষ দেশের অধিবাসী বলার বদলে এখন আমরা নিজেদের জগৎ-বাসী বা বিশ্ববাসী বলতে পারি, কিন্তু বাস্তবের খেলাতে যে যেখানে জন্মেছে তাকে সেখানেই আরো বেশী ক'রে বন্দী হয়ে থাকতে বাধ্য হতে হচ্ছে।

আমাদের বর্তমান অবস্থাটা এমনি। গত যুদ্ধের পর থেকে এই অবস্থা এসেছে আর তা উত্তরোত্তর আরো খারাপ হচ্ছে। মানুষ এমনই এক অবস্থাগতিকের মধ্যে পড়ে গেছে যে, নিজেদেরই পাকানো জটগুলো ছাড়াতে না পেরে তারা জগতের সর্বত্রই নরিয়া হয়ে এক উদ্ভট কল্পনার কথা বলতে শুরু করেছে—এবার একটা বিরাট রকমের ধ্বংস আসা দরকার, তাহ'লে সব-কিছুই সহজ হয়ে যাবে।

এদিকে বাধা, ওদিকে বিধু, এদিকে যাওয়া অসম্ভব, ওদিকে যেতে বারণ, এদিকে আইনের দেয়াল গাঁথা, এমনি ক'রে চারদিক থেকে মানুষকে প্রতি মুহূর্তে এমনই পিষে রেখেছে যে এখন তাদের দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম, সেই কারণেই সকলের মনে এই আশ্চর্য ভাবটি দেখা দিয়েছে যে এবার সবকিছই যদি ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তাহ'লে হয়তো একটা কিনারা হতে পারে। এইভাবে মানুষ যেন এখন বাতাসে ভাসছে, আর দেশবিদেশের গভর্নমেন্ট-গুলিও এমন সংকটাবস্থায় পড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে রয়েছে যে, তাদেরও মনে হচ্ছে এবার সব-কিছু ভেঙে নষ্ট না করলে আর এগোনো যাবেনা।...এ কেবল একটা সম্ভাবনার কথাই বলছি না, এমনও হবার যথেষ্ট আশংকা আছে আর মানুষের জীবন এর চেয়ে আরো বেশী দুর্বিষহ হয়ে উঠবে কিনা তাও বলা যায় না, কারণ এরা নিজেরাই নিজেদের জটিলতা ক্রমশ আরো বাড়িয়ে চলেছে।

এদিকে একটা নতুন আশাও মানুষের চেতনাতে দেখা দিয়েছে, হয়তো ভালোর দিকে এবার নতুন সামঞ্জস্যকারক একটা কিছু এসে পড়বে—কিন্তু পূর্বোক্ত আশংকাটি তার পিছনে ছায়ার মতো লেগে আছে। বর্তমান জীবনযাত্রার অসঙ্গতি যতই বাড়ছে ততই একটা আমূল পরিবর্তনের দরকারও তীব্রতর হচ্ছে। আর এই দুই বিপরীত রকমের সম্ভাবনা পরস্পর এমন মুখোমুখি হয়ে রয়েছে যে যে-কোনো মুহূর্তে পরস্পরের সংঘর্ষে একটা বিষম বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে।

পৃথিবীর এই এখন অবস্থা, নিশ্চয়ই তা খুব সুখের কথা নয়। আমাদের দিক থেকে

তবু একটা আশা আছে। সে কথা অনেকবারই তোমাদের বলেছি। যদিও বাইরের জগতে বিপর্যয়কে না এড়ানো যায়, তবু আমরা যারা অতিমানস-জীবনের স্বপ্নকে মিথ্যা বলে ভাবি না, বিশেষত যাদের মধ্যে সেই স্বপ্নকে সত্যে সফল ক'রে তোলার সম্বন্ধে আস্থা ও আশ্পৃহা রয়েছে,—আমি কেবল এই পণ্ডিচেরী আশ্রমের লোকেদের কথাই বলছি না, কিন্তু যে যেখানে শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞানবার্ত্তার উপর আস্থা রেখে তারই উপর নির্ভর করার আন্তরিক সংকল্প নিয়ে এক সূত্রে মিলিত হয়েছে, তাদের সকলের কথাই বলছি—তারা তবু অনেক কিছুই করতে পারে। তাদের আশ্পৃহা, ইচ্ছা ও চেষ্টাকে আরো প্রবলতর করতে পারে, শক্তিকে কেন্দ্রীভূত ক'রে সাফল্যের সময় আরো সংক্ষেপ ক'রে আনতে পারে, ব্যষ্টিগত ও খানিকটা সমষ্টিগত দিক দিয়ে এক অঘটনও ঘটাতে পারে, স্থান-কালের প্রভাবকে পরাজিত করতে পারে, সিদ্ধির জন্য সময়ের সংক্ষেপ করতে পারে, কালের বিলোপ করতে পারে ব্যক্তিগত প্রয়াস দিয়ে, মন্থর গতিকে ছাড়িয়ে এত দ্রুতবেগে এতদূর সাফল্যের পথ অতিক্রম করতে পারে যাতে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার প্রভাব তাকে স্পর্শ করতে না পারে ; আর তারা সত্যের শক্তি তেজ ও আলোকে কেন্দ্রীভূত ক'রে সিদ্ধি পেয়ে উপরের আলো এবং বিশুদ্ধতার আশ্রয়ে গিয়ে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে এখানে রূপান্তরের দ্বারা এমন বিশুদ্ধতা আনতে পারে, যাতে অদূর ভবিষ্যতের আশাকে কিছুমাত্র নষ্ট না করে এই বিপুল ঝড়টা পৃথিবীর উপর দিয়ে নিরাপদে বয়ে চলে যায়, নব সাফল্যের প্রারম্ভেই সে আশার সমস্ত কিছুকে উড়িয়ে নিয়ে না যায়।

আপন নিয়মে যা হয়ে যাচ্ছে তা আপনা থেকেই হোক, এই কথা বলে নিশ্চিন্ত আলস্যে না ঘুমিয়ে যদি তোমরা আপন আপন আশ্পৃহা, চেষ্টা ও উদ্দীপনাকে জাগিয়ে রেখে আলোর রাজ্যে বেরিয়ে আসতে পারো, তাহ'লে তোমরা সতেজে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারবে, উচ্চ চেতনার রাজ্যে নিজেদের স্থান ক'রে নিতে পারবে, আর প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার মধ্যেও স্বচ্ছন্দে শ্বাসগ্রহণ ক'রে উত্তরোত্তর উন্নতিই করতে থাকবে।

অল্পের মধ্যে তা করা সম্ভব···গত যুদ্ধের সময় শ্রীঅরবিন্দ তো করেছিলেন। পুনরায় সেটি করা যেতে পারে, কিন্তু ইচ্ছার তেমনি জোর থাকা চাই, আর প্রত্যেককেই নিজেদের কাজটুকু সাধ্যমত ঐকান্তিক পূর্ণতার সঙ্গে সম্পন্ন করা চাই।

* * *

প্রশ্ন : অতিমানসের জগতে গুহ্যবিদ্যার স্থান কি হবে? তখন সবকিছুই তো জানা হয়ে যাবে, তাহ'লে গুহ্যবিদ্যা শেখার কোনো আর প্রয়োজন থাকবে কি?

উত্তর : তোমরা কি ভেবেছ যে গুহ্যবিদ্যা শেখা খানিকটা পিয়ানো বাজাতে শেখার মতো? তা ঠিক নয় ; এ হলো জড়ের স্তরের অনেক উপরকার চেতনার জিনিস নিয়ে কথা। এই দিক দিয়ে তোমার যদি বিশেষ কিছু প্রবণতা না থাকে, তাহ'লে গুহ্যবিদ্যা নিয়ে যতই পড়াশোনা করো কিছুই ফল হবে না। এ হলো এক আলাদা ক্ষমতা।

অবশ্য এ কথাও ঠিক যে পিয়ানো বাজানোর সম্বন্ধে অনেক পড়াশোনা করা সত্ত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের হাতে না শিখছো ততক্ষণ পর্যন্ত বাজানো তোমার আসবে না। এমন মানুষ আছে যারা গানবাজনার স্বাভাবিক পটুতা নিয়েই জন্মেছে, শিল্পী প্রভৃতি হয়েই জন্মেছে, আবার এমন মানুষ দেখা যায় যারা সারা জীবন ঐ নিয়ে ঘষতে থাকলেও কিছুই করতে পারে না। গুহ্যবিদ্যা সম্বন্ধেও সেইরকম কথা। যদি তুমি মনে করো যে অতিমানস পেলে তোমার সকল বিষয়েই কিছু অধিকার জন্মাবে, সে ঠিকই কথা ; কিন্তু তাই বলে সকল রকম গুণই যে আপনা থেকে এসে যাবে এমন নয়। ভিতরে ভিতরে তোমার শক্তি জাগতে পারে, কিন্তু বাইরে তাকে কাজ ফলাতে পারবে না। গুণের বিভিন্নতা ও পার্থক্য তখনও থাকবেই, যে যেমন মানুষ আর যার যেমন ব্যক্তিগত ঝোঁক সেই অনুসারেই প্রত্যেকে এক একটা বিশেষ ধরনের গুণ দেখাবে। আর অতিমানসের জগতে গুহ্যবিদ্যাই বা থাকবে না কেন, যেমন আর সব বিদ্যাও থাকবে তেমনি এটিও থাকবে।

অতিমানস সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি ? সে কি এমন এক স্বর্গ যে সবাই সেখানে সব রকমের কাজ একই প্রকারে ক'রে যাবে, তফাৎ কিছু থাকবে না...যেন সেকালের রূপকথার পরীরাজ্যের মতো, যেখানে সবাই পরী হয়ে বীণা বাজায় ? তা ঠিক নয়। সেখানেও প্রভেদ থাকবে, গুণের ও কাজের ভাগাভাগি আর ভালোবাসের প্রভেদ থাকবে : কেবল এখনকার মানুষের অজ্ঞানতা নিয়ে কাজ করার বদলে তখন সম্পূর্ণ জ্ঞানের সঙ্গেই সবাই নিজের নিজের কাজ ক'রে যাবে, এই হবে তফাৎ।

*

প্রশ্ন : অতিমানস-জীবনে কি গুহ্যশক্তি এখনকার চেয়ে অনেক বেশী বাড়বে না ?

উত্তর : গুহ্যবিদ্যা বলতে তোমরা মনে করো যার দ্বারা জীবনের উপর ও সকল কিছুর উপর যথেচ্ছা শক্তির কাজ দেখানো যায়। কিন্তু সে গুহ্যবিদ্যা নয়, তার নাম যাদুবিদ্যা।

গুহ্যবিদ্যাতে চেতনাকেই বিশেষভাবে প্রয়োগ করা যায়। এখন যে ভাবে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে, তাতে অদৃষ্ট শক্তিকেই সরাসরি আয়ত্তে এনে সচেতনভাবে কাজে লাগানো হয়। তুমি যদি তাকে প্রত্যক্ষভাবে আয়ত্ত করতে পারো তাহ'লে প্রত্যক্ষভাবে তাকে কাজেও লাগাতে পারো, আর প্রবল ইচ্ছার জোরে তার দ্বারা মনোমত ফলও পেতে পারো।

* * *

প্রশ্ন : অতিমানসের সময়ে কি সে শক্তি আপনা থেকেই আয়ত্তে আসবে না ?

উত্তর : আপনা থেকে !...তা অবশ্য নিজের অজ্ঞাতে সবাই একটু আধটু

গুহ্যবিদ্যা প্রয়োগ ক'রে থাকে। সকলেরই এ শক্তি আপনা থেকে কিছু আছে, যদিও তা খুবই সামান্য, আলপিনের মাথাটুকুর মতো, আবার সে শক্তি খুব বেড়েও যেতে পারে, যেমন পৃথিবী কিংবা বিশ্বের মতো। একটু গুহ্যবিদ্যা না থাকলে তোমরা বাঁচতেই পারতে না, যদিও তা নিজেরা জানোনা। অতিমানস-চেতনাতে তা জানবে, এই হবে তফাৎ।

আমি তাই প্রায়ই বলি যে চিন্তাকে যখন নিয়োগ করছো তখন একটা গুহ্যবিদ্যারই কাজ করছো। যখন কারো বিষয়ে ভাবতে থাকো, তখন তোমার থেকে একটু কিছু সেখানে চলে গিয়ে তাকে একটুখানি স্পর্শ করে। আর অমনি চিন্তার সঙ্গে যদি একটা জোরালো ইচ্ছা জুড়ে দিয়ে বলো যে ঐ লোকটি এমন হোক বা তেমন হোক, সে এই করুক বা তাই করুক, এই কথা জানুক বা সেই কথা জানুক, তাহ'লেই তখন গুহ্যবিদ্যা প্রয়োগ করা হলো।

কেউ কেউ এটি খুবই জোরের সঙ্গে করতে পারে, এবং চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তির জোর থাকলে তা বাস্তবে সফলও হয়। কারো কারো এ শক্তি খুব নিরীহ, বড়ো রকমের কিছু ঘটাতে চায় না। মোটের উপর এটি নির্ভর করে চিন্তাশক্তির জোর ও তার কেন্দ্রীকরণের উপর। নতুবা এমনিতে সবাই করে। কেবল যে গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী তার অনেকটা জানা থাকে যে কেমন ক'রে এ শক্তিকে ভালভাবে কাজে লাগাতে হয় আর তা সে জেনেশুনেই করে।

* * *

প্রশ্ন : অতিমানসের জগতে তেমনি জেনেশুনে সবাই এ জিনিস করতে পারবে

উত্তর : কে কোন বিশেষ কাজটি পারে, তার পার্থক্য চিরদিনই থাকবে। হয়তো গুহ্যশক্তি অনেকেই পাবে, কিন্তু সকলেরই শক্তি যদি একরকম হয় তাহ'লে তো কোনো প্রভেদ রইল না। যার মধ্যে গুহ্যশক্তি আছে সে কেবল তারই উপর তা প্রয়োগ করতে পারে যার মধ্যে এই শক্তি নেই, কিন্তু সকলেরই মধ্যে যদি তা সমানভাবে রইল তাহ'লে তো গুহ্যবিদ্যার দরকারই থাকলো না।

এ কথা নিশ্চয় বলা যায় যে অতিমানসের পূর্ণ বিকাশ ঘটলেও লোকের শক্তির তারতম্য ও বৈচিত্র্য থাকবেই, কেবল এই হবে যে এখন যেমন শক্তি অনুসারে উপযুক্ত স্থান পেয়ে কেউ নিজের উপযুক্ত কাজগুলি করতে পেরেছে কিনা তার কোনো ঠিকানাই নেই—তার বদলে প্রত্যেকেই চেতনভাবে আপন আপন নির্দিষ্ট স্থান বুঝে নিয়ে যার যার যথাযোগ্য কাজই করবে। অর্থাৎ আঁধারে হাতড়ানোর বদলে প্রত্যেকেই জানবে যে কোন কাজটি তার জন্য নির্দিষ্ট, আর সেই কাজ সে সর্বোত্তম ভাবেই সম্পন্ন করবে। এই হবে পার্থক্য। নতুবা কাজের তফাৎ ও তার স্থানের তফাৎ অবশ্যই থাকবে, যার যেমন কাজ তার তেমনি স্থান। এমন কথা ভেবোনা যে সারা জগতের মানুষ সমান হয়ে একই কাজগুলো একই ভাবে করতে থাকবে—তাহ'লে সে জগৎ মারাত্মক রকমের হয়ে দাঁড়াবে।

এখনকার জগতের সঙ্গে অতিমানস-জগতের পার্থক্য সম্বন্ধে মোটামুটি এই বলা যায় এখন তোমরা যে কথা জানোনা তাও তখন জানতে পারবে, যা পারোনা তাও করতে পারবে, যা বোঝোনা তাও বুঝবে, আর যে সম্বন্ধে কোনো চেতনা নেই তারও চেতনা পাবে। এই হবে নতুন সৃষ্টির প্রধান ভিত্তি : অজ্ঞানের স্থলে জ্ঞানের বিকাশ, অচেতনার স্থলে চেতনার বিকাশ, অক্ষমতার স্থলে ক্ষমতার বিকাশ। তার মানে এ নয় যে সব একাকার হয়ে যাবে।

শ্রীঅরবিন্দ আমাদের বলেছেন যে অতিমানসের নিজের মধ্যেই ক্রোটার বিভিন্ন স্তর আছে, বিশ্ববিবর্তন যে ক্রমিক নিয়মে চিরদিন অগ্রসর হচ্ছে সেই নিয়মেই ওর স্তরগুলিও ধাপে ধাপে ফুটবে। এখনও পর্যন্ত অধিকাংশের কাছেই জগৎরহস্যের দ্বার অর্গলবদ্ধ কিংবা মাত্র অল্প কয়েকজনের কাছেই তা অর্ধোন্মুক্ত, তাই তোমাদের পক্ষে অতিমানস-জীবনের প্রগতি সম্বন্ধে ধারণা করাও কঠিন। কিন্তু প্রগতি মানেই ধাপে ধাপে ওঠা, পরিণতি আসবে নিয়মানুযায়ী। অন্ধকার নিশ্চেতনা থেকে দীপ্ত চেতনা আসবে ক্রমিক পর্যায়ে, আর তখন তা অজ্ঞানের বদলে সত্যজ্ঞানের মধ্যে কাজ করবে। অনভিব্যক্ত তাঁর আত্মাভিব্যক্তির জন্য এই অতিমানস জগৎকেই কাজে লাগাবেন, কিন্তু তা একই ঘায়ে সমস্তটা একসঙ্গে হয়ে যাবার মতো নয়, দলে দলে শতদল খোলার মতো, যে নিয়ম এখনও চলছে। কিন্তু এখন যেমন কোন দিকে চলেছি তার কিছুই আমরা জানি না, তার বদলে রাস্তাটা পূর্ণজ্ঞানে তখন সম্পূর্ণ জেনেই চলবো। কি হচ্ছে বা কি হবে সে বিষয়ে শুধু আন্দাজ করা বা দূরকল্পনা করার বদলে আমরা স্পষ্ট দেখবো যে কোথায় চলেছি আর কেমন ক'রে যেতে হবে। এই হবে মূল পার্থক্য। এমন কোনো একঘেয়ে অস্তিত্ব নিশ্চয়ই হবে না যা অতঃপর বিনা পরিবর্তনে সমানভাবেই চিরদিন চলতে থাকলো।

মানুষের চেতনার বরাবরই এমনি অভ্যাস যে সে কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে গিয়ে আগে পৌঁছতে চায়, তার পর সেখানে পৌঁছলেই থেমে বসে বলতে চায় যে এবার চলার শেষ হলো। "যখন এখানে এসে গেছি তখন এখানেই থামলাম, আর আমি নড়ছি না" ভাবটি প্রকৃত অতিমানসের জিনিস নয়।

কিন্তু পূর্ণ পরিণতির দিকে এই যে পদে পদে এগিয়ে যাওয়া, এটি এখনকার জগতের চেয়ে অতিমানসের জগতে আরো স্পষ্টতর হবে, আর প্রত্যেকেই অন্ধের মতো অন্ধকারে হাতড়ে চলার বদলে আলোর মধ্যে চোখ চেয়ে এগিয়ে যাবে, আর আনন্দের সঙ্গে সবাই জানবে যে কোথায় চলেছি আর কেমন ভাবে চলেছি।

সুতরাং এমন প্রশ্ন তোমাদের করতেই হবে না "অমুকটা কি হবে?" অথবা "অমুক জিনিসটি কি হবে না?" মোট কথা এখন যেমন হচ্ছে তার চেয়ে আরো অনেক কিছুই হবে। যা কিছু হওয়া সম্ভব সবগুলই হয়ে যাবে।

* *

প্রশ্ন : শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "অতিমানস অভিব্যক্তি" (The Supramental Manifestation) বইখানিতে লিখেছেন—"পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হতে মানব-জাতির তাবৎ সকলেই তার স্পর্শ পাবে অথবা তাদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট অংশমাত্রই তা পাবে. এটা নির্ভর করবে সারা জগতের ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে যেমন যেমন, পূর্বনির্দিষ্ট বা সম্ভাব্য ছিল তারই উপর।" এখানে "নির্দিষ্ট" ও "সম্ভাব্য" দুটি কথার মধ্যে তফাৎ কি? তা কি দুই বিভিন্ন জিনিস?

উত্তর : একই জিনিস। সকল কিছুর বেলাতেই এই হয় যে তাকে সমান্তরাল ভাবে দেখলে এক রকমের দেখায়, আবার তাকে লম্বালম্বিভাবে দেখলে অন্য রকমের দেখায়। উপর দিক থেকে দেখলে যাকে বলবে "নির্দিষ্ট" নীচের দিক থেকে থেকে দেখলে তাকে বলবে "সম্ভাব্য"। কিন্তু জিনিসটা সেই একই, কেবল তাকে দেখা হচ্ছে বিভিন্ন দিক থেকে।

তোমার চেতনা যখন কেবল মনের স্তর থেকেই ক্রিয়া করছে, তখন তার সর্বোচ্চ সীমাতে গিয়েও তোমার মনে হতে থাকবে যে কার্য-কারণের একটা নিয়তিসূত্র ধরেই সকল কিছু ঘটে চলেছে, সুতরাং যা হচ্ছে তা হতেই, এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারতো না। কিন্তু যখন তুমি মনের গণ্ডী ছাড়িয়ে আরো উচ্চতর চেতনাতে গিয়ে পড়বে, যাকে বলা যায় আধ্যাত্মিক বা দিব্য চেতনার স্তর, সেখান থেকে হঠাৎ দেখবে যে সকল রকমের রাস্তাই খোলা রয়েছে আর সব কিছু হওয়াই সম্ভব।

যারা সেই অবস্থাতে পৌঁছেছে বা তার সংস্পর্শে এসেছে—মাত্র মুহূর্তের জন্য হলেও—তারা দিব্য ইচ্ছার ক্রিয়া সম্বন্ধে তাদের অনুভূতিকে এমনভাবে বর্ণনা করে, যাতে সাধারণ মনের স্তরের মানুষদের ধারণা হয় তা বুঝি নিতান্ত স্বেচ্ছাচারের ক্রিয়া। এমনি করেই লোকের মনে একটা বিকৃত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, আর সেই ধারণাই এখনও পরম্পরায় চলে আসছে, যে ভগবান একজন খেয়ালী বা স্বেচ্ছাচারী, যা কোনো জ্ঞানদীপ্ত চেতনার পক্ষে মানতে পারাই অসম্ভব। হয়তো তাদের অনুভূতি অযথাযথভাবে সাধারণের মধ্যে বিবৃত হওয়াতেই এমন উদ্ভট ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুত তাকে দিব্য ইচ্ছা বলাও ঠিক হয় না, তা হলো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার, কারণ "ইচ্ছা" কথাটা বললেই লোকে বুঝবে আগের থেকে এঁচে নিয়ে কিছু একটা করার সংকল্প, কিন্তু যদিও দিব্যের বেলাতেও আমরা "ইচ্ছা" শব্দটি প্রয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছি, কিন্তু যা বিশ্বের মধ্যে ক্রিয়া করছে তা নিজের কিছু সংকল্প ধরে নিয়ে সেই ধারাতে চলছে না। এখানে বরং "দৃষ্টি" বললেই কতকটা ঠিক হবে।

যেমন যেমন জিনিস আপনা থেকেই তাঁর দৃষ্টির মধ্যে এসে পড়ছে, তেমন তেমন জিনিসই হয়ে যাচ্ছে। সে দৃষ্টি আমাদের চোখের দৃষ্টির মতো নয়,...তথাচ যেটির পর যেটি সব চেয়ে কাছে এসে পড়ছে, সেই দৃষ্ট জিনিসটাই তার পর বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। যা তাঁর দৃষ্টির কাছাকাছি আসছে, এখানকার বাস্তব বিশ্বে তাই সৃষ্টি হয়ে উঠছে। এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ

তাকে বলেছেন "নির্দিষ্ট বা সম্ভাব্য"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা এটিও নয় ওটিও নয় এ সম্বন্ধে ভাষাতে যাই বলতে যাও তাই বেঠিক বলা হবে। এই যে দৃষ্টিটি বাস্তবে সৃষ্টি হয়ে ফুটে ওঠা, এ যেন স্থান কালের পর্দার গায়ে চিত্রকে প্রতিফলিত করা, চিন্তন যা চলেছে তারই এক জীবন্ত চলন্ত ছবি, সে ছবি এই স্থানকালের পর্দাতে নিত্যই আকার নিচ্ছে—আর যিনি পরাৎপর তিনি নিজেকে এই ভাবে প্রতিবিম্বিত হতে দেখছেন।

*

প্রশ্ন এমন কেন হয়, কাউকে দেখে প্রথম দৃষ্টি থেকেই তার প্রতি একটা অনুরাগের আকর্ষণ আসে, আবার কারো প্রতি প্রথম থেকেই বিরাগের বিতৃষ্ণা আসে?

উত্তর : এটি নির্ভর করে সাধারণত প্রাণের ঝোঁকের উপর, তা ছাড়া আর কিছু না। পছন্দের বেলা প্রাণের স্পন্দনের কিছু মিল দেখা যাচ্ছে, অপছন্দের বেলা সেখানে অমিল হচ্ছে। আর কিছু নয়। প্রাণের মধ্যে এ একটা রাসায়নিক ক্রিয়া।

কিন্তু চেতনাকে এমন সুস্থির ও স্পষ্টদর্শী ক'রে তোলা চাই যাতে বিরূপ না হতে পারে। চৈত্যসত্তার মধ্যে চেতনার এমন অন্তর্বোধ আসবে যাতে সহজে জানা যাবে কোন ব্যক্তি লক্ষ্য ও আশ্পৃহা তোমার আশ্পৃহার অনুকূল, কে তোমার সহযাত্রী হতে পারে, আবার কাদের পথ তোমার থেকে স্বতন্ত্র বা কার মধ্যে তোমার বিপরীত শক্তি কাজ করছে, তার দ্বারা তোমার চলার বিঘ্ন ঘটতে পারে। কিন্তু এ বোধটি আনতে হলে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সিদ্ধির দিকে ঐকান্তিক হওয়া চাই। এটাই কিন্তু প্রায় হয় না। আর যখন তেমন অন্তর্দৃষ্টি আসে তখন আর ঐ আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রশ্নই থাকে না, তখন কেবল বিষয়মূলক জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য ও আভ্যন্তরীণ নিশ্চয়তা, যাতে ঐগুলির প্রভাব কাটিয়ে আপন শান্ত চিত্ত নিয়ে নিজের পথে চলতে পারো।

সুতরাং এ কথা সহজে ও বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, যাদের মধ্যে ঐ অনুরাগ-বিরাগের জোয়ারভাঁটা চলছে তারা রয়েছে নিছক প্রাণচেতনার রাজ্যে। মনের প্রবণতাও তার মধ্যে মিশে থাকতে পারে। আবার এমন মানুষ আছে যাদের মনের দিকটাই খুব কাজ করছে, তারা বুদ্ধির বিষয়ে অনেকটা উঁচু স্তরের লোক, তাদের বলা যায় যে মানবীয় সম্পর্কে তারা অনেকটা মুক্ত, ভীতস্পৃহ, নিরাসক্ত। কত রকমের মানুষই আছে। অনেকের সঙ্গে দুটো কথা বলেও সুখ নেলে, আবার অনেকের বেলা তাও নয়, সেখানে কথা বলাই অনর্থক। সেখানে চুপ ক'রে তফাৎ হয়েই থাকতে হয়। এই সব নানা সম্পর্কের মধ্যে যুক্তিই নির্দেশ দিয়ে থাকে। কিন্তু আকর্ষণ-বিকর্ষণগুলো নিশ্চয় প্রাণরাজ্যের ব্যাপার।

জড়ের জগতে যেমন রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে, প্রাণের জগতেও তাই। রাসায়নিক ক্রিয়াতে যেমন বস্তুতে বস্তুতে আকর্ষণও থাকে আবার বিকর্ষণও থাকে, অনেক

জিনিস বেশ মিশে যায় আবার কোনো কোনো জিনিসকে মেশাতে গেলেই বিস্ফোরণ হয়, এতেও তেমনি। মানুষে মানুষে প্রাণস্পন্দনের এমন মিল হয়ে যায় যে তার সহানুভূতির ফলে শতকরা নিরানব্বই স্থলে লোকে যাকে বলে প্রেম সেই জিনিস এসে পড়ে; তখন তারা অবাক হয়ে ভাবতে শুরু করে: "আহা, এই তো সেই মানুষটি, যার জন্য এতকাল অপেক্ষা করে ছিলাম; এই তো সেই মেয়েটি যাকে আমি এতকাল খুঁজছিলাম।" এই বলে তারা পরস্পরকে জড়ায়, তার পর যখন রাসায়নিক ক্রিয়া থিতিয়ে আসে তখন দেখতে পায় এ অগভীর জিনিস, স্থায়ী হবার মতো নয়। এই কারণেই যারা যোগ করতে আসে তাদের প্রথমেই বলা হয়, "অনুরাগ-বিরাগের উপরে চলে যেতে হবে।" ঐ সকলের মধ্যে গভীর সত্য কিছু নেই, আর ওর দ্বারা এমন জটিল বিপত্তির সৃষ্টি হতে পারে যার থেকে পরে নিষ্কৃতি পাওয়া দুরূহ। ওর মধ্যে ঢুকলে তোমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সব চেয়ে সমীচীন কাজ হবে ওদিকে আদৌ মন না দেওয়া, নিজের অন্তরের মধ্যে ঢুকে পড়া, নিজেকে এই প্রশ্ন করা, কোন বিশেষ কারণে,—খুব রহস্যাবৃত নয় সে-কারণ—কেনই বা তুমি বারে বারে একজনের সাক্ষাৎ পাওয়া কামনা করো, আর অন্যজনের বেলায় তা করো না।

যখন সাধনাতে একান্তভাবে ডুবে রয়েছ তখন এমন এক সময় আসে যখন বোঝা যায়—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের ধারা বেয়ে এবং গভীর এক নীরবতার—কোন সংস্পর্শ সাধনার সহায় আর কোন সংস্পর্শ সাধনার পক্ষে ক্ষতিকর। এ ভাবটি সর্বদা নেয় এক নির্লিপ্ততার রূপ, অধিকাংশ ক্ষেত্র প্রাণের তথাকথিত আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিপরীত তা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা এতই সম্পূর্ণ আলাদা।

তখন তফাৎ থেকে এই মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য ক'রে ও-জিনিসের অসারতা সম্বন্ধে নিজেকে একটু হক্ কথা শুনিয়ে দিতে হয়।

অবশ্য নিতান্ত মন্দ প্রকৃতির লোকও আছে বৈকি, যারা তেমন প্রকৃতি নিয়েই জন্মেছে আর লোকের অনিষ্টই করতে খোঁজে; কিন্তু তুমি যদি বিকারপ্রাপ্ত না হয়ে মনুষ্যেতর জন্তুদের মতো স্বাভাবিক অবস্থাতে থাকো—কারণ এ বিষয়ে তারা মানুষদের চেয়ে অনেক উঁচুতে, বিকার জন্মায় কেবল মানুষেরই মধ্যে—তাহ'লে তারা যেমন একটু বেগতিক দেখলেই সেখান থেকে আপনি সরে যায়, তেমনি তুমিও তাদের মন্দ সংস্পর্শ থেকে আপনিই সরে যাবে। তবে সৌভাগ্যবশত তেমনটা খুব কমই হয়। জীবনের ক্ষেত্রে সাধারণত মিশ্র প্রকৃতিই হয়ে থাকে—সেখানে ভালোতে মন্দতে মিলিয়ে এসেছে কতকটা সামঞ্জস্য, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটলে তাতে ভালো মন্দ দুই রকমই ফল হতে পারে। তাদের প্রতি অতিরিক্ত বিমুখ হবার কোনো কারণ নেই, যেহেতু নিজেও তুমি মিশ্রিত সত্তা, সংস্পর্শ ঘটল এখানে সমানে সমানে।

শোনা যায় যে এমন-মানুষ আছে যারা পিশাচ প্রকৃতির, যারই সংস্পর্শে আসে তার প্রাণশক্তিকে ও অন্যান্য ক্ষমতাগুলিকে রক্তশোষার মতো শুষে নেয়, সুতরাং মারাত্মক জ্ঞানে

তাদের সান্নিধ্য পরিহার করাই উচিত। থাকতে পারে এমন, কিন্তু তার সংখ্যা খুবই কম, আর তেমন ধরনের মানুষ থাকলেও সম্পূর্ণই তারা তাই নয়, সুতরাং তেমন কাউকে মনে হলেই যে তার কাছ থেকে পালাতে হবে এর কোনো মানে নেই।

মোটের উপর, আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে চাইলে আগে বিরাগ, বিতৃষ্ণা, অনুরাগ প্রভৃতিকে জয় করতে হবে। সব কিছুকেই দেখবে নির্লিপ্তভাবে ও মৃদু হাস্যের সঙ্গে।

প্রশ্ন : আমাদের মনে হয় যেন এই আশ্রম আগের চেয়ে বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার সাধারণ চেতনার স্তর আগের চেয়ে কিছু নেমে গেছে। এর কারণ কি, আর তা হয়ে থাকলে তাকে উঁচুতে ওঠাবার উপায় কি?

উত্তর : প্রশ্নটি কিছু জটিল। আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করবো। আগে অনেক কাল পর্যন্তই এখানে কয়েকজন মাত্র বাস করতো, তারা প্রত্যেকেই থাকতো আলাদা-ভাবে তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে, তখন এটি সমষ্টিগত প্রতিষ্ঠান ছিল না। যেন পাশার ছকে সাজানো আলাদা আলাদা খুঁটি, একজন লোকই তাদের প্রত্যেককে চালাচ্ছে; বাহ্য-দৃষ্টিতে যদিও তারা একত্রেই থাকতো, তবু অল্প কয়েকটি বিষয়েই তারা এক নিয়মে চলতো। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কেউ বা অনেকটা অগ্রসর হয়ে যেতো, কেউ বা তা পারতো না, কাজেই পরস্পরের মধ্যে যোগ ছিল খুবই কম। এমনি অসম অবস্থাতে যদিও ব্যক্তিবিচার করতে গেলে তার একটা সাধারণ মূল্য ছিল কিন্তু তা যথেষ্ট পরিবর্তনশীল, আর তা সমষ্টিগত মূল্য নয়। এইভাবে অনেক কালই চলেছিল।

মাত্র সম্প্রতি এর সমষ্টিগত মূল্যের প্রয়োজনীয়তার কথা জানা গেছে। আর এখন তা কেবল এই আশ্রমটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর বাইরে থেকেও যেখানে যারা শ্রীঅরবিন্দকে গুরু মেনে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেছে—স্থূলভাবে না হলেও আপন আপন চেতনাতে—এবং তাঁরই প্রদর্শিত পথে জীবনকে পরিচালিত করতে চেষ্টা করছে, তাদের সকলকেই নিয়ে এই সমষ্টি। সকলকে নিয়েই এক সত্যিকার সমষ্টিগত অস্তিত্বের গুরুত্ব দেখা দিয়েছে, এবং অতি-মানস চেতনা ও তার শক্তি অবতরণের পরে উপস্থিত তার গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। এ শুধু কোনো বাস্তব সংঘটনের উপর নির্ভর করছে না, আরো অনেকখানি গভীরতর সত্য রয়েছে এর মধ্যে। শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন অতিমানসের গোষ্ঠি, এ হলো তারই পূর্ব-সূচনা।

শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য বলেছেন যে সমষ্টির মধ্যে থেকেও প্রত্যেকের পক্ষে আপন আপন অতিমানস-চেতনাকে আয়ত্ত ক'রে নিতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যতটা পূর্ণতা আসার আগেই কতক পরিমাণে একটা সমষ্টিগত ঐক্য আনতে আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা করা দরকার

হয়ে পড়ল। সকলের মধ্যে একটা সত্যিকার মিল ও গভীরতর যোগরক্ষা করা দরকার মনে হওয়াতে বাস্তবের দিক দিয়ে সেই চেষ্টা করতে হলো। তাতেই কিছু ব্যতিক্রম ঘটল; ব্যক্তি-সাধনার দিকেই আগে এতটা বেশী ঝোঁক ছিল যে তার পরিবর্তন আনতে গিয়ে কতক-গুলি অভ্যস্ত আচরণের ওলটপালট করতে হয়েছে। এতে বাইরের দিকে কিছু তফাৎ না দেখা গেলেও তা হয়েছে ভিতরের দিকে, যেখানে অপেক্ষাকৃত গভীরতর চেতনার ক্রিয়া চলে। ফলে এখন একটা পারস্পরিক নির্ভরতার ক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে—কারণ এ বিষয়টিতে আমি খুবই জোর দিয়ে থাকি—আর তাতেই ব্যক্তিগত উচ্চতার সীমা কিছু নীচে নেমেছে, তবে এর মধ্যে যারা একটা আভ্যন্তরীণ উপলব্ধির স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছে তারা কিন্তু এই পরিবর্তনে তার থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত হয়নি।

অতএব যদিও সাধারণভাবে একটা সর্বজনীন অবনতি ঘটেছে বলে বোধ হয়, সে কথা কিন্তু ঠিক নয়; বরং সাধারণভাবে দেখলে আগের চেয়ে উন্নতিই ঘটেছে। কিন্তু অনেক স্থলে ব্যক্তিগত উচ্চতাই কিছু নেমে এসেছে, কারণ কেউ কেউ যারা ইতিপূর্বে কিছু ব্যক্তিগত উপলব্ধি পেয়েছিল তাদের এখন সকলের তরফ থেকে একটা গুরুভার বহন করতে হচ্ছে, যা আগে কখনো হয়নি। যদিও তারা নিজেরা এর কারণ বোঝে না, কিন্তু অনেকের তরফের নির্ভরতার দায়িত্ব নেওয়াই এর কারণ। তবে এ একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র, শেষ পর্যন্ত থাকবে না, এর পরেই আসবে যথেষ্ট বোধগম্য সর্বজনীন উন্নয়ন। প্রত্যেকেই যদি সজাগ থাকতো, অবনতিকে প্রশ্রয় না দিয়ে প্রত্যেকেই চেষ্টা করতো রূপান্তর ঘটাতে, যদি চেষ্টা করতো ভিতরের ও বাইরের থেকে আসা প্রভাব ও স্পন্দনগুলিকে পরিবর্তিত ও বিশুদ্ধ ক'রে নিতে, তাহলে সকলেই একত্রে অনেক বেশী উচ্চতর চেতনাতে উঠে যেতে পারতো।

সেই দিক দিয়েই তোমাদের আমি চালিত করছিলাম, যদিও এ কথা প্রকাশ্যে বলিনি। কেবল সকলকে বলেছিলাম প্রাণপণে প্রয়াস করতে, কারণ তারই এখন খুব দরকার। কিন্তু নিশ্চয় একদিন বলতাম যে, তোমরা প্রত্যেকে যে ব্যক্তিগত প্রয়াস করছো তাতে শুধু ব্যক্তিগত উন্নতিই হচ্ছে না, তা চারদিকে প্রসারিত হবে এবং সমষ্টিগত সাফল্য আনবে। কয়েক মাস যাবৎ আমি কিছু বলিনি, এই চেয়েছিলাম যে সকলের ব্যক্তিগত চেতনা আরো ভালো ক'রে প্রস্তুত হোক, তখন নিজেরা আপনা থেকেই জানবে ও মানবে এই সমষ্টিগত মিল থাকার কতখানি প্রয়োজনীয়তা।

সেই কথাই এখন বোঝাতে চাইছি। নেমে যাওয়া বলে যেটুকু মনে হচ্ছে তা প্রকৃত নেমে যাওয়া নয়, কিন্তু কারণটি হলো এই। উন্নতির গতিপথে অনেকটা ইস্ক্রুপের প্যাঁচের মতো, একবার উপলব্ধির মাথায় উঠে আবার একটু নীচের দিকে নামতে হবে যাতে পাক ঘুরে আরো উচ্চতর ও বিস্তৃত রাস্তায় গিয়ে পড়া যায়। প্রত্যেকেই যদি শুভ-ইচ্ছা নিয়ে সচেতনে এতে সহযোগিতা করে তাহ'লে শীঘ্রই তা হয়ে যাবে। আশ্রমকে বাঁচাতে এটুকু দরকার হয়েছিল। যা উপরের দিকে যায় না তা নীচের দিকে নেমে নষ্ট হয়ে যায়, কাজেই

আশ্রমটিকে বাঁচাতে হলে এর সমগ্র চেতনাকেই উপর দিকে ওঠাতে হবে, একে এক জীবন্ত সত্তায় দাঁড় করাতে হবে। এই কথা। আগে কয়েক বছর ধরে আমরা উপলব্ধির পথেই যাচ্ছিলাম, এখন পাক খেয়ে আসতে তার থেকে কিছু নেমেছি বটে, কিন্তু এর পরেই আবার আগের চেয়েও উপরে উঠবো। এই হলো কারণ।

আপাতদৃষ্টিতে এমন কিছু কাজ দেখা যেতে পারে যা আগের কাজের প্রতিকূল, কিন্তু সর্বত্রই তাই হয়। যখনই নতুন কিছু শুরু করো তখনই দেখবে এমন জায়গা থেকে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে যেখানে আগে কিছুই ছিল না, হঠাৎ দেখা যাবে সেই নিষ্ক্রিয় জায়গাটা বাধা দেবার জন্য বাধা চাড়া দিয়ে উঠলো। যা কিছুই পরিবর্তনের বিরোধী তাই এমনি ক'রে বিদ্রোহ শুরু করে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। ব্যক্তিগত প্রয়াসের বেলাতেও তাই। উন্নতির পথে তুমি এগোতে চাইলেই, যে বাধাকে কাটাতে চাইছ তারই প্রকোপ ও প্রাবল্য তোমার চেতনার মধ্যে দশ গুণ হয়ে দেখা দেবে। সেখানে চাই কেবল অধ্যবসায়। তাতেই কাজ হবে, সে বাধা নিশ্চয় ঘুচে যাবে।

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

(দিব্যকর্মযোগ)

১

সাধন-চতুষ্টয়

সাধনার শুরুতে এই কথাগুলি মনে রাখতে হবে। যোগ জীবনবিমুখ নয়, সমস্তটা জীবনই একটা যোগ। পুরুষোত্তমই সে-যোগের ভর্তা এবং ঈশ্বর। তাঁর দিব্য-সঙ্কল্পই ঐশ্বর-যোগের শক্তিতে আমাদের জীবনে রূপ ধরছে। যোগ একার জন্য নয়, সবার জন্য। পুরুষের মোক্ষই তার একমাত্র লক্ষ্য নয়, প্রকৃতির রূপান্তরও তার সাধ্য। জীবনের সার্থকতা যখন জাগ্রতে, তখন জাগ্রতই যোগের মুখ্য ক্ষেত্র। স্বপ্নের ভাব এবং সুষুপ্তির শক্তি দিয়ে এই জাগ্রৎকেই সমৃদ্ধ করতে হবে। কর্ম দিয়ে জীবনের শুরু, অতএব যোগেরও শুরু। চেতনার বিস্তার তুঙ্গতা ও গভীরতার সাধনাই যোগ।

যোগসিদ্ধির প্রাথমিক মুখ্য সাধন হল চারটি : শাস্ত্র, উৎসাহ, গুরু এবং কাল। এখন একে-একে তাদের নিয়ে আলোচনা করা যাক।

* *

প্রথম শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্র হল বেদ বা জ্ঞান। প্রত্যেক জীবেরই হৃদয়ে এই বেদ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে স্বভাবের বীজশক্তিরূপে। এই শক্তির আবিষ্কার এবং স্ফুরণই হল সাধনার লক্ষ্য।

সময় না হলে, মানুষ এই লক্ষ্যের সম্পর্কে সচেতন হয় না। উপনিষদ্ বলেন, তিনি যাকে বরণ করেছেন সে-ই তাঁকে পায়, সাধ্য-সাধনায় তাঁকে পাওয়া যায় না। তাঁর এই বরণ কালসাপেক্ষ। কিন্তু তা বলে এটা খামখেয়ালের ব্যাপার নয়। এরও মাঝে ছন্দ আছে, ক্রম আছে। কুঁড়ি যেমন ফুল হয়ে ফোটে, এও তেমনি।

বেদের প্রকাশ হয় বাকে বা মন্ত্রে। ঋষিরা বলতেন, যে-বাক্ আমরা মুখে বলি, কান দিয়ে শুনি, তা হল স্থূল বৈখরী-বাক্। তার মূলে রয়েছে ভাব, সে-ই হল আসল বাক্। তাকে শুনতে হয় কান দিয়ে নয়—প্রাণ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে। সেই শ্রুতির জন্য বাইরের বাক্ হল একটা অবলম্বন মাত্র। বৈখরী-বাকের সহায়ে হৃদয়ে ভাব জাগানোকে বলে মন্ত্র-চৈতন্য। তখন সাধনার ধারা উলটে যায়—চৈতন্যের আবেশে আপনা হতেই হৃদয়ে

মন্ত্রের স্ফুরণ হতে থাকে, আর তাকে অবলম্বন করে জাগে ভাবের হিল্লোল। 'শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে।' নেশা না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্র কণ্ঠ-স্থ মাত্র, আত্ম-স্থ নয়।

ভাব হতেই মন্ত্রের স্ফুরণ হয়েছে, এমন অধিকারী কম। অধিকাংশক্ষেত্রেই ভাবের অস্পষ্ট আভাস চিত্তে প্রথম জাগায় একটা ব্যাকুলতা। তারপর মন্ত্রকে আশ্রয় করে ভাবের পুষ্টির সাধনা চলে। সাধনা সহজ হয়, ভাব যখন মন্ত্রকে স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলে। তখনই বুঝতে হবে, এইবার তিনি এসে হাল ধরেছেন।

মন্ত্র হল শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত রূপ। বোঝাবার সুবিধার জন্য মন্ত্রে আর শাস্ত্রে সাময়িকভাবে একটা ভেদ করে নেওয়া যেতে পারে : বোধের জন্য মন্ত্র, আর মননের জন্য শাস্ত্র। যেমন ব্রহ্ম-বোধের মন্ত্র হল 'ওম্' বা কোনও মহাবাক্য ; আর মনের সমস্ত সংশয় দূর করে ব্রহ্মবোধকে প্রস্ফুট করবার জন্য হল 'বেদান্তশাস্ত্র'।

শাস্ত্রের আবার দুটি ভাগ। এক ভাগে থাকে তত্ত্ব, আরেকভাগে সাধনা। তত্ত্বের আলোচনায় মন যখন নিঃসংশয় হল, বস্তুসম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারল, তখন যে-জ্ঞান হল তা পরোক্ষজ্ঞান। তত্ত্বলার বোল তখন মুখে এসেছে, হাতে আসেনি। হাতে আনবার জন্য আশ্রয় করতে হয় সাধনশাস্ত্র এবং সাধনা।

একই প্রকাশিত হচ্ছেন বিচিত্ররূপে। বৈচিত্র্য থাকলে ভেদও থাকবে। কিন্তু ভেদটা বাইরের। অন্তরে-অন্তরে সেই একেরই সঙ্গে সবার যোগ। ফুলের কর্ণিকা থেকে বেরিয়ে এল অনেকগুলি পাপড়ি। পাপড়িগুলি আলাদা, আবার আলাদাও নয়। সবারই আকৃতি-প্রকৃতি একই ধরনের, এক কেন্দ্র থেকেই সবার রসের যোগান আসছে। এমনি করে এক আর বহুর মধ্যে অন্যোন্যাশ্রয়ের একটা সম্বন্ধ আছে। এক ছড়িয়ে পড়ছে বহু হয়ে, আবার বহু গুটিয়ে আসছে একের মধ্যে—সৃষ্টি-লীলার এই যুগল ছন্দ।

অধ্যাত্মসাধনাতে আমাদের অভিযান শুরু হয় বহুর ক্ষেত্র হতে একের দিকে। সবাই সাধনা করি নিজের-নিজের রুচি আর সংস্কার অনুযায়ী। মানুষের স্বভাব বিচিত্র। সুতরাং পরিধি হতে কেন্দ্রে পৌঁছবার পথও বিচিত্র। যারা অনুগামী হবে, তাদের জন্য সবাই পথের বিবৃতি রেখে যায়। এই বিবৃতিগুলিই হল বাইরের শাস্ত্র।

একের দিকে লক্ষ্য থাকলেও গোড়াতে সবারই দৃষ্টি বা পথ এক হয় না। তাইতে 'যত মত, তত পথ' ; 'বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ'। এই থেকে সম্প্রদায়ভেদের সৃষ্টি।

এটা নিরর্থক নয়। নানা মতের অরণ্যে দিশাহারা হওয়ার চেয়ে নিজের স্বভাব ও সংস্কার অনুযায়ী একটা মত আঁকড়ে ধরা ভাল। নিষ্ঠা সাধনার পক্ষে অপরিহার্য। তবে কিনা তা গোঁড়ামি হয়ে উঠলেই সর্বনাশ।

চিত্ত যদি উন্মুক্ত এবং উদার থাকে, তাহলে সাধনায় এগ'তে-এগ'তে দেখি, অদ্বৈতের পথ বস্তুত সমন্বয়ের পথ। যতক্ষণ মানসভূমিতে থাকি, ততক্ষণ ভেদের সংস্কার যায় না।

তখন বলি, তোমার পথ আলাদা আমার পথ আলাদা, তোমার ঠাকুর আলাদা আমার ঠাকুর আলাদা। দুয়ের মধ্যে মিল কোথাও নাই। এমনও বলি, আমার ধর্মই সত্য, আর-সব ধর্ম মিথ্যা। এই সংস্কার তত্ত্বোপলব্ধির শেষ পর্যন্ত থাকতে পারে—এই এক আশ্চর্য। তারপর অধিমানসভূমিতে উঠলে দেখি, সব পথ সব মতই সত্য, তবে কিনা আমার নিজেরটা-তেই আমার বিশেষ রুচি। এখানে অভেদমূলে ভেদের দর্শন, কিন্তু ভেদভাবের স্বাতন্ত্র্য একেবারে যায় না। বহু আর একের বিরোধ ঘুচে যায় একমাত্র অতিমানসভূমিতে। তখন দেখি, সব একেরই বিচিত্র উল্লাস, কারও সঙ্গে তো কারও বিরোধ নাই। এমন-কি বৈচিত্র্যের ভূমিতেও একের সঙ্গে অপরের যেন আলোয়-আলোয় মেশামেশি। তখনই বলতে পারি, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'।

যে পূর্ণযোগের সাধক, তার শাস্ত্রদৃষ্টি হবে এই অতিমানসী দৃষ্টির অনুগত। ব্রহ্মের জ্ঞান সর্বমহত্তের জ্ঞান। একদেশদর্শিতার দ্বারা সে-জ্ঞান কখনও সম্যকভাবে লাভ করা যায় না। ব্রহ্ম অবশ্যই 'শাস্ত্রযোনি', কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা সার্থক হতে পারে একমাত্র শাস্ত্র-সমন্বয়ের দ্বারাই।

আরেকটা কথা। শাস্ত্রের যা চরম প্রতিপাদ্য, তত্ত্বের দিক থেকে তা এক এবং নিত্য। কিন্তু সেই একেরই আবার অভিব্যক্তি হয় পরিণাম ও বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে। অখণ্ড একরস তত্ত্ব যেমন সত্য, তেমনি তার কালিক পরিণাম এবং বহুধা-বৈচিত্র্যও সত্য। একটি অক্ষর পুরুষের সত্য, আরেকটি তাঁরই পরিণামিনী প্রকৃতির সত্য। একটি সত্যকে আমরা পাই উজান বেয়ে, আরেকটিকে পাই ভাটিয়ে এসে। এইজন্য একই মৌলতত্ত্বের বাস্তব উপলব্ধির ধারা যুগে-যুগে বদলে যায়। তাই সবযুগের শাস্ত্রীয় তত্ত্বজ্ঞান ও সাধনা এক হয় না। উত্তুঙ্গতার দিক দিয়ে অধ্যাত্ম অনুভব পর্যবসিত হয় শূন্যতায়, তার চেহারা সবযুগেই এক। কিন্তু সেখান থেকে জগতের দিকে তাকাতে গিয়ে একযুগের দৃষ্টির সঙ্গে আরেক যুগের দৃষ্টি সর্বাংশে এক হয় না। যতই কাল বয়ে যাবে, মানুষের আধ্যাত্মিক বাস্তবদৃষ্টি ততই গভীর হবে—এটা স্বাভাবিক। এটা যেমন জাতির জীবনে ঘটে, তেমনি ব্যক্তির জীবনেও ঘটে। একসময় আমরা তত্ত্বদৃষ্টির তুঙ্গভূমি থেকে জগৎকে বলেছি মায়া, তারপর আবার বলেছি লীলা। একটিতে জগৎকে মনে হয়েছে মিথ্যা, আরেকটিতে সত্য। কিন্তু লীলাবাদও তো জগৎ-দর্শনের পরম সত্য নয়। তার চাইতে গভীর হল পারার্থ্যবাদ—যা জগতের মাঝে একটা চিন্ময়পরিণামের সূত্র আবিষ্কার করে। বৈরাগীর দৃষ্টিতে জগৎকে উপেক্ষা করা নয় বা রসিকের দৃষ্টিতে তাকে সম্ভোগ করাই নয় শুধু—তার প্রত্যেকটি পর্বকে সত্য বলে জেনে তাদের আপাতদৃষ্ট অদিব্যভাবকে দিব্যভাবে রূপান্তরিত করাই তখন যোগীর পরম পুরুষার্থ।

এই রূপান্তর প্রকৃতিপরিণামের অন্তর্গত। সুতরাং তার একটা কালাপেক্ষা আছে। একথা অবশ্য সত্য যে পুরুষের স্পর্শে প্রকৃতির রূপান্তর চিরকালই হয়ে আসছে। কিন্তু

তা হয়েছে সাধকের অগোচরে, নেপথ্যের অন্তরালে। তার বাস্তব চেতনা এতদিন তাকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেয়নি কিংবা রূপান্তরকে স্পষ্টভাবে সাধ্যের অন্তর্গত বলে ঘোষণা করেনি। গোড়াতেই এমনিতর ঘোষণা সম্ভবও ছিল না। সাধনা যখন শুরু করি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তখন দেখি, অনেক আগে থেকেই আমরা অপরা-প্রকৃতির জালে জড়িয়ে গেছি। স্বভাবতই তখন জাল কেটে বেরিয়ে পড়াটাই আমাদের পুরুষার্থ হয়ে দাঁড়ায়। তাই সাধনার প্রথম পর্বটা যায় বৈরাগ্যে। উপনিষদের ঋষির মত তখন বলতেই হয়, 'নেদং যদিদমুপাসতে'—যা নিয়ে মানুষ মেতে আছে তা ব্রহ্ম নয়। এই বৈরাগ্যের সংবেগ থেকেই নেতিবাদী সব শাস্ত্রের উদ্ভব। কিন্তু অবিদ্যা হতে বিদ্যায় উত্তীর্ণ হয়ে তাতে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে দেখি, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই যা-কিছু সবই যে ব্রহ্ম। এই হল লীলাবাদী শাস্ত্রের মূলসূত্র। কিন্তু এও তো চরম দর্শন নয়। দৃষ্টি আরও গভীর হলে দেখব, ব্রহ্ম যে সব হয়ে আছেন, শুধু তা-ই নয়—তিনি হচ্ছেনও। পৃথিবীকে ভুলে গিয়ে কেউ শুধু সূর্যকে দেখল, তার সূর্যদর্শন নিশ্চয় সত্য। কেউ সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত পৃথিবীকেও দেখল, তার সূর্যদর্শন কিন্তু সত্যতর। আর যে পৃথিবীর অণু-পরমাণুতে সূর্যের তেজশ্চক্রিয়াকে অনুভব করল, তার সূর্যদর্শন সত্যতম।

পূর্ণযোগীর দর্শন এই শেষের শ্রেণীর। তার মাঝে যেমন অতীতের সমাহার আর সমন্বয় থাকবে, তেমনি থাকবে ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও। এই জন্য পূর্ণযোগের সাধক যে-শাস্ত্র অনুসরণ করবেন, তা অতীতের কোনও একটি বিশেষ শাস্ত্রের পুনরাবৃত্তি নয়। অথচ অতীতের অভিজ্ঞতাকে তিনি প্রত্যাখ্যানও করবেন না। তার মধ্যে যেটুকু সত্য ভবিষ্যতের উৎক্রান্তির মহিমার প্রতি ইঙ্গিত করছে, তাকে আত্মসাৎ করেই তিনি এগিয়ে চলবেন সুদূর দিগন্তের পানে। প্রাণেরও বিকাশ এই রীতিতে হয়। শৈশব হতে কৈশোর, কৈশোর হতে যৌবন—এর মাঝে যেমন অগ্রগতি আছে, তেমনি আছে আত্তীকরণও (assimilation)। চেতনার সূর্য ক্রমে মাধ্যন্দিন মহিমার পানে এগিয়ে চলেছে। যুগ হতে যুগান্তরে তার প্রতি পদক্ষেপের যে-বাণীরূপ, তা-ই বেদ। সে-বেদ ক্রমে 'বহতো মহীয়ান্' হয়ে চলেছে। পূর্ণযোগী হৃদয়ের প্রদ্যোত দিয়ে তারই অনুবর্তন করে চলেছেন।

*

শাস্ত্রজ্ঞান দিয়ে সাধনার শুরু। সাধনা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানো নয়। যা আমরা সিদ্ধ করতে চাই, আগে তার বিজ্ঞান জানা দরকার। প্রাচীনেরা একেই বলতেন 'শ্রবণ'। কোন্ পথ দিয়ে কোথায় যেতে হবে, পথের মাঝে কি-কি বাধা আছে, পথের শেষে যে-দেশে গিয়ে পৌঁছব তার চেহারাটাই-বা কি রকম—এসব বিষয়ে গোড়া থেকেই একটা সুস্পষ্ট আর সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। অবশ্য ধারণা থাকাটাই যথেষ্ট নয়, যা জেনেছি তাকে জীবনে ফলিত করাটাই আসল কথা। কিন্তু তবুও বুদ্ধির শুদ্ধির জন্য শাস্ত্রজ্ঞানও দরকার।

অর্থাৎ গীতার ভাষায় প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা তত্ত্বদর্শীর কাছ থেকে আগে জ্ঞানের উপদেশ নিয়ে তবে সাধনা করতে হয়।

কিন্তু অধীত শাস্ত্রকে সফল করাই হল আসল কথা। তার জন্য সাধকের চাই 'উৎসাহ'। পূর্ণযোগের এইটাই হল দ্বিতীয় সাধনাঙ্গ। উৎসাহের অন্য নাম অভীপ্সা, তীব্রসংবেগ বা ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতা অর্থে কিন্তু ছটফটি নয়—ওটা চিত্তের রজোগুণের ক্রিয়া। সত্যকার ব্যাকুলতা জন্মায় সাধকের গোত্রান্তরের পরে। বিয়ের সময় মেয়েদের বাপের গোত্র ছেড়ে স্বামীর গোত্র নিতে হয়, তারপর আর তারা বাপের গোত্রে ফিরে যেতে পারে না। যোগের দীক্ষাও তেমনি—প্রাকৃত-জীবনকে পিছনে ফেলে অপ্রাকৃত-জীবনের পথে পা বাড়ানো, একটা তীব্র সঙ্কল্প নিয়ে। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন'—যোগের পথে এমনিতর রোখ থাকা চাই। এইটি থাকলে তবে ব্যাকুলতার সার্থকতা। ব্যাকুলতার অর্থ তখন সংবেগ—যা দুর্নিবার অপ্রমত্ত প্রেরণায় সাধককে লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়ে চলে, না পৌঁছন পর্যন্ত এক মুহূর্ত বিশ্রাম দেয় না। সাধনা 'ভ্যাতভেতে চিঁড়ের ফলার' নয়।

শাস্ত্রজ্ঞান দিয়ে পথের পরিচয় আর পাথেয় সঞ্চয় করলাম, তারপর উৎসাহ নিয়ে পথ চলা শুরু করলাম। এই চলার তিনটি পর্ব আছে। প্রথম হল সাযুজ্য, তারপর রূপান্তর, তারপর বিকিরণ। মেয়েদের ঐ উপমাটারই জের টেনে বলতে পারি, গোত্রান্তরের পর মেয়ে বর পেল, ঘর পেল—স্বামীর সাক্ষাৎসঙ্গ পেল, সর্বস্ব দিয়ে তাঁর হল। এইটি সাযুজ্য। তারপর সে মা হল। এ তার জীবনের একেবারে নতুন আরেকটা পর্ব। সাযুজ্য নিয়ে এল রূপান্তর—দেহে প্রাণে মনে এক নতুন আলোর অভিষেক। এই রূপান্তরের পর মেয়ে হল যথার্থ গৃহিণী—গৃহের সে সম্রাজ্ঞী, সবার ধাত্রী।

পূর্ণযোগের সাধকের জীবনেও এই তিনটি পর্ব। পর্বগুলি মোটের উপর ক্রমিক হলেও তারা অন্যোন্যাশ্রিত। প্রথম সাযুজ্য দিয়ে দিয়ে শুরু, আবার ঐ সাযুজ্য দিয়েই সারা। সমস্তটা সাধনজীবন সাযুজ্যেরই পরিপাক। এই সাযুজ্য প্রথম আগে বিদ্যুতের ঝলকের মত, এসেই মিলিয়ে যায়। কিন্তু সঙ্গে সে এমন-একটা সাড়া দিয়ে যায় যে এর পর গতানুগতিকতার পথে গড়িয়ে চলা সাধকের সম্ভব হয় না। সাযুজ্যের একটা অস্ফুট অভীপ্সা সাধকের চিত্তে গোড়াতেই জাগে বটে, কিন্তু চাইতে গিয়ে সে যা পায় তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। এ-পাওয়া তাঁর প্রসাদ বা শক্তিপাত, এক নিমেষের জন্য সাধকের কাছে তাঁর নিজেকে ধরা দেওয়া, তাকে বরণ করে নেওয়া। একবার ছুঁয়ে তিনি আড়াল হয়ে যান, তারপর জাগে বিরহের ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতায় চিত্ত তখন অতন্দ্র হয়, আভাসে পাওয়াকে আধারে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য জাগে অদম্য উৎসাহ। গোড়াতে এ-উৎসাহ মনে হয় সাধকের। কিন্তু ক্রমেই সে বুঝতে পারে, তার মাঝে যে শক্তির যোগান আসছে তার উৎস লোকোত্তরে। সে নিজে কিছুই করছে না, কেউ যেন তাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। এই শক্তির কাছে নিজেকে তখন সে সঁপে দেয়। সমর্পণে চিত্তে আসে এক অনুপম প্রশান্তি

স্বচ্ছতা আর পরিব্যাপ্তি। তখন তার করার পাট চুকে গিয়ে শুরু হয় হওয়ার পাট। সাধককে তখন আর চেষ্টা করে শক্তি জোটাতে হয় না, সত্তার গভীর হতে শক্তি যেন ফোয়ারার মত আপনি উপচে ওঠে। এই শক্তিই তখন আধারের রূপান্তরের কাজ শুরু করে দেয়। কাঠে আগুন ধরে গেছে, এখন সে নিজের তাতেই কাঠকে আগুন করে তুলবে। রূপান্তর সিদ্ধ হলে পর শুরু হয় আত্মবিকিরণ—অনন্ত ইন্ধনের তাপ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, একটা কাঠি থেকে আরেকটা কাঠে আগুন ধরে যায়।

সবই হচ্ছে সেই বৃহতের শক্তিতে—এইটি বুঝতে পারাই হল জ্ঞান। এই জ্ঞানকে আড়াল করে রাখে আমাদের অহমিকা। আমরা মনে করছি, আমরাই সব-কিছু করছি। তাঁর ইচ্ছাতেই যে সব হচ্ছে এটা বুঝতে সময় লাগে। বুঝতে পারলে জীবনের বোঝা হাল্কা হয়ে যায়। তখন অলখের উৎস হতে শক্তির যোগানও আসে। আবার অহংএর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কামনা। অহং সব-কিছুই চায় তার মনের মত। কিন্তু তা তো হয় না, হতে পারে না। তাই সে যা চাইছে আর সংসারে যা হচ্ছে, তার মধ্যে একটা বিরোধের সৃষ্টি হয়। এই বিরোধে সংসারের কিছু আসে যায় না, ক্ষতি হয় অহংএরই। নিজের চাওয়া যদি সে ছাড়তে পারে, তাহলে তার দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়, চেতনা ব্যাপ্ত হয়। তখন আর মিথ্যা চাওয়ার বিড়ম্বনা তার মাঝে থাকে না, চাওয়া আর হওয়ার মাঝে একটা সন্ধি হয়ে যায়। 'সব ছেড়ে, সব পাওয়া'—এই কথাটা তখনই সত্য হয়।

আলোর ছোঁয়ায় যেমন ফুল ফোটে, তেমনি তাঁর ছোঁয়ায় ধীরে-ধীরে ফুটে ওঠা—এইটি হল সাধনার মর্মকথা। কিন্তু এটি যে খুব সহজে হয়, তা নয়। কেননা আমরা জন্মসিদ্ধ হয়ে তো কেউ জন্মাই না—জন্মাই অপরা-প্রকৃতির নানা সংস্কার নিয়ে। এই সংস্কারগুলি প্রশ্রয় পায় অহংকে আশ্রয় করে। তাই প্রথমটা তাদের তাড়াবার ভারও নিতে হয় অহং-কেই। এই জন্যই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের আগে দরকার হয় আত্মপ্রতিষ্ঠার। 'সংসারের বেলায় আমি, আর সাধনার বেলায় তুমি'—এমন ভাগাভাগিটা হল পাটোয়ারী বুদ্ধির কারসাজি। প্রথমটায় অদম্য উৎসাহ নিয়ে খাটতে হবে আমাকেই। খাটব প্রকৃতির প্রভু হয়ে, কিন্তু তাঁর গোলাম হয়ে। অহংকে দিয়েই কাজ করিয়ে নিতে হবে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই জানব, এ-অহং তাঁর যন্ত্র। 'আমার জঞ্জাল আমাকেই সাফ করতে হবে; কিন্তু করব তোমার হয়ে, তোমার জন্য তোমারই শক্তিতে'। এমনি করে তিলে-তিলে সমর্পণ সত্য হয়ে উঠবে। শেষে আর 'অহঙ্কার' নয়; এ 'অহং কার?—না তাঁর'।

পথের পরিচয় পেলাম শাস্ত্রে, অতন্দ্র উৎসাহে পথ চলাও শুরু হল। এবার চাই পথের দিশারী। দিশারী হলেন গুরু।

হৃদয়গুহায় যে-বাণী তা-ই যেমন সত্যকার বেদ বা শাস্ত্র, তেমনি হৃদয়গুহায়

রয়েছেন যে অন্তর্যামী পুরুষ তিনিই সদ্‌গুরু। সেই গুরুর নিঃশ্বসিতই বেদ। তিনি অন্তরে থেকে আমার সব-কিছু নিয়ন্ত্রিত করছেন, তাই তাঁকে বলি 'অন্তর্যামী'। তিনিই আমার ইষ্ট। ইষ্ট মন্ত্র আর গুরু—তিনই এক। আবার এই তিনটিই আমার গুহাহিত আত্মজ্যোতি।

এই অন্তর্যামী গুরু কারও কাছে প্রকাশ হন নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, কারও কাছে ভূতভাবন পরমাত্মরূপে, কারও কাছে পুরুষোত্তম ভগবানরূপে—কারও কাছে-বা যুগপৎ এই তিনরূপেই। প্রথমটায় তিনি থাকেন আমাদের অহংএর আড়াল হয়ে। বস্তুত তাঁরই শক্তিতে আমরা পথ চলছি, কিন্তু ভাবি চলছি বুঝি নিজের জোরেই। ক্রমে বুঝতে পারি, আমার সাধনা যতটুকু সিদ্ধি তাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। পিছন পানে তাকিয়ে দেখি, অতীতের ব্যর্থতারও একটা অর্থ আছে, কিছুই তো নষ্ট হয়নি জীবনে। তখনই বুঝি, আমার শক্তিতে বা আমার বুদ্ধিতে আমি পথ চলিনি, পদে-পদে আড়াল থেকে কেউ আমায় চালিয়ে নিয়েছে। ক্রমে এই দেশনা (guidance) বর্তমানের প্রতি মুহূর্তে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। দেখি, গুরু 'পুরএতা'—তিনি চলেছেন আগে-আগে, আমি চলেছি তাঁর পিছনে-পিছনে। তখন নিঃসংশয়ে পরমানন্দে আমার সব ভার তাঁকে সঁপে দিই। দিশারী তখন হন দোসর, হন বঁধু, হন আমার আমি। তিনি শিব, আমি শক্তি। তিনি যেমন তাঁতে, তেমনি আমাতে, তেমনি এই জগতে। তিনি সর্বেশ্বর, তিনি অন্তর্যামী, তিনি সর্বময়। কি তাঁর দেশনার রীতি, সে-প্রশ্ন আমার নয়। আমার শুধু তাঁর স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়া, তাঁর টানে কূল ছেড়ে অকূলে ভেসে পড়া।

* * *

এই অন্তর্যামী গুরুকে পাওয়ার একমাত্র পথ হল নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে খুলে ধরা। আমাদের অহঙ্কার দিয়ে তাঁকে ঢেকে রেখেছি, সেই আড়ালটি সরিয়ে নিতে হবে। আমাদের অহঙ্কার অশান্ত, তার দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, একটা-কিছু পাওয়ার লোভ তার বড় বেশী। এই দোষগুলি বর্জন করতে হবে। আকাশের মত স্বচ্ছ উদার আপ্তকাম একটা প্রশান্তির মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে হবে। এই বৃহৎ প্রশান্তিই গুরু। তিনি আছেন আমার সব ছেয়ে সব ছাপিয়ে—আমার কালো আমার অন্ধকার, আমার আনন্দ আমার বেদনা, আমার শ্রদ্ধা আমার সংশয় সবই সেই আকাশের বুকে বীচিভঙ্গের মত। আমার সব অবগুণেরই ক্ষমা আছে তাঁর কাছে। অফুরন্ত তাঁর ভালবাসা, অবিচল তাঁর ধৈর্য। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মত সত্তার সমস্ত রসমাধুরী দিয়ে তিনি তিলে-তিলে আমায় বিকশিত করে তুলছেন। এই তাঁর পরমকৃত্য, তাঁর 'জ্ঞাননয়ং তপঃ'।

অন্তর্যামী গুরুর এই স্বরূপকে আমরা মূর্ত দেখতে পাই মানুষ গুরুতে। দেখে আশ্বস্ত হই। কেননা নিজেদের রূপ আছে বলে রূপতৃষ্ণাও আমাদের আছে, তাই শুধু ভাবে পেয়ে আমাদের হৃদয় ভরে না। যদিও জানি ভাব আগে রূপ পরে, ভাবের দৃষ্টি না খুললে রূপ দেখে কিছুই বোঝা যায় না, তবুও প্রাণ আর ইন্দ্রিয়ের চিন্ময় তর্পণের জন্য রূপও যে চাই।

তাই 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।' আমরা তাঁর রূপ কল্পনা করি, তা নয়। ভাবের অনুরূপ হয়ে তিনিই আমাদের কাছে ধরা দেন। অন্তরে দেখা দেন ভাববিগ্রহ ইষ্টের রূপে, বাইরে দেখা দেন লীলাবিগ্রহ অবতাররূপে, গুরুরূপে। যিনি নির্গাম নীরূপ, তাঁরই নাম আর রূপ। দুইই সত্য। নাম আর রূপ যেমন সাধকের প্রথম অবলম্বন, তেমনি তাদের নিয়েই তার চরম বিলাস। রূপ হতে অরূপ, আবার অরূপ হতে রূপ—পরিক্রমা পূর্ণ হয় এমনি করেই।

ইষ্টদেবতা—অবতার—গুরু, রূপের পথে এমনি করে ক্রমে তিনি কাছে এগিয়ে আসেন। সব চাইতে কাছে তাঁকে পাই গুরুর মাঝে—গুরু আমার 'রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।'

অন্তর্যামী ইষ্ট অবতার গুরু—পূর্ণযোগের সাধক সবই মানেন। কিন্তু তা বলে 'আমার ইষ্ট, আমার অবতার, আমার গুরু' বলে তিনি গোঁড়ামি করতে পারেন না। অন্তর্যামীই সবার গুরু—'স সর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ'। 'ভগবানই গুরু' এই ভাব সিদ্ধ হলে তবে 'গুরুই ভগবান' বলবার অধিকার জন্মে। তখন বলা চলে 'যন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো যদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ, যদাত্মা সর্বভূতাত্মা'। আর ঐ শেষের অনুভবটি হল উপলব্ধি অখণ্ড হয়েছে কি না, তার কষ্টিপাথর। যে-আমি সবার মাঝে, সে-ই হল পাকা আমি। লীলা-বিগ্রহের মাঝে বিশ্বরূপ দেখবার দিব্যচক্ষু তারই আছে।

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, বিভূতির চাইতে যাঁর বিভূতি, তিনি বড়। আগে অন্তর্যামী, তারপর তাঁর বিভূতি। একথা ভুললে গুরুকে বড় করতে গিয়ে বুদ্ধির দোষে ছোটই করব।

শাস্ত্রে যেমন শিষ্যলক্ষণ আছে, তেমনি গুরুলক্ষণও আছে। তাও জানা দরকার।

পূর্ণযোগের যিনি গুরু, তিনি অন্তর্যামী গুরুরই প্রতিভূ। সুতরাং অন্তর্যামীর যে-রীতি, তারও সেই রীতি। শিষ্যকে তিনি পরিচালন করেন তার স্বভাব অনুযায়ী, গুরুভার হয়ে তার উপর চেপে বসেন না। অন্তরে রসের যোগান দিয়ে বাইরে মুক্ত আলো-হাওয়ার স্বচ্ছন্দ পরিবেশে তিনি ফুল ফুটিয়ে চলেন।

তাঁর দেশনার তিনটি অঙ্গ—অনুশাসন, আচরণ আর অনুভাব (influence)। তাঁর অনুশাসনের উদ্দেশ্য শিষ্যের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা, নিজের কতকগুলি মত তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া নয়। সাধনার পদ্ধতি তিনি বলে দেন একটা প্রাথমিক আলম্বন হিসাবে,—কিন্তু তাকেই যে চিরকাল আঁকড়ে থাকতে হবে একথা বলেন না। তাঁর দৃষ্টিতে উপায় সপ্রয়োজন হলেও লক্ষ্যটাই বড়।

গুরুর অনুশাসনের চাইতে আচরণ বড়। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' গুরু যা বলছেন, সে তাঁর অনুভূত সত্যেরই বাঙ্ময় রূপ। অনুভব শুধু বাণীতে রূপ ধরবে

না, রূপ ধরবে কর্মেও। তাইতে গুরুর সত্যকার কৃতিত্ব হচ্ছে একটা চিন্ময় পরিবেশের সৃষ্টিতে। তখন কথা না বলেও অনুশাসন করা চলে। আবার গুরুর আচরণও হবে স্বচ্ছ উদার এবং সহজ—ভঙ্গিসর্বস্ব নয়। আচরণের একটা ছক বাঁধা থাকলে তার অনুকরণ করা সহজ হয়। কিন্তু শিষ্যের স্বভাবের উন্মেষে তা সহায়তা করে না। আচরণ শেষ পর্যন্ত আবরণই হয়ে দাঁড়ায়।

সবচাইতে বড় কথা হল গুরুর অনুভাব। শক্তিসঞ্চার করবার ক্ষমতা না থাকলে গুরু হওয়া যায় না। আবার 'অক্ষীয়মাণ উৎসের' সঙ্গে যোগ না থাকলে শতধারায় নিজেকে বইয়েও দেওয়া যায় না। শঙ্করাচার্যের একটি শ্লোকে আছে, 'বটগাছের তলায় এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখে এলাম। তরুণ গুরু বসে আছেন, আর তাঁকে ঘিরে বসেছে বৃদ্ধ শিষ্যেরা। গুরুর মৌনই হল তাঁর উপদেশ, আর তাইতে শিষ্যদের সংশয় ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।' এই দক্ষিণামূর্তি গুরুই সদ্‌গুরু। তাঁর গুরুগিরি আত্মজ্যোতির নিঃশব্দ বিকিরণে।

আরেকটা বিষয়ে গুরুকে সাবধান হতে হবে। 'আমি গুরু' এই অভিমান থাকলে গুরু হওয়া যায় না। গুরু অন্তর্যামীর প্রতিভূমাত্র। 'মা যা বলাচ্ছেন তা-ই বলছি, যা করাচ্ছেন তা-ই করছি'—এই তাঁর ভাব। তিনি পথের সাথী, পথের শেষ নন। কিন্তু এইখানে এসে সিদ্ধেরও ভরাডুবি হয়ে যায়। গুরুগিরির অহঙ্কার হল মহামায়ার শেষ বন্ধন। তাকে কাটিয়ে ওঠা সহজ কথা নয়।

*

বাকী রইল কাল। 'কালেনাত্মনি বিন্দতি'—কালক্রমে নিজের মাঝেই মানুষ বস্তু খুঁজে পায়। বাস্তবিক, সময় না হলে কিছুই হয় না। আধ্যাত্মিক সাবালকত্বেরও একটা সময় আছে। তবে এও ঠিক, সে-সময় সবারই আসবে। সময় যখন আসে, তখন দেখা দেয় ব্যাকুলতা—আর যেন তখন তর সয় না। তখনই কালের সঙ্গে লড়াই। আগেই বলেছি, যোগসাধনাটা হল একটা কালসংক্ষেপের ব্যাপার। প্রবর্তসাধকের পক্ষে কালকে মনে হয় একটা বাধা। তাঁর সঙ্গে যুক্ত থেকে তখন পুরুষকারের প্রয়োগ করতে হয়। শক্তির যোগান তিনিই দিয়ে যান। ক্রমে বাধা যতই দুর্বল হয়ে আসে, কালের বেগ ততই বাড়ে, কালকে তখন মনে হয় অনুকূল। আর শেষ পর্বে সাধকের হাত থেকে যখন তিনি সাধনার ভার তাঁর হাতে তুলে নেন, তখন কাল হয় যন্ত্র, সাধক কালাতীত। শাশ্বতকাল আর একটি ক্ষণ তখন তার কাছে এক।

কালের প্রতি প্রবর্তসাধকের মনোভাব হবে এই : সাধনার জন্য অনন্তকাল তার সামনে পড়ে রয়েছে, সুতরাং তাকে হতাশ বা ধৈর্যহারা হলে চলবে না। অথচ তার যা চাই, তা এই মুহূর্তেই চাই। অর্থাৎ অবিচল ধৈর্যের ভূমিকায় প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োগ—এই হল কালজয়ের সঙ্কেত।

২

আত্মোৎসর্গ

যোগে মানুষ দ্বিজ হয়, বুদ্ধির ভূমি হতে উত্তীর্ণ হয় বোধির ভূমিতে। একটা বৃহত্তর সত্তার আবেশে মানুষ তখন হয় ঊর্ধ্বমুখ এবং দ্বিতীয়, জীবনের একটা নতুন অর্থ সে খুঁজে পায়। বাইরে থেকে দেখতে গেলে এই আবেশ এবং নবজন্মের কারণ সবার পক্ষে এক হয় না। কিন্তু ভিতরের কারণটা সবার বেলাতেই এক। সাধনশাস্ত্রের ভাষায় তাকে বলে প্রসাদ বা শক্তিপাত। সময় হয়েছে, তাই কে যেন এসে তোমায় ছুঁয়ে গেল। আর সেই ছোঁয়ায় শিউরে উঠে সমস্তটা সত্তা যেন উন্মুখ হয়ে উঠল অলখের জন্য।

সত্যকার সাধনা তখন থেকেই শুরু হয়। তার আগেও সাধনা চলতে পারে—কতকটা গতানুগতিকভাবে, কতকটা-বা ঢিমাতেতালা চালে। সে যেন আধঘুম-আধজাগরণের অবস্থা। তার একটা অস্বস্তি আছে, কিন্তু তাকে কাটিয়ে ওঠবার মত উৎসাহের দীপ্তি নাই। শক্তিপাতে চিত্ত যেন গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে। বৃথা কালহরণ তখন অসম্ভব হয়।

বাউল বলেন, 'গুরু মন্ত্র আর ইষ্ট তিনের দয়া হল, একের দয়া বিনা জীব ছারখারে গেল'। এই এক হল সাধক নিজে। তাঁরই প্রসাদে সব হচ্ছে এবং হবেও, কিন্তু খাটতে হবে নিজেকেই। 'কৃপার বাতাস সবসময়ই বইছে, কিন্তু তবুও তুই পাল তুলে দে।' তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সচেতন সহযোগিতার সম্পর্ক—আগাগোড়া। আমি এক পা বাড়ালে তিনি দশ পা এগিয়ে আসবেন; কিন্তু ঐ এক পা বাড়াতে হবে আমাকেই।

এই জন্যই সাধনার সত্যকার শুরু হয় একটা ব্রতদীক্ষাতে। 'ব্রত' মানে যা বরণ করে নেওয়া হয়েছে; আর 'দীক্ষা' মানে অতীতটাকে একেবারে পুড়িয়ে ছাই করে দেবার তীব্র ইচ্ছা। সমস্ত হৃদয় বলবে, 'তোমাকেই আমি বরণ করে নিলাম,—তোমাকে ছাড়া আর কিছুই আমি চাই না। আমি কূল হতে আজ অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তোমারই জন্য।' গোপাচিত্ত না জাগলে সাধনার শুরুই হয় না। নিজেকে অনিঃশেষে তাঁর কাছে উৎসর্গ করতে হবে। দেহ-প্রাণ-মন হৃদয় সব দিয়ে চাইতে হবে শুধু তাঁকেই—আর কাউকে নয়, কিছুকেই নয়।

শক্তিপাত যদি তীব্র হয়, আত্মোৎসর্গ সহজ হয়। তিনি যেন জোর করে আমায় কূলের বার করে নিয়ে যান। পথের বাধা তখনও থাকে, কিন্তু মনে-প্রাণে তো কোনও দোটানার বাধা থাকে না। পথে বেরিয়ে তখন চলার বেগে আপনা থেকেই পায়ের তলায় পথ জেগে ওঠে। আর হৃদয়ে রয়েছেন দিশারী। আমার সব-কিছু তাঁকে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। কোন্ পথ দিয়ে তিনি নিয়ে চলেছেন, সে-বিচার আমার নয়—তাঁর হাতে হাত রেখে কেবল চলি, কেবল চলি।

কিন্তু এমনি করে বুকের আলোতে পথ চলা সম্ভব হয় কেবল উত্তমাধিকারীর বেলাতেই।

সাধারণত আত্মোৎসর্গ সিদ্ধ হয় ক্রমে-ক্রমে। দীক্ষা আর উৎসর্গের মাঝে একটা দীর্ঘ দিনের ফাঁক থাকে। আদর্শ কি তা মন হয়তো বোঝে, কিন্তু পথ চলতে পদে-পদে কেবল হোঁচট খায়। সাধনায় অন্তরের আগ্রহ আছে, কিন্তু সমস্ত সত্তার হয়তো সায় নাই। তখনই সাধকের যত বিড়ম্বনা। হয়তো তখন সারাজীবন প্রস্তুতিতেই কেটে যায়। কিম্বা একজায়গায় এসে নৌকা চড়ায় ঠেকে যায়, আর এগুতে পারে না। আবার বেশ উঁচু অবস্থা থেকে পতনও হয় কখনও-কখনও। এসবই ঘটে, তাঁকে সব দিতে পারিনি বলে, কোথাও-না-কোথাও আত্মাভিমান থেকে গেছে বলে। 'আলোর পথে চলতে-চলতে যে-ছেলে বাপের হাত ধরে, তার পড়ে যাবার ভয় থাকে। কিন্তু বাপ যার হাত ধরে, সে পড়লেও বাপই তাকে টেনে তোলে।' তবে কিনা যোগভ্রষ্টের কখনও সর্বনাশ হয় না। গীতার ভাষায়, 'কল্যাণকৃৎ-এর কখনও দুর্গতি হয় না।' খেমে থাকা বা পড়ে যাওয়া একটা সাময়িক ব্যাপার। তাঁকে যে চেয়েছে, তিনিই তাকে চেয়েছেন বলে তবে না সে চাইতে পেরেছে। সুতরাং অকুণ্ঠ আত্মোৎসর্গের শুভলগ্ন একদিন তার আসবেই, পাওয়া তার সার্থক হবেই।

*

সংস্কারের বাধাই হল পথের সবচাইতে বড় বাধা। অবিদ্যার পরিবেশে জন্মেছি বেড়ে উঠেছি, তারপর হয়তো এসেছি যোগের পথে। এখন চেতনার মোড় একেবারে উল্টাদিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এতদিনের অভ্যাসের মুচড়া কি একদিনে কাটিয়ে ওঠা যায়? দেহ-প্রাণ-মন সব উপরের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে—এই হল আদর্শ। কিন্তু সে-আলোর স্বরূপ তো আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কি করে আধারে তাকে নামিয়ে আনব?

এ একটা দারুণ সমস্যা বটে, কিন্তু তার সমাধানও আছে আমাদের চাওয়ার মধ্যেই। তাঁকে যে চায়, তার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বিবেক আর বৈরাগ্যের শক্তি আপনা হতেই জেগে ওঠে। বিষয়সুখ তার কাছে আলুনি লাগে। সে বেশ বোঝে, সবাই যা নিয়ে মেতে আছে, তা সে চায় না—চায় আরেকটা কিছু। সংস্কারের জাল তবুও তাকে জড়িয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার সমস্তটা প্রাণ ঝাঁকুপাকু করে জাল ছেঁড়বার জন্যই।

দেহ-প্রাণ-মনের অভ্যস্ত সংস্কারকে যখন আলোর পথে বাধা বলে মনে হয়, তখন সাধক প্রায়ই ধরে উচ্ছেদের পথ। সে ভাবে, 'এই প্রাকৃত-অনুভবের স্তরে যতক্ষণ আছি, ততক্ষণই ঝামেলা। একে যদি ভুলতে পারি, তাহলে আর ঝামেলা নাই। এ-জগতে কোথাও শান্তি নাই, সুখ নাই। যাকে সুখ বলে মনে করি, তাও সুখের মুখোসপরা দুঃখই শুধু। শান্তি আর সুখ জগতের ওপারে। অথবা, সুখ সেখানে না থাক, অন্তত দুঃখ তো একেবারেই নাই—কেননা দেহ-প্রাণ-মনের অস্তিত্বেই দুঃখের অস্তিত্ব। বিদেহমুক্তিতে দুঃখ নাই। সুতরাং তা-ই আমাদের পরমপুরুষার্থ। তার পথ হল, সমস্ত বৃত্তির নিরোধ, দেহ-প্রাণ-মনের উচ্ছেদে প্রাকৃত-সত্তার পরিনির্বাণ।

নিরোধযোগের এই লক্ষ্য। বলা বাহুল্য পূর্ণযোগের লক্ষ্য তা নয়। নিরোধযোগী অথও সত্তাকে দু'খণ্ড করলেন—একটা ইহলোক, আরেকটা লোকোত্তর। তাঁর মতে লোকোত্তরই সত্য, অতএব ইহলোক মিথ্যা। মিথ্যা হলে ওটা আছে কেন? জবাব হল, আসলে ওটা নাই, ওর থাকাটা একটা মায়া। কার মায়া?—লোকোত্তরের মায়া হলে তা সত্যেরই মায়া, সুতরাং সত্য। আর ইহলোকের মায়া হলে তা আমারই মনের মায়া। তখন জগৎকে যে মিথ্যা বলি, সে আমার গরজে। আবার সুষুপ্তিতে জগৎ লোপ হয়ে যায়—আমারই কাছে; আসলে জগৎটা কিন্তু থেকেই যায়। আর সুষুপ্তিতেও যদি কেউ জেগে থাকে, থেকে চেতনার উদয়-বিলয়ের দিকে তাকায়, তাহলে সে দেখে – তুর্যাতীতের যে-জাগৃতি, তার একটা দিক তুরীয়, আরেকটা দিক জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির উদয়-বিলয়। নিরোধ-যোগী শুধু ঐ তুরীয়টুকুকে লক্ষ্য করছেন, কিন্তু পূর্ণযোগী তুর্যাতীতের ভূমিতে থেকে নিচ্ছেন চারটি ভূমিই। লোকোত্তর এবং ইহলোক দুইই তাঁর কাছে সত্য।

তাছাড়া এ-মীমাংসা শুধু বুদ্ধির মীমাংসা। এর পরেও আছে প্রাণের মীমাংসা, আনন্দের মীমাংসা। দুঃখকে হেয় বলি, কেননা তাকে অনুভব করি চেতনার একটা বাধা বলে। এটা হল বুদ্ধির বিচার। কিন্তু তা-ই কি দুঃখের একমাত্র রূপ? দুঃখ কি চেতনাকে উদ্বুদ্ধও করে না, প্রাণে দুঃখকে আনন্দে রূপান্তরিত করবার বীর্যও জাগায় না? ভালবাসার দুঃখ কি অনির্বচনীয় আনন্দ-বেদনার রূপ ধরে না? অর্থাৎ শুধু বুদ্ধির বিচারে দুঃখ হেয় হলেও সঙ্কল্পের বিচারে ভালবাসার বিচারে দুঃখ হেয় নয়। দুঃখকে স্বীকার করে নিয়েই মহাযোগীর সাধে চলতে পারে প্রেমের আর করুণার তপস্যা। দুঃখময় জগতের সার্থকতা তখন আরেকদিক দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুঃখ আছে, তাকে জয় করে আনন্দে রূপান্তরিত করবার জন্যই। প্রকৃতির যান্ত্রিক পরিণামই তার স্বরূপের সত্য নয়, তাহলে জগৎকে কেবলই দুঃখের নিদান বলা চলত। কিন্তু প্রকৃতির ঐ পরিণামের গভীরতর তাৎপর্য রয়েছে রূপান্তরে, অন্তর্গূঢ় চেতনার ক্রমিক উৎকর্ষণে। এই দর্শন পূর্ণযোগীর।

*

পশুর জীবনের চাইতে মানুষের জীবনে জটিলতা বেশী। এই জটিলতা তার উদ্বুদ্ধ চেতনার দান। সে পশুর চাইতে দেখে বেশি বোঝে বেশি, তাই তার ঝামেলার আর যেন অন্ত নাই।

তবুও প্রাকৃত-মানুষের জীবন কতকটা গতানুগতিকতার পথ ধরে চলে বলে তার মাঝে বোঁটের উপর খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য থাকে। বাইরটাকে নিয়ে হয়রানি থাকলেও নিজের ভিতরটাকে নিয়ে তার বিশেষ মাথাব্যথা নাই। কতকগুলি স্থূল অভ্যাস আর রুচির কোনও-রকম পরিতৃপ্তি হলেই সে খুশী। অন্তরে তার গরুড়ের ক্ষুধা নাই, তাই অন্তত একটা দিক দিয়ে সে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু বাইর থেকে যে অন্তরে ঢোকে, সে যেন প্রথমটায় 'বাঁশবনে ডোমকানা' হয়ে যায়।

বিভিন্ন বৃত্তি আর সংসারের এত জটিলা যে তার মাঝে, এ ছিল তার স্বপ্নেরও অগোচর। নিজেকে আবিষ্কার করতে গিয়ে সে দেখে—সে একটা মানুষ নয়, দশটা মানুষ। আর এই দশটা মানুষও যে মিলে-মিশে ঘর করছে, তা নয়। জীবনের সদরমহলে তাদের একজন কি দু'জনকেই মাত্র দেখা গেছে, কিন্তু অন্দরে যে আরও এতজন লুকিয়ে ছিল, তা কে জানত? তাছাড়া শুধু নিজের ঘরের মানুষই নয়, আছে পড়শীরাও। অন্তর্মুখীনতায় চেতনা যত সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ও স্পর্শকাতর হয়, ততই শুধু নিজের গভীর হতে নয়, বিশ্বপ্রকৃতির নানা ভূমি হতেও শক্তির বিচিত্র তরঙ্গে মানুষ সাড়া দিতে বাধ্য হয়। তাকে প্রথমটায় আত্ম-আবিষ্কারের দাম দিতে হয় এমনিতর বিচিত্র বিক্ষুব্ধ ও বিরুদ্ধ শক্তির আবর্তে নাকানিচুবানি খেয়ে। অর্থাৎ যোগ করতে গিয়ে প্রথমটায় চঞ্চল চিত্ত আরও চঞ্চল হয়ে ওঠে। কাঠে যতক্ষণ আগুন ধরেনি, ততক্ষণ সে ছিল ভাল। কিন্তু আগুন ধরতেই বেরতে লাগল ধোঁয়া আর গ্যাজলা—কোথায় তাপ, কোথায় আলো।

এ-সমস্যার প্রচলিত সমাধান হচ্ছে ঐকান্তিক(exclusive) একাগ্রতার সাধনা—নিজের সংস্কার এবং রুচি অনুযায়ী চিত্তের যে-কোনও একটি প্রবণতাকে ঊর্ধ্বমুখী করে আর-সবাইকে উচ্ছেদ করা বা দাবিয়ে রাখা। কেউ বেছে নিল ভক্তির পথ—জ্ঞানের কথা তার কাছে বিষ। আবার যে জ্ঞানের পথ ধরল, ভক্তি তার কাছে একটা মাতলামি মাত্র; সে চায় নিথর চেতনায় প্রজ্ঞার প্রশান্ত দীপ্তি, দেহ-মন-প্রাণের কোনও দাবিকেই সে আমল দিতে চায় না। আত্ম-আবিষ্কারের প্রাথমিক জাবেলার হাত হতে রেহাই পাবারও ঐ এক পথ: চিত্তের সমস্ত বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করে অন্তরের সব কোলাহল স্তব্ধ করে দাও, গুহাহিত হও; শক্তির তরঙ্গ ঐ গুহার পাষাণপ্রাচীরে ঘা খেয়ে ফিরে যাবে। তুমি নিজেকে নিয়ে বা দেবতাকে নিয়ে মণিকোঠায় একলা থাকবে। জগৎ পড়ে থাকবে দেউলের বাইরে।

এমনি করে ঐকান্তিক একাগ্রতা পর্যবসিত হয় নিরোধে। নিরোধযোগের সার্থকতা যে নাই, তা নয়। কিন্তু তার ত্রুটিও আছে। প্রথম ত্রুটি, দৃষ্টির ঔদার্যের অভাবে নিরোধ যদি নিগ্রহের (repression) পথ ধরে, তাহলে আধারের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ন হবার আশঙ্কা আছে। দ্বিতীয় ত্রুটি, নিরোধ স্বভাবতই ব্যাপ্তিচৈতন্যের বিরোধী। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আমরা পাই শান্তি। শান্তি পেতেই হবে। কিন্তু ধ্যানের শান্তি যদি কর্মে বজায় না থাকে, তাহলে সে-শান্তিসাধনা হল একাঙ্গী এবং অপূর্ণ। সুতরাং পূর্ণযোগীর পক্ষে নিরোধের সাধনা একটা সাময়িক উপায় হলেও কখনও চরম লক্ষ্য হতে পারে না। নিরোধের ফল যে-উপশম (quiessence), তা জাগ্রতের ব্যাপ্তিচৈতন্যকে বজায় রেখেও নামিয়ে আনা যেতে পারে। গুহার অন্ধকারে যে-আকাশ নিথর হয়ে আছে, সেই আকাশই প্রশান্ত প্রসন্নতায় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সমস্ত বিশ্বের 'পরে, আবিষ্ট হয়ে আছে তার অণুতে-অণুতে। তাকে চোখ মেলেই দেখা যায়। উপনিষদের ঋষি বলেন, তাকে সজীবন আনন্দরূপে এই হৃদয়ে নামিয়েও আনা যায়।

এই আকাশের প্রশান্ত প্রসন্ন বিস্তারের ভূমিকায় পূর্ণযোগের সাধনা। সে-সাধনা 'সর্বে-ষানবিরোধেন'—সবাইকে স্বীকার করে নিয়ে এক পরম চেতনায় সবার সুষম আপ্যায়নে। বাধার সঙ্গে লড়াই পূর্ণযোগীকেও করতে হয়—বরং তাঁর লড়াই আরও সঙ্কুল, আরও অশ্রান্ত। ঘরের লড়াই শেষ হলে তাঁর শুরু হয় বাইরের লড়াই, যুগযুগান্তেও তা থামতে চায় না। ব্যাপ্তি-চৈতন্য যে-যোগের ভিত্তি, তার সাধনা একার জন্য নয়, সবার জন্য। আর চৈতন্যের সত্যকার ব্যাপ্তি তার বর্তুলতায় (globality)। সে শুধু অনায়াস ঔদাস্যে ছড়িয়েই পড়ে না, শক্তির বৈদ্যুতীতে অনুপ্রবিষ্টও হয় সব-কিছুর মর্মে-মর্মে। তাই আত্মপ্রকৃতির এবং বিশ্বপ্রকৃতির রূপান্তর হয় তার পরম সাধ্য। প্রবর্তসাধকের বেলায় একাগ্রতা তখন ধরে নিত্যসচেতনতার রূপ। নিজের ইচ্ছামত একটা-কিছু ঘটিয়ে তোলা নয়, কিন্তু অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে সব-কিছু ঘটতে দেওয়া এক পরম চেতনায় নিত্যসচেতন থেকে—এই হল এই যোগানুশাসনের প্রথম সূত্র। বলা বাহুল্য, এটা সহজ নয়। কিন্তু এ যখন সহজ হয়, তখন আর পাওয়ার কিছুই বাকী থাকে না।

সব যোগেরই মুখ্য সাধন হল একাগ্রতা। দেখলাম, একাগ্রতার দুটি রূপ—একটি ঐকান্তিক, আরেকটি পরিব্যাপ্ত। একটিতে সাধক নিজের গভীরে তলিয়ে যায়, তখন জগৎ থাকে না আরেকটিতে সবার মাঝে সে ছড়িয়ে পড়ে, অথবা সবার মাঝে যিনি ছড়িয়ে আছেন তাঁর কাছে নিত্যসচেতনতার দ্বারা ধ্রুবা-স্মৃতির দ্বারা নিজেকে মেলে ধরে। একটি তপস্যা যেন বীজের, আরেকটি ফুলের। একটি বৃত্তির একাগ্রতা, আরেকটি ভাবের একাগ্রতা। শকুন্তলা জগৎ ভুলে দুষ্মন্তকে ভাবছিল, তাই তার জীবনে নেমে এল প্রত্যাখ্যান আর বিচ্ছেদের অভিশাপ। কিন্তু দুষ্মন্তের ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে চিত্তের বৃত্তিগুলিকে সে কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করত যদি, তাহলে তাকে কিছুই হারাতে হত না। বিশেষ-কোনও প্রয়োজনে বৃত্তির একা-গ্রতা দরকার হতে পারে, কিন্তু পূর্ণযোগে ভাবের একাগ্রতাকে ঠাঁই দিতে হবে সবার উপরে।

কুঁড়ি যেমন করে গুটিয়ে থাকে তেমন করে নয়, ফুল যেমন করে আলোর পানে দল-গুলি মেলে ধরে তেমনি করে আধারের সবখানি তাঁর পানে মেলে ধরতে হবে। এইটি হল আসল কথা। মাছ যেমন সমুদ্রের মাঝে ডুবে থেকে অবাধে সাঁতরে বেড়ায়, আমরা যেমন আলোর সমুদ্রে বায়ুর সমুদ্রে আকাশের সমুদ্রে ডুবে থেকে বিচরণ করছি, তেমনি করে তাঁর মাঝে নিজেকে সবসময় নিমজ্জিত বলে অনুভব করতে হবে। এই ভাবনা যদি একাগ্র অকপট এবং নিরন্তর হয়, তাহলে সত্তার গভীরে একটা-কিছু যেন কম্পাসের কাঁটার মত নড়ে ওঠে, আর সাক্ষাৎ-ভাবে ঐ-বৃহতের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে চায়। গভীরের এই অভীপ্সার যে-বাহন, তাকে বলি চৈত্যপুরুষ। চৈত্যপুরুষই আমাদের মাঝে সত্যকার সাধক। তাঁর সাধনা আধারের স্বভাব অনুযায়ী। কেউ সাড়া দেয় জ্ঞানে, কেউ-বা ভক্তিতে; অর্থাৎ কেউ তাঁকে ধরতে চায়

বুদ্ধি দিয়ে, কেউ হৃদয় দিয়ে। যার যেমন স্বভাব সে তেমন করে সাধনা শুরু করবে বটে ; কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, সাধকের বিচারবুদ্ধি যেন সবসময় সজাগ থাকে। মানুষ মনোময় জীব, মনই হল তার প্রগতির মুখ্য সাধন। মনের উৎকর্ষ ঘটে বুদ্ধিতে, বুদ্ধির উৎকর্ষ বোধিতে। সাধকের বিচারবুদ্ধি হবে এই বোধির আশ্রিত। বোধির মাঝে আছে সত্যকে অপরোক্ষভাবে জানবার একটা স্বাভাবিক সামর্থ্য। হৃদয় দিয়ে বোঝার সঙ্গে তার তুলনা করা যেতে পারে। একটা চলতি কথা আছে, 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।' বিচারবুদ্ধি যদি তর্কবুদ্ধিতে পর্যবসিত হয়, তাহলে চেতনা ধূম্রাচ্ছন্ন হয়ে যায়। বোধি তর্ক করে না, কিন্তু বস্তুর সত্য তার কাছে 'প্রতিভাত' হয়। এই জন্য যোগীচিত্তের এই অপরোক্ষকারী বৃত্তিকে বলে 'প্রাতিভ-সংবিৎ'। প্রাতিভ-সংবিৎ সবার মাঝেই আছে। দেহকে শুচি, প্রাণবাসনাকে প্রশান্ত এবং মনকে ভাবে একাগ্র করলে এই সংবিৎ বা বোধিচিত্ত আপনা হতেই আমাদের মাঝে ভেসে ওঠে। তখন মন-বুদ্ধিকে তার অধীন করে দিতে হয়। অনুভব করতে হয়, জ্ঞান বা ভাব বাইরে থেকে আসছে না, আসছে উপর থেকে -- কেউ যেন তা আমার মাঝে ঢেলে দিচ্ছে। এইভাবে যা আসে, তা-ই মানসোত্তর বোধিজাত জ্ঞান। প্রথম-প্রথম এই জ্ঞানেও অবিদ্যামনের কিছু-কিছু ভেজাল থাকে। কিন্তু চিত্ত যতই বাসনাশূন্য এবং অহংশূন্য হয়, ভোরের আকাশ আলো ফোটবার প্রতীক্ষায় যেমন স্তব্ধ হয়ে থাকে তেমনি ঊর্ধ্বশক্তির প্রকাশের প্রতীক্ষায় নিজেকে প্রশান্ত রাখতে পারে, ততই বোধির আলো স্বচ্ছ হয়ে ফোটে।

এই আলো ফোটবার সঙ্গে-সঙ্গে একাগ্রতার সাধনাও সহজ এবং সর্বাঙ্গীণ হয়ে আসে। চেতনার তিনটি বৃত্তি আমাদের মাঝে একসঙ্গে কাজ করছে—বুদ্ধিবৃত্তি হৃদয়বৃত্তি আর সঙ্কল্প-বৃত্তি। মনের ভূমিতে সাধারণত এই তিনটির একটি প্রবল হয়ে আর দুটিকে দাবিয়ে রাখে, তাইতে সাধনা প্রায়ই একাঙ্গী হয়ে যায়। কিন্তু পূর্ণযোগের সাধনা অখণ্ডের সাধনা। তর্ক-বুদ্ধি এই অখণ্ডের বোধ দিতে পারে না, দিতে পারে বোধি। বোধির উন্মেষেই বুদ্ধি হৃদয় আর সঙ্কল্প এই তিনটির বৃত্তিকে যুগপৎ আশ্রয় করে পরিব্যাপ্ত একাগ্রতার সাধনা চলতে পারে। বোধি অপরোক্ষভাবে অনুভব করে সৌরকরোজ্জ্বল আকাশের মত এক সর্বব্যাপী সর্বাবগাহী পরম সত্তাকে, যার মাঝে দেহ-প্রাণ-মন নিমজ্জিত হয়ে আছে। সেই সত্তার জ্যোতিঃশক্তি আধারে আবিষ্ট হয়ে বুদ্ধিকে করে পরমের একাগ্রভাবনায় উদ্দীপ্ত, হৃদয়কে তাঁর তন্ময় আস্বাদনে নন্দিত, সঙ্কল্পকে এক অব্যভিচারী অভীপ্সায় উদাত্ত। ভূমার আবেশই তখন হয় জীবনের দিশারী।

• • •

এই-যে পরম, এই-যে ভূমা, তাঁর স্বরূপ কি ? সাধ্যের একটু-কিছু পরিচয় না পেলে একাগ্রতার সাধনা চলবে কি করে ? শাস্ত্র পড়ে বা গুরুর মুখে শুনে তাঁর সম্বন্ধে অনেক-কিছুই

জানা যায়। তাতে হয়তো প্রাকৃত-মনের সংশয় দূর হয়, বুদ্ধি একটা লক্ষ্যে স্থির হয়। কিন্তু এটা হল জ্ঞান, বিজ্ঞান নয়। দুধ কেমন তা শুনলাম চোখেও দেখলাম, কিন্তু খেয়ে দেখলাম না। তাই শুধু বুদ্ধি দিয়ে তাঁর ধারণা করাই যথেষ্ট নয়। তাঁকে পেতে হবে হৃদয় দিয়ে, বোধে তাঁকে বোধ করতে হবে। দেহ-প্রাণ-মনের সবখানি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে তাঁর ছোঁয়ায়, তবে জানা হয়ে উঠবে পাওয়া।

বুদ্ধি দিয়ে যে সাধ্যবস্তুর প্রাথমিক ধারণা, তাও পূর্ণযোগের সাধকের বেলায় উদার এবং সর্বগ্রাহী হওয়া চাই। নানা জন নানা পথে গিয়ে নানাভাবে তাঁকে পেয়েছেন। সবার প্রাপ্তিই চরম এই অর্থে যে, যিনি যেভাবে চেয়েছেন, তিনি সেইভাবেই পেয়েছেন। কেউ তাঁর মাঝে সব হারিয়ে সমস্ত অস্তিভাবের প্রলয়ে পৌঁছেছেন এক মহাশূন্যতার অমানিশায়; কারও বোধ পর্যবসিত হয়েছে এক নির্বিশেষ সত্তামাত্রে—সে-সত্তা কখনও আকাশ, কখনও বিন্দু; কেউ দেখেছেন চিদাকাশে নিস্তরঙ্গ আলোর অমের পরিব্যাপ্তি কেউ দেখেছেন সেই আলোর বুকে আনন্দের ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটা; কেউ দেখেছেন দ্যুলোকের আলিঙ্গনে রোমাঞ্চিত পৃথিবীর বুকে এক লীলোচ্ছল অনির্বচনীয় রসোল্লাস; কেউ দেখেছেন নটরাজের তাণ্ডবের তালে এক অনিরুদ্ধ শক্তির ঋতচ্ছন্দোময় উচ্ছ্বাস। আরও কত বিচিত্র দর্শন—যার প্রত্যেকটিই সত্য, প্রত্যেকটিই তাঁর অনিঃশেষ মহিমার একটি প্রকাশ। এই সব নিয়ে পূর্ণযোগীর সাধ্যের ভাবনা হবে অসীমের সুনীল শূন্যতায় একটি সহস্রদল আলোর পদ্মের মত। তাঁর ব্রহ্ম নির্গুণও, আবার সগুণও। নির্গুণরূপে তিনি সর্বাধার অধিষ্ঠান, সগুণরূপে অন্তর্যামী যোগেশ্বর। যুগপৎ তিনি শূন্য, তিনি সত্তা, তিনি চৈতন্য, তিনি আনন্দ, তিনি শক্তি—তিনি সর্বযোনি সর্বেশ্বর সর্বময় পুরুষোত্তম।

বৃহৎ হয়ে বৃহৎকে পেতে হবে। সে-পাওয়ার পথে বাধা আসে সঙ্কীর্ণ অহংএর কাছ থেকে। আমি আছি গুটিপোকার মত, নিজেরই রেশমের জালে নিজেকে জড়িয়ে আছি। আমার ছোটখাট কামনা-বাসনা আছে, সেগুলোর তৃপ্তি আমার আগে চাই। বৃহৎকে আমি ডরাই। তার প্লাবন যদি আমার বালির ঘর ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আমি কি নিয়ে থাকব, কোথায় থাকব?

তবুও এমন-একটা সময় আসে, যখন বৃহৎকেও আমি চাই। তাঁকে ছাড়া এ-সংসার যেন বিস্বাদ লাগে। তাঁকে চাই আমার মনের মতন করে।

মনের মতন চাইতে গিয়ে আবার ফাঁপরে পড়ি। অহমিকার সূক্ষ্মসংস্কার যে তারও মাঝে লুকিয়ে আছে। অবশ্য চাওয়াটা দোষের নয়। আবার তাঁকে চাওয়া হল সকল চাওয়ার চরম। শাস্ত্রে তাকে বলে 'সতীবাসনা'। আর-সব বাসনা অসতী।

কিন্তু তাঁকেও চাইতে জানতে হয়। চাইলেই পাওয়া যায় না—চাইতে হবে শুদ্ধ হয়ে, অহংবর্জিত হয়ে। বলতে শিখতে হবে, 'আমার মতন করে নয়, তোমার মতন করে তুমি প্রকাশিত হও। তুমি আমাকে নিরাকৃত করনি, জানি। আমিও যেন তোমায় নিরাকৃত

না করি। যে-রূপেই তুমি আস না কেন, হৃদয়ের আসনখানি যেন তোমায় পেতে দিতে পারি।'

তাঁকে চাওয়ার অর্থ হল সম্পূর্ণ রিক্ত হওয়া। একটি-একটি করে কাঠ সরিয়ে নিলে আগুন আপনা থেকে নিবে যায়। তেমনি করে বাসনার আগুন নিবিয়ে দিতে হবে। দেহে-মনে-প্রাণে থাকবে শুধু এক পরিনির্বাণের প্রশান্তি, আর তারই মাঝে পরিব্যাপ্ত সত্তার বোধ। 'শুধু—তুমি আছ। তাই আমি আছি। তুমি আছ বলেই আছি।'

ভোর হওয়ার আগে আকাশের মাঝে যেমন থাকে আলোর জন্য এক স্তব্ধ প্রতীক্ষা, তেমনিতর প্রতীক্ষার প্রশান্ত আকূতি সমস্ত হৃদয় জুড়ে—আর-কিছু নয়। তা-ই নিয়ে চলছে ইষ্টের ধ্রুবা-স্মৃতির আবর্তন—জপমালার মত। একটি মুহূর্ত তাঁকে ভুলতে পারছি না।

আকূতি সার্থক হয়। আলো ফোটে, অন্তর-বাইর সব ছাপিয়ে ফোটে উষার আলো। সে-আলোতে দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির আপ্যায়ন হয়। তাদের সঙ্কীর্ণ বাসনার রূপান্তর হয় তাঁর দিব্যসঙ্কল্পে। আকাশভরা আলো নুয়ে পড়েছে ছোট্ট একটি ফুলের বুকে, পরম প্রেমে পরম প্রজ্ঞায় পরম নৈপুণ্যে তাকে ফুটিয়ে তুলছে। চোখের সামনে এই তো ঘটছে দেখছি। তবুও আমার বেলায় আবার অহং-বাসনা বাদী হয়ে দাঁড়ায়।

ঐ ফুলের ভাব আরোপ করতে হয় নিজের মাঝে। অসীমের কাছে অমনি করে নিজেকে মেলে ধরা—পরম নির্ভরে, পরম প্রত্যয়ে। তা-ই আত্মোৎসর্গের চরম।

* *

দেহে-প্রাণে-মনে সর্বতোভাবে তাঁর হওয়া, অতীতের স্মৃতি বা ভবিষ্যতের কল্পনা বর্জন করে প্রতিমুহূর্তে তাঁর হয়ে ওঠা—এই দিয়ে সাধনার সত্যকার শুরু।

কিন্তু এ-ভাব তো প্রথম থেকেই আসে না। অনেকদিনের অভ্যাসে ধীরে-ধীরে তাকে চেতনায় ফুটিয়ে তুলতে হয়।

সাধনার শুরুতে দেখি, জীবনটা আছে একটা সোটানার মধ্যে। পরা-প্রকৃতির আকর্ষণ আছে যেমন, তেমনি অপরা-প্রকৃতির দাবিও আছে। অপরা-প্রকৃতিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না, সুতরাং কাজ শুরু করতে হয় তাকে নিয়েই। আমি যা আছি, তা-ই নিয়ে সাধনার পথে আমায় পা বাড়াতে হবে।

প্রথমেই হল মোড় ফেরানোর সাধনা। দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সবার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে তাঁর দিকে; এদের স্বতঃস্ফূর্ত যে-ক্রিয়া তাকে রুদ্ধ করে নয়, তার পরিণাম যে তাঁরই বৃহৎ জ্যোতির্ময় প্রশান্তির প্রসন্নতা—সেই বোধটি জাগ্রত করে। প্রাকৃত-জীবনের প্রতিটি ক্রিয়ার পরিণাম কিন্তু এই প্রশান্তিতে, সমস্ত প্রবৃত্তিরই পর্যবসান নিবৃত্তিতে। প্রবৃত্তিতে শক্তির একটা বিস্ফোরণ, নিবৃত্তিতে উপশম। আবার বিস্ফোরণ, আবার উপশম—এই ছন্দের দোলাই চলছে সারা জীবন ধরে। আমরা প্রবৃত্তিকেই চিনি, উপশমকে চিনি না।

তাকে চিনতে হবে। যে-উপশম পেয়ে, তার ভাবনাকে আনতে হবে গোড়ায়। উপশমের বুকেই প্রবৃত্তির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই উপশম বৃহৎ—আকাশের মত। তারই মত সর্ববোনি সর্বেশ্বর সর্বাবসান।

এই বৃহতের ভাবনা যতই চেতনায় প্রস্ফুট হবে, ততই তার শক্তিও সক্রিয় হয়ে উঠবে। অপরা-প্রকৃতির আবরণ বিদীর্ণ করে জাগবে পরা-প্রকৃতি—জাগবে এক আলোর শিশু। সাধনার ভার আর তখন সাধকের উপর নয়, পরমা-প্রকৃতির উপর। অমৃত-চেতনার এই নবজাতককে তখন লালন করবেন কুমারজননী স্বয়ং।

এমনি করে সাধনার ক্রমপরম্পরায় থাকবে তিনটি পর্ব। আদিপর্বে আত্মশক্তির সাধনা। তার প্রধান অবলম্বন হল বিবেক এবং বৈরাগ্য। দিব্য আর অদিব্যের মাঝে তফাত করতে শিখতে হবে এবং চিত্তের সমস্ত শক্তি দিয়ে অদিব্যকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এটা অগ্নিসমিন্ধনের পর্ব—চলে দীর্ঘদিন ধরে। প্রথমটায় আলোর চাইতে ধোঁয়াই হয় বেশী। তা হ'ক, তবুও হাল ছাড়তে নাই। নিজেকে উদ্যত রাখতে হবে, অতন্দ্র রাখতে হবে। শক্তির যোগান আসছে সেই মহাশক্তির কাছ থেকেই—এই বুদ্ধিতেই আত্মশক্তির প্রয়োগ করতে হবে। কাঠের মড়্ডায় একবার আগুন ঢুকলে আর ভাবনা নাই। তখন সে তার নিজের তেজে কাঠকে আগুন করে তোলে, তাকে আর ফুঁ দিয়ে জিইয়ে রাখতে হয় না। এইটা সাধনার দ্বিতীয় পর্ব। আর কাঠটা আগাগোড়া যখন আগুন হয়ে উঠল, তখন তৃতীয় পর্ব। তখন আর আয়াস নাই, রীতের বাঁধন নাই, বাউলের ভাষায় তখন 'জ্যান্ত সহজে'র অবস্থা।

এইগুলি হল যোগসাধনার ক্রম। ক্রম বুদ্ধির কল্পিত হক। আসল ব্যাপারটা বুঝতে প্রবর্তসাধককে তা সাহায্য করে মাত্র। কিন্তু যোগের ক্রিয়া যুগপৎও হতে পারে এবং হয়ও। বৃহতের যে-প্রজ্ঞা, যোগেশ্বরের যে-যোগবীর্য, তা-ই যোগের গতাকার দিশারী। তা প্রাকৃত ন্যায়ের (logic) শাসন মেনে চলে না। তাঁর স্বাতন্ত্র্যের প্রশাসনে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারি যখন, তখন জানি আর ভয় নাই ভাবনাও নাই।

[ক্রমশ]

ময়ূর-নৃত্য

নিশিকান্ত

"ময়ূর-নৃত্য" নৃত্যসঙ্গীতময় ক্ষুদ্র নাটিকা, তিনটি অঙ্কে সমাপ্ত। প্রতি অঙ্কের ভাবানুযায়ী মঞ্চ দিগন্তপর্দার পট, মঞ্চ-দৃশ্য ও ময়ূরনৃত্যশিল্পীর সাজ-সজ্জা পরিবর্তিত হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের পরে কিছুক্ষণের জন্য হবে যবনিকাপাত; ঐ সময়ের অবকাশে শোনা যাবে, ময়ূরনৃত্যশিল্পীর মৃদু-নূপুরনিক্কণ ও গীতবাদ্য। তৃতীয় অঙ্কের পরে হবে যবনিকা-পতন।

প্রথম অঙ্ক

নাচেরে ! ময়ূর নাচে, ময়ূর নাচে !
নাচে,
নাচে,
ময়ূর নাচে !
বিজয়ার বীর্যবিভায়
দীপ্তময়ূর নৃত্য বিলায়
আমার মাঝে।
নাচে সে মৃত্যুহরণ-বহ্নিচরণ মর্তে রাখি'
যুগান্তের ঐ সমর-সাঁঝে
ভীষণ মধুর ভঙ্গে নাচে
কালভুজঙ্গসূদন পাখি ;
মোর হৃদয়ের রক্তধারা
নর্তনে তার আত্মহারা।
শুনি তার কণ্ঠরবে, চিরন্তনীর
জয়ধ্বনির
শঙ্খ বাজে :
আমার জীবনশঙ্খে বাজে।
নাচেরে, ময়ূর নাচে, ময়ূর নাচে !
বিজয়ার বীর্যবিভায়
দীপ্তময়ূর নৃত্য বিলায়
আমার মাঝে ॥

(সাময়িক যবনিকা-পাত)

দ্বিতীয় অঙ্ক

ভুবনের তারি রূপের আলো
আমার ঘুম ভাঙালো,
নাচালো সে আমারে !
ভারতের দিবালিকায়
দিগম্বরীর দীপালিকায়
পাই যে তারে।
অসীমার সেই শিখী ঐ
জগৎ-নিশার নিদ্রা হানে,
মহানিশার লক্ষতারায় পেখম তোলে
আমার গানে !
গ্রীবায় সৌদামিনীর ফণী,
তন্দ্রাহারা দুই চোখে বৈদূর্যমণি ;
মুখে তার চন্দ্রকলা, চূড়ায় শিখা ; সুনীল প্রভায় বক্ষ সাজে :
আমার জীবনবক্ষে সাজে।
নাচেরে, ময়ূর নাচে, ময়ূর নাচে !
বিজয়ার বীর্যবিভায়
দীপ্তময়ূর নৃত্য বিলায়
আমার মাঝে ॥

(সাময়িক বা নিকা-পাঠ)

তৃতীয় অঙ্ক

মাটিতে মহাদেবীর উদয় ক্ষণে
মহাদেব ঐ অপরূপ ময়ূর হ'য়ে
নাচে আমার মানবতায়,
নাচে আমার তনুলতায়,
নাচে আমার প্রাণে-মনে।
নাচে ঐ থৈ-থৈ-থৈ ঝিয়া-ঝিয়া ঝমল-ঝমল!
যুগল-ডানার দোলায় নাচায়
প্রলয়রঞ্জ-সৃজনকমল ;
ঐ নাচনের ছন্দে মাতাল
মানবলোকের সঙ্গে নাচে স্বর্গ-পাতাল ;
নটরাজ- বিশ্বমঞ্চে নটেশ্বরীর নিখিল-নাটের রঙ্গ রাজে :
আমার জীব-রঙ্গে রাজে।
ময়ূর নাচে, ময়ূর নাচে!
পার্থিবতায়
দীপ্তময়ূর নৃত্য বিলায়
আমার মাঝে॥

(যবনিকা পতন)

পরমক্ষণ

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

বিপুল। পৃথ্বীর 'পরে চলমান নিরবধি কাল,
মোর. বাঁধিয়াছি তারে গণিতের গ্রন্থিল বন্ধনে—
দণ্ড পল মাস বর্ষ যুগ কল্প, কল্পিত কালে,—
অসীমে ধরিতে শূন্যে পাতিয়াছি জ্যোতিশ্চক্র-জাল।

অনাদি-আগতা মাতা আদিকৃতা প্রকৃতি পরমা,
তোমারে সীমিত করি ধরি মোরা ক্ষুদ্র চিত্ত'পরে,
ধরি পূর্ণচন্দ্রমার পল্লবিত নয়ন-পল্লবে,
ত্রিকালবর্ত্তিনী তুমি কালাতীতা, হে অনিতিতমা!

সত্য-ঋত-বৃহতের জন্মধাত্রী ধরণীর 'পরে,—
আনন্দ-চেতনা আজি জাগিয়াছে জড়ের হিয়ায়,
জাগে ভূমানন্দ আজি সারা বিশ্বে মর্ত্ত্য-বৃত্তিকায়,
অরুণ-আনন্দ জাগে আকাশের দিগন্ত-অধরে।

সে আনন্দে স্নান করি, পান করি সে আনন্দ-সুধা—
সার্থক জনম আজি, সার্থক এ আনন্দের ক্ষুধা।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮

জননী

শ্রীরবি গুপ্ত

কে তুমি এসেছ নামি' ধরিত্রীর আঁধার গুহায়,
যেথা নাহি ভায়
তব স্বর্গ-সাবিত্রীর ম্লানতম কোন প্রতিভাস,
নিয়তির পরিহাস
মানুষের ভাগ্য ল'য়ে খেলে যেথা ক্রূরতার খেলা,
ক্ষণিক মুহূর্তে করে চিরসাজ আনন্দের মেলা,
অনিশ্চিত যেথা কাল
মেলি' ধরে বিপদের নগ্নবাহু সঙ্কট করাল,
বিরুদ্ধ শক্তিরা যেথা মত্ত কোলাহলে
আশার অঙ্কুর দল যত মত্তপদভারে দলে?
এরি মাঝে বিরচিবে স্বপ্ন কোন
বিমোহন
হে জননী?
দিবস-রজনী
মরতের লাগি' তব তপস্যার পাবক ভাস্কর
লভে আজ অনন্ত উত্তর।

বিশ্বের সাধনা তুমি সাধিছ একাকী
ওঠে তাই জাগি
এ-মর্ত্য অন্তর,
হেরে তার মর্মে কোন অমরার আনত অম্বর।
প্রথম সৃষ্টির প্রভাত-উন্মেষ হতে
সাধিয়াছ যেই ব্রতে

যুগ হতে যুগে
আনন্দে কৌতুকে
কাল হতে কালে,
সাফল্যের আদিত্য-তিলক ভাল আজি তার ভালে।
সন্ধ্যা আজি খোলে দ্বার
সুষমার
বিস্তীর্ণ সীমানারাজি,
ওঠে বাজি
নূপুর-নিক্কণ নব হৃদয়-শ্রীতে
ধরনীতে।
নৈঃশব্দ্যের পরি' আভরণ
করে গুঞ্জরণ
আশার রাগিণী যত প্রশান্ত ছায়ার
মোহিনী মায়ার।
নিবিড় নিশীথনগ্ন ধরিত্রীর অশান্ত ক্রন্দন
বক্ষে তব তুলেছিল কোন আলোড়ন,
এসেছ কি তাই নামি?
এ-আঁধার-যামী
ছিন্ন করি' ফুটায়ে তুলিতে এক প্রভাতের ছবি—
যেথা রবি
দিনান্তের ক্লান্ত চিতা নাহি জ্বালি' যায় অস্তাচলে;
যেথা জ্বলে
হীরক মধ্যাহ্ন-নভে আদিত্যের বিজয়-গৌরবে।
আজি তাই তব হাতে বুঝি লভে
ম্রিয়মাণ ক্ষীণ শিখা বাটির প্রদীপগুলি
আপনার সুর ভুলি
হয় এক দীপ্ততর
শুভ্রতর।
আসিয়াছ ধূলির যা ধন দিতে ফিরায়ে ধূলিরে,
হৃদয় গভীরে

লভে তাই বসুন্ধরা পবিত্র ভাস্বর
পাবক-স্বাক্ষর :
অনন্যার
অধিকার।

ক্লান্তপদে দীর্ঘপথ বহি' চলে যাত্রীদল জীবনের ভার,
নিরন্ধ্র আঁধার মাঝে নাহি জানে লক্ষ্য আপনার।
সহসা উন্নত্তবায় শিখাটিরে দিয়েছে নিভায়ে,
পায়ে পায়ে
জড়ায়েছে কণ্টকের লতা,
অন্তহীন অন্ধকার নীরবতা
করিয়াছে গ্রাস,
উঠেছে মুখরি শুধু ব্যর্থতার বিজয়-উল্লাস।
কোথা পথ কোথা লক্ষ্য ভ্রান্তিহীন কোথা চিরদিশা!
কোথায় তৃষ্ণার বারি পথিকের মিটাইতে তৃষা?
শ্রাবণ-দুর্যোগ রাতে
শূন্যহাতে
যে পথিক চলেছিল আপনার অভিযানে
রজনীর মন্থর নক্ষত্র-আহ্বানে,
সহসা দাঁড়ায় আসি'
আলোকে উদ্ভাসি'
প্রভাতের দ্বারে,
করে স্পর্শ জীবনের মধুময় অনাহত তারে
যেথা রাজে কালহীন সুচির উদয়
অসীম বিস্ময়।
লভিয়া মাটির ঢেলা
ভাঙা আর গড়া খেলা—
লীলাময়ী, কি রহস্য চাও তুমি তুলিতে ফুটায়ে
তিলিয়া টুটায়ে?

সহসা বিলসি' ওঠে জড়তার গভীর গহনে
সে কোন শিল্পীর রূপস্বপ্ন সুর-সন্দীপনে,
অমরার বর্ষবাণী অকস্মাৎ ধরে,
মুদ্রিত সুবর্ণ-রেখা আঁধার-অন্তরে,
নিঠুর অঘ্রাণ যবে কাড়ি' লয় সম্পদ পৃথ্বীর,
বন্ধ করে বিহঙ্গের কল-গান, শূন্য করে নীড়—
আবার ভরিয়া তোলো সযতনে বসন্তের ডালি
দাও আনি'
সুন্দরের শিখা যত লতায় পাতায়
সুস্নিগ্ধ আভায়
মমতের গুঞ্জরণে
কুসুমে কোরকে সবুজের আস্তরণে।
নিদিশা নিশীথে তুমি ধ্রুবতারাসন রহি স্থির
অনধীর
ক্লান্তিহীন তন্দ্রাহীন চলেছ দেখায়ে পথ
পার হয়ে দুর্গম কান্তার মরুসীমা সমুদ্র পর্বত,
লয়ে চলো সহস্রের ধরি' হাত
রবির কিরণে রাঙি' রহে যেথা সুচির প্রভাত।
মাটিরে করিতে দান
স্বর্গের সম্মান
কখন খেলার ছলে অন্যমনে করেছ স্বপন
সাবিত্রী-স্বপন,
সহসা রাঙিয়া ওঠে
প্রভাতের রক্ত-রাগে কোটে
বুঝি ধরে
ধরণীর খেলাঘরে
অমরা-বাঞ্ছিত আলো, লভে আজি রূপ
অপূর্ব অদ্ভুত।
তোমার প্রয়াস
অমৃত চেতনা চাহে করিতে বিকাশ,

সহসা দাঁড়াও আসি শঙ্কাহীন সম্মুখ-সমরে
দৃঢ়পদভরে
দ্বিধাহীন বজ্রদীপ্ত বজ্রা তব ওঠে জ্বলি',
হেলায় সহস্র বাধা চরণে দলিলি'
নির্মম নির্ভয়
করাল সংগ্রামে লহ মুহূর্তে বিজয়।
সৃষ্টিরে চলেছ লয়ে এক লক্ষ্যপানে
অভিনব অভিযানে।
সুতীব্র দুর্বার গতি
নিখিল-নিয়তি
কর আজি নিয়ন্ত্রণ ইঙ্গিতে তোমার,
ধূলির আঁধার গৃহে জ্বালো তব বহ্নি অনিবার।

সীমাহীন স্নেহ আর ধৈর্য আর করুণার
মমতায়
তুলিছ গড়িয়া তুমি
স্বপন-নন্দন ভূমি;
অমরার মর্মবাণী
ধরার ধূলায় আনি'
দিয়েছ বিছায়ে
পুঞ্জীভূত এ-ধরার অন্তহীন অন্ধকার ছায়ে;
ব্যর্থ করি দুর্যোগের ঘনঘটা
তুলেছ ফুটায়ে ইন্দ্রধনুচ্ছটা;
নিরাশ্বাস
যবে মেলিয়াছে দুনিবার গ্রাস
আশার কৃপাণ তব তীক্ষ্ণধার
করেছে ক্ষণেকে তারে ছিন্নভিন্ন বার বার।
তোমারে পরশি
পথের কণ্টক যত পুষ্পে পুষ্পে উঠেছে বিকশি

যেথা তুমি ফেলিছ চরণ,
উঠেছে জাগিয়া সুরে লভিয়াছে নব আভরণ,
মরুভূ-অন্তর
পরিয়াছে শ্যাম-সাজ লভি' ধারা তরঙ্গ-মুখর,।
অজ্ঞান অন্ধন অন্ধ মানবের মন,
এরি মাঝে কোন্ সূর্যবীজ তুমি করেছ বপন—
মুক্ত করি' মোহপাশ
বাঁধে চির আলিঙ্গনে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মহানীলাকাশ,
দুঃখের জমাট অশ্রুস্থলে আজি নির্মল মুক্তায়,
উষার আরক্তপট রজনীর বেদনা রাঙায়,
প্রাতের প্রশুভ হাসি
সে-কোন্ তপন স্বর্ণ তুলিছে উদ্ভাসি।
সপ্তাশ্ব অরুণ-রথ
মর্ত্যের তিমিরতলে রচে নব পথ—
স্বর্ণময় দিগন্তের বিমুক্ত দুয়ার,
লভে তার
জ্যোতির্ময় বাণী ;
আজি তাই নিখিলের রাণী
নিভৃত হৃদয় তারে মানবের কণ্ঠে আলাপিল
বিচিত্র রাগিণী এক—তোলে গড়ি অমর্ত্য ভুবন
এ ধরায় ;
লঙ্ঘি' যায়
সুদূরার স্বপ্নময় অনাহত অনিন্দ্য ঝংকার
অনাগত কাল-পারাবার।

দেব-প্রয়াস

শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

*

নিশ্চেতনার নৈশ-পাথারে জাগে এ কী আলোড়ন ?
তমসার মাঝে তাপসী মর্ত্য-হিয়া
যুগান্তকাল আলোক-ধ্যানের আনন্দ-শিখা বহি',
জলধি-গর্ভে আকৃতি সঞ্চারিয়া,

শর্বরী-বুকের প্রার্থনা ঘালি'.—গতিবন্যার দ্বারা,—
উন্মুখ-চিতে নবারুণ-অভিসারে
ধায় যে সহসা কুহেলি-বধূ প্রাচী-দিগন্ত পানে,
আহ্বান এক শুনি' সংবিৎ-দ্বারে :

"সূর্য-বীজের আরাধনা আজ প্রস্ফুট অম্বুরে,
উর্বি-জ্যোনাকী তারি আগমনে হাসে,
উঠ অহল্যা, জাগো সৃষ্টির চির-ঈপ্সিত ক্ষণে
বিবর্তনের পরিণতি-উল্লাসে !

"অপূর্ব এক সৌরঘনির প্রখর দীপ্তি মাঝে,
মানসোজের দারুণ শক্তিধারা
নামে তারি সাথে, নামে মাধুর্য, নামে প্রেম-ভাগীরথী
বিদারি' অতল জড়তা-জঠর-কারা,—

"নিখিল-জীবন-আকাঙ্ক্ষা আজ ঋষি-দৃষ্টির রবে
জগন্মাতার পরম-প্রসাদ মতি'
অভিমানসের দুর্লভ গতি-ছন্দে উৎসারিত,—
মানবতা হয় দূর অবক্ষয় ছবি।

"গ্লানি-বিমুক্ত উদয়-তরণী নেহার' স্বর্ণরাগে
মহিমান্বিত মহাবিভাব তরে,—
বিশ্ব-হৃদয় অভীপ্সা-তরু পুষ্পিত নব-ধ্যানে,—
পারিজাত-জাত আশীষ-করুণা ঝরে।

"তমস্বিনীর তুষার-গহনে,—মৃত্যুর গহ্বরে
উৎশিখ এক চেতনা-শুভ্র শশী,—
চির-জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ লগ্নে প্রণব-ধ্বনি
নিস্যন্দিত ধরিত্রী উচ্ছ্বসি'।...

"মহাকাল আজ অবনত মহা-কল্পিকর পদতলে,—
লক্ষ্যবিহীন বিশ্বের অনুভূতি
প্রণাম-ছন্দে লুণ্ঠিত ঘোর স্বর্ণ-অঙ্ক 'পরে,
নমিয়া অন্তে ত্রিদশ-নয়ন-দ্যুতি।

"যুগের আর্ত-ক্রন্দনরাশি ঘোর স্বর্লোক ভেদি'
কল্পে কল্পে যাচি' ঘোর বরাভয়
ভুলেছে মানবে নব-প্রগতির দিব্য-শৃঙ্গ 'পরে
অবতার-স্থানে গেয়েছে আবার জয়!

"রূপান্তরের মন্ত্র এনেছি মৃন্ময়তার লাগি'...
উঠ হে তাপসী, চিন্ময়-রূপে তব সন্তানদলে
নহ অভিষেকি'—সত্য-রাজ্যে অখণ্ড অধিকার
লভুক সকলে, অমরা-জীবন প্রকাশি' মর্ত্য-তলে।"...

রক্ষা-কবচ

(গান)

অরুণা দেবী

এ কোন্ লগন আজি !
শৃঙ্খল কেন মঞ্জীর হ'য়ে
উঠিলরে পায়ে বাজি !
বাধা বন্ধন আজিকে আমার
নিঝর ধারার সাধন সাধার
ছুটে যেতে চায় সাগরের পানে
উল্লাসে নাচি নাচি।
পাষাণের বুকে পাষাণ ভাঙার
দেখে সঙ্কেত রাজি ।

(আজ) কেন নাহি লাগে ডর
ঘন ঘোর মেঘ নভে দেখে হিয়া
কাঁপে না তো থর থর।
গুরু গরজন ছেপে ওঠে ওই
অন্তর মাঝে মাতৈ মাতৈ
এ যে রে আমার মায়ের কণ্ঠ
বলে : "রাঙা হ'লো প্রাচী
নির্ভয়ে তুই ফিরে দাঁড়া আজ
আমি তোরে ঘিরে আছি" ।

(তবু) নয়নে ঝরিছে জল
মনে হয় আমি কার সাথে করি
দিবা নিশি এত ছল।
যে দুখানি বাহু সদা আছে ঘিরে
তারেই আঘাত করি ফিরে ফিরে
তারি আসা পথে বিছায়ে রাখি যে
কণ্টক বাছি বাছি
ছিঁড়ে ফেলি কত নিশি জেগে গাঁথা
প্রয়াসের মালাগাছি।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৮

পৃথিবীর উপরে মানুষের মধ্যে ভগবৎ প্রসাদের যে মুক্তিপ্রদ ক্রিয়া তার আছে দুটি দিক—একটি আর একটিকে পূর্ণ করে চলে। দুটি দিক সমানে অপরিহার্য্য, কিন্তু সমানে সমাদৃত নয়।

অবিসম্বাদী অক্ষয় শান্তি—যা দুশ্চিন্তা থেকে, আত্মপীড়া থেকে, দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি দেয়।

সক্রিয় সর্ব্বশক্তিমান ক্রমগতি—যা শৃঙ্খল থেকে, বন্ধন থেকে, জড়ত্ব থেকে মুক্তি দেয়।

শান্তি সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমাদৃত ও স্বীকৃত পরমার্থ হিসাবে, কিন্তু ক্রমগতি কেবল তাদেরই কাছে স্বাগত যাদের আস্পৃহা তীব্র, সাহসে পূর্ণ।

শ্রীমা

১৯২০—১৯৫৮

মায়ের প্রার্থনা

ডিসেম্বর ২১, ১৯১৬

ভগবান, তোমাকে সবচেয়ে ভাল জানে যারা তাদের একজনের মুখ দিয়ে তুমি আমার সঙ্গে কথা বললে, নিশ্চয় যাতে আমি তোমার শিক্ষা আরো ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি —(সাক্ষাৎভাবে তবে কি তোমার নির্দেশ শুনতে আমি অক্ষম ছিলাম ?)—তবুও কিন্তু এখনো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি ভাবে চলতে হবে আমাকে। তুমি ত জান কি পরমানন্দেরই না ভাগী হব আমি, তোমার প্রসাদে যদি আমি সর্বাঙ্গীণ ভাবে দিব্যপ্রেমের কুণ্ডরূপে পরিণত হয়ে উঠি – এই যে প্রেম হল তোমার সনাতন সত্তার আদি ও উত্তর অভিব্যক্তি, যে প্রেম এ জগতে যুগপৎ তোমার সত্যের আর যে ঋজুতম পথ পথভ্রষ্ট মানুষী চেতনাকে নিয়ে চলে সে-দিকে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ। একদিন যখন আমি ছিলাম আশাহত, আকাঙ্ক্ষায়, আকিঞ্চনে ভরপুর, কতবার না তখন তোমার কাছে করুণা ভিক্ষা করেছি যাতে আমার বর্ত্তমান কর্ম্মাদর্শের অনুকূল এই অবস্থা লাভ হয়। আর তখনকার সে-সময়েই আমার মনে হয়েছিল যে একদিন যখন আমার অহংমুখী সব পছন্দ অপছন্দ হতে মুক্তি হবে, তখন তুমি এই পার্থিব ব্যক্তিসত্তাটিকে পৃথিবীর উপর তোমার দিব্য প্রেমের প্রকাশের যন্ত্ররূপে বরণ করবে। কিন্তু এখন যে তুমি আমায় আদেশ করছ, আমি অনুভব করছি আমার চিরদিনকার অক্ষমতা। এতদিন ধরে আমার বিশ্বাস ছিল আমি জানি প্রেম কি। কিন্তু এখন আমি দেখছি প্রেম নাম দেওয়া যায় না এমন কোন বস্তু কোথাও নাই, সুতরাং বিশেষভাবে প্রেম নাম দেওয়া যায় এমন কিছুও নাই। তা হলে এই যে জিনিসটির সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করতে পারি না, পৃথক করে ধরতে পারি না, তাই হয়ে উঠি কি রকমে ? তবুও কালই ত তুমি আমায় দেখিয়ে দিলে একটা অন্ধকার আবরণের মধ্যে আমি বন্ধ করে রেখেছি তোমার অতি মূল্যবান অতি শক্তিমান এক অবদান।...

ভগবান, আমার সমগ্র সত্তা তোমার কণ্ঠবাণী অনুসরণ করতে, তোমার বিধানের বাধ্য হয়ে চলতে উন্মুখ—কিন্তু তার স্থূল চেতনায় এখনো জ্ঞান নাই, সে বুঝতে পারে না তুমি কি চাও তার কাছে। সে স্পষ্ট অনুভব করে যে বর্ত্তমানে তার প্রেম একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থা আর তুমি চাও তাকে সক্রিয় করে ধরতে—কিন্তু একটির থেকে অন্যটির মধ্যে কি রকমে পার হওয়া যায় তা তার বুদ্ধির অগম্য। সে জানে এই সক্রিয় প্রেমের অবস্থা হবে নিত্যাকার এবং নির্ব্যক্তিক অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে ব্যবস্থা-নিরপেক্ষ, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। কারণ, কোন ব্যবস্থা বা ব্যক্তি বিশেষের উপর তার একান্ত অভিনিবেশ থাকবে না। এ দিক দিয়ে সে হবে বর্ত্তমানে যে নিষ্ক্রিয় প্রেমের অবস্থা তারই অনুরূপ—বিশুদ্ধ, অব্যয়, অপৌরুষেয়। কিন্তু যে-জিনিস এখনো তার বোধগম্য হয় নি, তা হল—আধারের অঙ্গীভূত এই যে গুণ,

বিশুদ্ধি অব্যাহত আর নির্ব্যক্তিকতা তা আটুট রেখেও কি করনে আমার কর্ম্মে ব্যাপৃত সে হতে পারে।

এই জন্যই ত আজ বৈকালে দেবতা মিত্রের কাছে আমি প্রার্থনা করেছি। কারণ মিত্রই ধ্রুবর্ত্ত প্রেমের সত্তা, তাঁর কাছে আমি যাচঞা করেছি, আমায় সাহায্য করতে, আমার অজ্ঞান-অন্ধকার আলোকিত করতে, আমার সংশয় ভঞ্জন করতে, আমার সন্দেহ নিরসন করতে, শেষ বাধা সব দূর করে দিতে, এই স্থূল যন্ত্রটি অধিকার করে বসতে যাতে সে হয়ে উঠতে পারে তুমি তার থেকে যা চাও সেই জিনিস।

কিন্তু আমার বাক্য শঙ্কাকুল, আমার কণ্ঠ অকুশল—জানি না মিত্র-দেব আমার প্রার্থনা শুনবেন কি না।

ডিসেম্বর ২৪, ১৯১৬

ভগবান, তুমি আমার জাগ্রত মনকে জানতে দাও নাই কি ঘটতে চলেছে এবং কেমন ভাবে তা ঘটবে ; তবুও আজ সন্ধ্যায় তুমি আমার অনুভবে পূর্ব্বাভাস দিয়েছ কি তুমি চাও আমার কাছ থেকে, শুধু এক পূর্ব্বানুভব—কারণ এ হল প্রথম পদক্ষেপ মাত্র, দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপ আমার সম্মুখে অর্দ্ধোন্মুক্ত যে যবনিকা পথখানি তার উপর। এ যেন জোয়ারের জল, নদী ক্রমে স্ফীত হয়ে উঠেছে, যতক্ষণ না দুই কূল ছাপিয়ে তার কল্যাণকর প্লাবনে সব ডুবিয়ে দিতে পারে। তেমনি করে এবার আমার হৃদয় স্ফীত হয়ে উঠেছে, তুমি তার মধ্যে ঢেলে দিয়েছ যত প্রেমের শক্তি তারই চাপে। সমগ্র সত্তা ভালবাসতে সুরু করেছে, নিরন্তর আরো আরো ভালবাসতে, বিশেষ লক্ষ্য বিনা, কিছুকেই-না আমার সব-কিছুকে এক সঙ্গে, যা সে জানে তাকে আর যা সে জানে না তাকেও, যা সে দেখে আর যা কখনো দেখেনি তাকেও ; ক্রমে ক্রমে এই সুপ্ত প্রেম হয়ে উঠল ব্যক্ত প্রেম, প্রত্যেকের উপর সকলের উপর ছড়িয়ে পড়তে উৎসুক, কল্যাণকর তরঙ্গের মত, সক্রিয় সূর্য্যরশ্মির মত।...এ হল আরম্ভ...অতি ক্ষীণ আরম্ভ। কিন্তু ভগবান, আমি জানলাম এই জিনিসই তুমি চাও। তোমার ইচ্ছাশক্তি চিরদিনই হল সেই অখণ্ড করুণা শক্তি যে তার দিব্যানন্দের নব্যে সত্তাকে ডুবিয়ে দিয়েছে, সকল অকিঞ্চিৎকর নৈমিত্তিকতা পার করে দিয়ে নিয়ে চলেছে তোমার স্বর্লোকের মহাজ্যোতির মধ্যে।

তুমি যা চাও তা হওয়া অর্থ দিব্যরূপ লাভ করা।

ডিসেম্বর ২৫, ১৯১৬

(কাল সন্ধ্যার নীরবতার মধ্যে যা শুনেছি ও লিখে রেখেছি)

"সব তুমি ত্যাগ করেছ, জ্ঞান পর্য্যন্ত, চেতনা পর্য্যন্ত, তাই তোমার হৃদয়কে তুমি তৈরী

করে তুলতে পেরেছ যে ভূমিকায় তোমাকে নামতে হবে তার জন্যে—সে ভূমিকায়, দেখতে মনে হয়, লাভের অঙ্ক শূন্য—প্রস্রবণ-উৎসের মত সে কেবল ঢেলেই চলেছে তার সমস্ত ধারা সকলের জন্য, কিন্তু তার দিকে কোন ধারাই উঠে চলে না ; তার অফুরন্ত সামর্থ্য সে গভীর অতল থেকে টেনে তোলে, বাহিরে থেকে কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তুমি ত এরই মধ্যে অনুভব করতে শুরু করেছ এই যে প্রেমের অফুরন্ত প্রসার তাতে রয়েছে কি পরমানন্দ। কারণ প্রেম ত স্থাপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, পরস্পরের বিনিময় প্রয়োজন তার নাই ; আর ব্যক্তিগত প্রেম সম্বন্ধে যদি এ কথা সত্য, তবে দিব্য প্রেম সম্বন্ধে, যে প্রেম অনন্তকে এমন মহৎ ভাবে প্রতিফলিত করে তার সম্বন্ধে তা কত বেশি সত্য।

"ওঠ তুমি এই প্রেম হয়ে, সকল বস্তুর মধ্যে, সর্ব্বত্র, নিরন্তর বৃহত্তর হয়ে, নিরন্তর তীব্রতর হয়ে—সমস্ত জগৎ হয়ে উঠবে তোমার সৃষ্টি, তোমার সম্পত্তি, তোমার কর্ম্মের ক্ষেত্র, তোমার বিজয়-গৌরব। শেষ সীমানা সব ভেঙ্গে দেবার জন্যে নিরন্তর চল যুদ্ধ করে ; তোমার সত্তার সম্প্রসারণের ফলে সে সব সামান্য বিন্দু মাত্র হয়ে পড়েছে। অন্তিম আঁধার জয় কর এবার, জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তির আলোকে আলোকিত হয়ে উঠছে তা। যুদ্ধ করে চল জয়ের জন্য, পূর্ণ জয়ের জন্য, যুদ্ধ করে চল যা-কিছু ছিল এত দিন তা অতিক্রম করে উঠে চলবার জন্য, নবজ্যোতি উন্মুক্ত করে ধরবার জন্য, জগতের কাম্য সেই প্রমূর্ত্ত আবির্ভাবের জন্য। ভিতরের বাহিরের সকল বাধার বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করে চল। তোমার সিদ্ধির পুরস্কার হবে অমূল্য রত্ন এক।"

ডিসেম্বর ২৬, ১৯১৬

নীরবতার মধ্যে যে-কথা আমায় শুনাও ভগবান, সর্ব্বদাই তা নতুন, ভরপুর। কিন্তু আমি ত দেখতে পাই না, এই যে যন্ত্রটির উপর এত করুণা তুমি বর্ষণ কর, তার যোগ্য সে কি রকমে, কি রকমেই বা তুমি যা আশা কর তার কাছে, তা পূর্ণ করবার ক্ষমতা তার হবে। এ দারুণ গুরুভার ভূমিকা বহন করবার সামর্থ্য রাখতে হলে তার যা হওয়া দরকার সে-তুলনায় সবই ত তার মধ্যে দেখা যায় এত ক্ষুদ্র, এত দুর্ব্বল, এত অতি-সাধারণ—না আছে বল, না আছে বীর্য্য, না আছে প্রসার। কিন্তু আমি জানি মন যা ভাবে তার মূল্য খুবই সামান্য, নিজেই সে এ-কথা জানে, তাই সে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করছে তোমার আদেশের ক্রম প্রকাশ।

তুমি আমাকে বলছ সদা-সর্ব্বদা যুদ্ধ করে চলতে—আমি চাই আমার যেন থাকে সেই অদম্য উৎসাহ যার কল্যাণে সকল বাধা বিপত্তি পার হওয়া যায়। কিন্তু আমার হৃদয়ের মধ্যে তুমি ভরে দিয়েছ এমন প্রসন্ন প্রশান্তি যে আশঙ্কা হয় যুদ্ধ করা যেন আমার পক্ষে সম্ভবই হবে না...সব জিনিস, বৃত্তি হোক আর কর্ম্ম হোক, আমার মধ্যে ফুটে ওঠে, ফুল

যেমন ফুটে ওঠে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, বিনা আয়াসে ; শুধু আছে, বেড়ে উঠছে তারই আনন্দে, তোমাকে প্রকাশ করে ধরবার আনন্দে, প্রকাশের ধারা যাই হোক না। আর এই যুদ্ধ যদিই বা থাকে, তবে তা এত সহজ এত সরল যে তাকে ও-নাম দেওয়াই যায় না। কিন্তু এতখানি প্রেম ধারণ করবার পক্ষে কি ক্ষুদ্রই না এ হৃদয়। আর তাকে পরিবেষণ করে ধরবার পক্ষে এই প্রাণ এই দেহ কি না দুর্বল। তুমি আমাকে সেই অপরূপ পথখানির পাশে এনে দাঁড় করিয়েছ, আমার পায়ের সামর্থ্য হবে কি, তাতে উঠে চলবার ?...তোমার উত্তর হল, আমাকে উড়ে চলতে হবে, পায়ে হেঁটে চলবার চেষ্টা করলে ভুল হবে...ভগবান, অসীম তোমার করুণা !...আর এক বার তোমার সর্ব্বশক্তিমান বাহুর মধ্যে তুমি আমাকে তুলে নিলে, তোমার অতল হৃদয়ের মধ্যে ধরে আমায় আদর করলে—সে হৃদয় আমায় বললে : "কোন চিন্তা করো না, শিশুর মত নির্ভর করে থাক—তুমি কি আমিই নও, আমার কাজের জন্য আমার সংহতরূপ, আমার ঘনীভূত আকার ?"

ডিসেম্বর ২৭, ১৯১৬

হে পরম-প্রিয় ভগবান আমার, এ হৃদয় তোমার কাছে অবনত, এই বাহুদুটি তোমার দিকে প্রসারিত, তোমাকে মিনতি করে, তোমার দিব্যস্পর্শে এই সত্তাকে সমগ্রভাবে প্রজ্বলিত করে তোল, যাতে জগতের উপর তার আলো ছড়িয়ে পড়ে। আমার বুকের মধ্যে আমার হৃদয়খানি পূর্ণ উন্মুক্ত, উন্মুক্ত তোমার দিকে, ফিরে রয়েছে তোমার দিকে ; সে উন্মুক্ত ও শূন্য যাতে তুমি তা ভরে দিতে পার তোমার দিব্য-প্রেম দিয়ে—সে শূন্য, সেখানে কিছুই নাই, তুমি ছাড়া, তোমার অস্তিত্ব দিয়ে তাকে ভরে রেখেছ, তবুও সে শূন্য ; কারণ তা ধারণ করতে পারে ব্যক্ত সৃষ্টির অনন্ত বৈচিত্র্য, যা-কিছু সবই।

ভগবান, এই বাহু দুটি তোমার দিকে প্রসারিত হয়ে তোমাকে মিনতি করছে, এ হৃদয় তোমার দিকে পূর্ণরূপে নিজেকে খুলে ধরেছে যাতে সে হয়ে উঠতে পারে তোমার অসীম প্রেমের ভাণ্ডার।

"সকল জিনিসের মধ্যে সকল জীবের মধ্যে আমাকে ভালবাস"—এই তোমার উত্তর। তোমার চরণে আলুণ্ঠিত হয়ে তোমাকে মিনতি করি আমাকে তুমি দাও সে-শক্তি...

ডিসেম্বর ২৯, ১৯১৬

মধুময় ভগবান আমার, আমাকে শিক্ষা দাও যাতে তোমার প্রেমের যন্ত্র আমি হয়ে উঠতে পারি।

সাধু ও শিল্পী*

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শিল্পী ইন্দ্রিয়ের খেলা যে দৃষ্টিতে দেখেন, তাহা একদিকে যেমন বিষয়বস্তুর দৃষ্টি নহে, অন্যদিকে তেমনি সাধুরও দৃষ্টি নহে, তাহা হইতেছে ঋষিদৃষ্টি—'আর্টের আধ্যাত্মিকতা' প্রবন্ধটির ইহাই মূল কথা। শিল্পী স্থূলকে শুধু স্থূলভাবেই দেখেন না, তিনি অন্বেষণ করেন স্থূলের মধ্য দিয়া সূক্ষ্মের রহস্যবিকাশ, আত্মার আপনারই বিভূতির খেলা। অতএব একান্ত ইন্দ্রিয়পর যিনি তাঁহার মধ্যে শিল্পীর বোধ নাই। রাধাকমলবাবুও এই কথাটিই মুখ্যতঃ তাঁহার প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা হইতেছে শিল্পীর দৃষ্টি সাধুর দৃষ্টি নহে, কারণ শিল্পী ইন্দ্রিয়ের সব খেলাতেই ভালমন্দ পাপপুণ্য ক্ষুদ্রমহৎ সমানভাবে সকলের মধ্যে নিগূঢ় ভাগবতরসেরই বিচিত্র সঞ্চার দেখিতে পান, সাধু কিন্তু ইন্দ্রিয় খেলার বিশেষ প্রকরণের মধ্যে—পুণ্যের মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে, ইন্দ্রিয়ের অতীত হইবার প্রয়াসের মধ্যে শুধু ভগবানকে দেখেন। রাধাকমলবাবু এইখানে আপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন সাধু ও শিল্পীর মধ্যে এইরূপ কোন প্রভেদ নাই। চৈতন্যদেবও যীশুখৃষ্টের উদাহরণ দেখাইয়া তিনি বলিতেছেন, প্রকৃত সাধু যিনি, পাপের প্রতি তাঁহার কোন ঘৃণা নাই, পাপের মধ্যেও তিনি ভগবানকে দেখেন। কিন্তু প্রশ্ন এই—সাধু পাপের মধ্যে দেখেন কোন্ ভগবান, কি ভাবে? পাপের মধ্যে সাধু দেখেন 'পুণ্যাত্মক' ভগবান, 'পাপাত্মক' ভগবানকেও তিনি দেখেন কি? সাধুর পাপের প্রতি ঘৃণা, ঘৃণা বলিতে যে বিশেষ প্রকার চিত্ত-বিক্ষোভ বুঝি তাহা না থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু পাপকে তিনি একটা নিকৃষ্টতর জিনিস বলিয়াই বোধ করেন, উহা হইতে দূরেই থাকিতে চাহেন। তাঁর লক্ষ্য, রাধাকমলবাবু যেমন বলিয়াছেন, পাপীকে 'উদ্ধার' করা। পাপীকে সাধু আলিঙ্গন করিতে পারেন কিন্তু পাপকে কখন তিনি আলিঙ্গন করিবেন না। পাপীর পাপের অন্তরালে একটা পুণ্যবান শুদ্ধিমান কিছুর সহিতই তাঁহার একাত্মতা, পাপের সহিত নহে। পাপীর মধ্যে সাধু ভগবানকে দেখেন তাহার পাপ সত্ত্বেও, কিন্তু পাপের জন্যই কি তিনি সেখানে ভগবানকে দেখেন? চৈতন্যদেব পাপীকে যখন বলিতেছেন, "তা'ই ব'লে কি প্রেম দিব না" তাঁহার মুখ হইতে অলক্ষিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে 'তা'ই বলে', অর্থাৎ পাপ তাঁহার প্রেমের প্রতিবন্ধক, পাপকে ভালবাসা যায় না। যীশুখৃষ্ট পাপিনীকে বলিতেছেন, go and sin no more—যীশুখৃষ্টের সমস্ত দীক্ষাই ত এই পাপকে হেয় বলিয়া পরিবর্জন করা। শিল্পীর বোধ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য প্রকার।

* সমালোচনার প্রত্যুত্তর (পূর্বতন লেখা হইতে)

তিনি পাপীর মধ্যে ভাগবত সৌন্দর্য্য দেখেন তাহার পাপের জন্যই। পাপের বিশেষত্বের মধ্যে কি অপার রস খেলিতেছে তাহাই তাঁহার লক্ষ্য। পাপীর পাপের অতীত প্রদেশে শুদ্ধাত্মা, মঙ্গলময় কিছু সদাসর্ব্বদা আছে কিনা তাহা দেখান শিল্পীর কার্য্য নহে। বস্তুতঃ সাধু যে ভগবান দেখেন সে ভগবান অবিকল্প সমরসাত্মক, সর্ব্বত্র যিনি বিকারশূন্য হইয়া বাহ্য বিক্ষোভের অন্তরালে অবস্থিত। সাধুর উপলব্ধিতে এই ভগবান মঙ্গলময়, মহত্বপূর্ণ, অপাপবিদ্ধ। শিল্পী কিন্তু ভগবানকে দেখেন ভগবানের বিচিত্রতা, তাঁহার অনন্তরসের দিক হইতে—বাহ্যবিক্ষোভের মধ্যে তিনি কি হইয়াছেন। পুণ্যবানের মধ্যে তাঁহার পুণ্যমূর্ত্তি, পাপীর মধ্যে কিন্তু পাপমূর্ত্তি তবুও উভয়ক্ষেত্রে উহা ভগবৎ-মূর্ত্তিই। পিশাচের মধ্যে দেবভাবের অস্তিত্ব, বারনারী মধ্যে মাতা ভগবতীর অস্তিত্ব দেখাই সাধুর সব। শিল্পী কিন্তু পিশাচের মধ্যে পিশাচ ভগবান, বারনারী মধ্যে দেখেন ভোগবতী যে ভবগতী।

পাপ পাপ বলিয়াই সুন্দর, পুণ্য পুণ্য বলিয়াই সুন্দর। যাহাকে বল উৎকৃষ্ট, যাহাকে বল অপকৃষ্ট, সকলেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য লইয়াই পরমরসপূর্ণ। যাহা আছে, তাহা যেমন যে ভাবে আছে, তাহা ঠিক সেই ভাবে আছে বলিয়াই সুন্দর। এই সৌন্দর্য্য চোখের দেখা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সৌন্দর্য্য নহে কিন্তু ঋষির সমাধিদৃষ্ট ভগবৎ সৌন্দর্য্য। তাই শিল্পীর কাছে এ প্রশ্ন উঠে না, পাপ চাই না, চাই পুণ্য, অমঙ্গল চাই না, চাই মঙ্গল, ইন্দ্রিয়ের এইরূপ খেলা চাই না, চাই অন্যরূপ। সাধুর সাধুতা কিন্তু এইখানেই—বস্তু যেমন ভাবে আছে তাহাকে ঠিক ঠিক তিনি মনে করেন না, তাহাতে অভাব অসামঞ্জস্য নিরর্থকতা কত পরিলক্ষিত করেন। তিনি এক আদর্শ পাইয়াছেন, ভগবানকে একভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, জগৎকে সেই অনুপাতে যতক্ষণ তিনি গড়িতে পারিতেছেন না, ততক্ষণ তাঁহার যেন স্বস্তি নাই। শিল্পী কিন্তু দেখেন জগৎ যেমন ভাবে আছে, তেমন ভাবেই পরম সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত। সাধু উচ্চ নীচের একটা কল্পনা করেন, নীচকে উচ্চে লইয়া তবে তাহার সার্থকতা দেখেন। শিল্পীর নিকট উচ্চ-নীচে সমান সৌন্দর্য্য, সমান সার্থকতা।

কিন্তু অন্তরে শিল্পীর এই অখণ্ড অনন্তরসবোধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও বাস্তব জীবনকে যে একটা বিশেষ রসাধার করিয়া গড়িয়া তোলা যায় না তাহা নহে। বাস্তব জীবনের একটি প্রেরণাই হইতেছে এইরূপ একটা বিশেষ আদর্শের প্রতি। কিন্তু আর্টের তাহা বিষয় নহে। বাস্তব জীবনের প্রেরণা দ্বারা যখন আর্টকে নিয়ন্ত্রিত করিতে যাই, তখন আর্টের যে নিজস্ব অন্তরঙ্গ কথা—অনন্তরসবোধ তাহা হারাইয়া ফেলি। তখন হই কেবল সাধু। ইহার অনন্ত উদাহরণ টলষ্টয়। Anna Karenina-র টলষ্টয় হইতেছেন শিল্পী —তিনি যে সত্য প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন তাহা চিরকালের জিনিস; কিন্তু Five Commandaments-এর টলষ্টয়, যে টলষ্টয় সেক্সপীয়ারে কোন নীতিশিক্ষা না পাইয়া বলিয়াছেন, সেক্সপীয়ারের কিছু মূল্য নাই, সে টলষ্টয় সাধুমাত্র। তিনি যে আদর্শের মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা যতই মহান হউক না কেন, চিরকালের বস্তু নহে।

বাস্তব জীবনকে একটা আদর্শে রচিত করিতে হইবে হউক, কিন্তু ঋষি দৃষ্টির যে সর্ব্বত্র সমন্বয়-বোধ, যে অনন্তরস ভোগ, তাহার স্বাতন্ত্র্যকে বিলুপ্ত করিয়া নয়—বরং তাহাকেই প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া।

রাধাকমলবাবু আর্টকে রসসৃষ্টি না বলিয়া যে বলিতে চাহিতেছেন আত্মস্ফূর্তি জীবন-সৃষ্টি তাহার মূলে রহিয়াছে আর্ট ও জীবনের মধ্যে—বাস্তব জীবনের যে ঊর্দ্ধমুখী গতি ও আর্টের যে সর্ব্বত্র স্থির সমরসভোগ এই উভয়ের মধ্যে একটা অসামঞ্জস্যের বোধ। তিনি বলিতেছেন জীবনটাই সমগ্র, রসবোধ ইহার অঙ্গমাত্র। অঙ্গের উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমনে রাখিতে হইবে, উহাকে নিয়মিত করিতে হইবে সমাজের ধর্ম্ম দিয়া। কিন্তু জিজ্ঞাস্য—আত্মা কি, জীবন কি? উহাদের ধর্ম্মই বা কি? আমাকে জীবনকে রাধাকমলবাবু যত সহজ করিয়া দেখিয়াছেন, উহা তত সহজ নহে। আত্মার জীবনের কত রকম বিকাশ, প্রত্যেক বিকাশের আপন আপন ধর্ম্ম আছে। দর্শন বিজ্ঞান রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি ব্যবসা-বাণিজ্য এ-সকলই আত্মার স্ফূর্ত্তি জীবনের সৃষ্টি। ইহাদের প্রত্যেকেরই আপন আপন প্রকৃতি রহিয়াছে। সাধুতার ধর্ম্মশীলতার প্রকৃতিও বিভিন্ন প্রকারের। আর্টেরও প্রকৃতি আবার অন্যরূপ। আত্মাকে জীবনকে অন্যান্য যে দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, রসের দিক দিয়া সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া যে দেখা তাহা লইয়াই আর্ট।

রসবোধ জীবনের অংশমাত্র হইতে পারে কিন্তু জীবনকে রাধাকমলবাবু যে ভাবে দেখিয়াছেন, সুনীতির দিক দিয়া—পারতপক্ষে ঊর্দ্ধমুখী গতির দিক দিয়া—তাহাও কি জীবনের অংশমাত্র নহে? পাপপুণ্য নীতিবোধই জীবনের সব বা প্রধান কথা নহে, ঊর্দ্ধ-মুখী গতি ছাড়া জীবনস্রোতে কত তির্য্যক্‌গতি কত অর্দ্ধাঙ্কগতি রহিয়াছে। বস্তুতঃ জীবন অর্থই বিরুদ্ধগতি সমূহের সংঘর্ষ, মানুষমাত্রই একটা অসামঞ্জস্যের পিণ্ড। সামঞ্জস্য যদি চাহি তবে জীবনের কোন বিশেষ খণ্ড প্রকরণে বদ্ধ হইয়া নহে—এমন একটি জিনিস চাই যাহা কোন অংশকে খর্ব্ব করিয়া ধরিবে না, কিন্তু সকলের স্বাতন্ত্র্য, সকলের বিশেষত্ব, সকলের মধ্যে যে সত্য আত্মা তাহাকে অবাধে পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে দিবে।

আমি বলি, আর্টই এমন একটা জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। আর্টের যে রসবোধ তাহা জীবনের অংশমাত্র নহে, প্রকৃতপক্ষে উহাই জীবনের মর্ম্মকথা। জীবন, যাহা লইয়া জীবন, তাহার নামই ত রস। এই রসের উৎসস্থান, আর্টের যে ঋষিদৃষ্টি, রাধাকমল বাবু যেমন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহার নাম তুরীয় লোক, সেইখানে যে সামঞ্জস্য একমাত্র তাহাই প্রকৃত সামঞ্জস্য।

নারায়ণ—আশ্বিন, ১৩২৩

মিরাবো

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

১

একটি গোটা মানুষ জগতে বড়ই দুর্লভ জিনিষ। মানুষ সচরাচর যেন কেমন রহিয়া সহিয়া আপনাকে ধরা দিতেছে; আভাষে ইঙ্গিতে একটু আধটু প্রকাশ করিয়া বেশীর ভাগই একটা আবরণের ছায়ায় সযত্নে লুকাইয়া রাখিতে তাহার চেষ্টা। নিজের সবগুখানি ছাড়িয়া দিয়া, অন্তরাত্মার উচ্ছ্বসিত আবেগে সমস্ত জীবনটি ভরপুর করিয়া দেওয়া, মনের প্রাণের কর্ম্মের পরিপূর্ণ প্রেরণাভরে ছুটিয়া চলার মধ্যে সভ্য মানুষ বোধ করে কেমন অশোভনতা, কেমন বর্ব্বরোচিত উচ্ছৃঙ্খলতা। দোষেগুণে মানুষ। দোষের হাত এড়াইতে সে পারে না, তাহার প্রয়াস দোষকে ঢাকিয়া রাখিতে, গুণকেও কিছু অধিকমাত্রায় বরণ করিবার তাহার সামর্থ্য নাই—সে চায় সবই পরিমিত পরিমাণে। অল্পবিস্তর দোষ সব মানুষেরই যাহা আছে, সব মানুষই যাহা সহিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু গুণ আর সকলের যাহা বিস্ময়, উৎকণ্ঠা বা ভীতি জন্মায় না—এইরূপে আপনাকে আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া অন্তরাত্মার উপর একটা মুখোস চাপাইয়া দিয়া মানুষ চলাফেরা করে। শুধু পরের দিকে তাকাইয়া যে মানুষ নিজেকে সঙ্কুচিত খর্ব্ব করিয়া আনে তাহা নয়। নিজের দিকে নিজে পূর্ণ আলোকে ঋজুদৃষ্টিতে দেখিতেও সে কেমন অস্বস্তি বোধ করে—পাছে অসম্ভব অতিকায় কিছু সেখানে ধরা পড়ে, পাছে কোন অতল গহ্বর তাহার অন্তরে মুখব্যাদান করিয়া উঠে। চোখের ঠারে মনকে ভুলাইয়া যতটুকু প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না, ততটুকু কোন প্রকারে সাজাইয়া গুছাইয়া শ্লীলতায় শোভনতায় ভরিয়া দিয়া তবে সে জগতের সম্মুখে বাহির হয়।

মিরাবো কিন্তু সেই বীরপুরুষ যিনি আপন চোখের উপর হইতে পরদাখানি, অন্তরাত্মার সম্মুখ হইতে যবনিকাটি একেবারে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, ভিতরের যাহা কিছু সব ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন পূর্ণ দিবালোকে, কোন কিছু গোপন রাখিতে, কোন কিছু সম্পুটিত করিয়া, ঘোলায়েম করিয়া ভদ্রজনোচিত করিয়া ধরিতে তাঁহার আদৌ চেষ্টা নাই; নিজে যাহা তাহা দেখাইতে তিনি এতটুকু লজ্জাবোধ করিতেন না। দোষ হউক গুণ হউক উভয়কেই আত্মারই ঐশ্বর্য্যরূপে তিনি প্রকট করিয়া ধরিয়াছেন। সেই জন্য দোষও যেমন তাঁহার মধ্যে বিপুল বিরাট হইয়া দেখা দিয়াছে, গুণও তেমনি ফুটিয়া উঠিয়াছে দীপ্ত প্রতিভার বিচিত্র ছটায়। তাঁহার মধ্যে কুণ্ঠা বলিয়া জিনিষটি নাই, তাই সেখানে ক্ষুদ্রতা অল্পতা কার্পণ্য বলিয়া কিছুই নাই—সবই ঐরাবতের প্রায়। অন্য সকলের জীবনে যাহা তুচ্ছ ঘটনামাত্র মিরাবো তাহাকে করিয়া তুলিবেন পূর্ণ পঞ্চাঙ্ক ট্রাজেডি, তাহার জীবনের একটা

নৈমিত্তিক ব্যাপারকেও তিনি বাজাইয়া তুলিবেন মহাকাব্যের ঝঙ্কারোলে। বিরাবো হইতে যাহা কিছু উদ্ভূত তাহা যে শুধু আকারেই বিরাট এমন নয়, এক অমানুষী তেজে ও বীর্যে আবার তাহা ভরাট। তাই আমাদের বোধ হয় সকল দোষ সত্ত্বেও যেন এক অন্তর্স্থিত অগ্নির প্রভাবে তিনি কেমন শুদ্ধ ও মহান—যাবতীয় মলিনতা ভিতরের সারবস্তুটির কোন অপচয় ঘটাইতে পারে নাই।

বিরাবোর আকৃতিও ছিল বিরাবোর অন্তরেরই জাগ্রত প্রতিমূর্তি। ঝাঁটোরক্ষ বৃষস্কন্ধ, স্থূল ওষ্ঠ, আয়ত মুখমণ্ডল আর সে মুখের উপর দারুণ বসন্তরোগ তুলিয়া দিয়াছে গুটিপারাজি—কিন্তু সবই যেখানে যেন প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য, স্ফুট করিয়া বৃহৎ করিয়া স্থূলে নিঃশেষ চালিয়া দিবার জন্য, ধরিবার জন্য, গ্রাস করিবার জন্য। বিরাবোর দোষের অন্ত ছিল না, তাঁহার মত কুশ্রী পুরুষও কেহ ছিল না। জন্মকালে তাঁহার সে মূর্তি দেখিয়া তাঁহার পিতা আপন ভ্রাতাকে লিখেন, "তোমার ভাইপোটি যে হইয়াছে, ঠিক শয়তানের ভাইপোটির মতনই সে দেখিতে কুৎসিত।" বিরাবো কিন্তু কি নিজের দোষ কি নিজের চেহারা দেখিয়া কোনদিন ক্ষুণ্ণ বা অপ্রতিভ হন নাই। উভয়েরই মধ্যে বরং তিনি দেখিতেন নিজের বিশেষত্ব, উভয়ই ছিল তাঁহার গর্ব্ব। তাঁহার চেহারার যথাযথ আলেখ্য তিনি নিজেই দিয়েছেন আর তাহাই চরম বর্ণনা—বাঘের যদি বসন্ত হয় তবে তাহার মুখখানি যেমন। বাস্তবিক, আকৃতিতে যেমন প্রকৃতিতেও তেমনি বিরাবো ছিলেন শার্দ্দূল। শার্দ্দূলেরই মতন তেজস্বী, মর্মঘাতী, তাহারই মতন চতুর, তাহারই মতন এক সম্মোহনী শক্তিতে ভরপুর। ভোগ, ইন্দ্রিয়সেবা, অনিতাচার ছিল তাঁর চিরসঙ্গী। উপদ্রব উচ্ছৃঙ্খলতায় সব বিধ্বস্ত করিতে তিনি এতটুকু দ্বিধাপাত করিতেন না। শঠতা চাতুরীও তাঁহার অনভ্যস্ত ছিল না। এ সকলের মধ্যে তিনি পাইতেন অপরিসীম আনন্দ। কিন্তু বনের পশু সে দুর্দ্ধর্ষবেগে, ঘোর হুঙ্কারে, নিপুণ বিক্রমে সমাজবক্ষের উপর দিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে—স্বভাবকে সে খর্ব্ব করিতে চাহিবে কেন, আর চাহিলে পারিবেই বা কেন? সে আস্বাদন করিতেছে প্রাণের অবাধ অখণ্ডিত পরিস্ফুরণে যে তৃপ্তি যে আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে স্তরে স্তরে সে অনুভব করিতেছে যে বিদ্যুল্লাস, যে বীর্যের স্পন্দন তাহার খেলা ও প্রতি কর্ম্মে প্রতি ভঙ্গিমায় ফুটিয়া উঠিবে। বিরাবো ছিলেন প্রকৃতির সন্তান। আভিজাত্যের সকল ব্যর্থ প্রসাধনা পারিপার্শ্বের অন্তরালে তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে অক্ষুণ্ণ অব্যাহত ছিল প্রাচীন পিতৃপুরুষ সেই 'ফিউডল লর্ড' দিগের যোদ্ধুসুলভ উদ্দামতা, প্রাণশক্তির উচ্ছ্বসিত পরিপূর্ণতা, প্রাকৃত জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে একটা সহজ তেজঃ-পূর্ণ আর্জব, কেমন একটা পাশবিক রুক্ষতা। কথিত আছে জন্মকালেই নাকি বিরাবোর দুইটি দন্ত উদ্গত হইয়াছিল। সে দন্তেই বিরাবো সমস্ত জীবন চারিদিক দংশন করিতে করিতে চলিয়াছেন। একবার প্যারীনগরীর একখানি সংবাদপত্র তাঁহাকে 'পাগলাকুকুর' এই আখ্যা দেয়। তাহাতে তিনি উত্তর দেন, "ঠিক কথা, প্রভুত্বের স্বেচ্ছাচারের অন্যায়ের মৃত্যু আবার কামড়ে।"

কিন্তু নিরাবোর শরীরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্যণীয় জিনিষটি ছিল তাঁহার সে বিপরিনাণ মস্তক। পশুসুলভ যে প্রাকৃত বীর্য্য, তাহার পরিণতিও ঐ মস্তকে। এক নৈসর্গিক মেধায় মনীষায় তাহা ভরপুর। জগতের জ্ঞানের সম্ভার সেখানে যেন পরতে পরতে জমিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার ধীশক্তি যে বিষয়ের উপরে প্রতিফলিত হইবার অবসর পাইয়াছে তাহাকেই অবলীলাক্রমে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। তাঁহার চিন্তালেখা সকল জিনিষের উপর সমান-ভাবে খেলিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে মন্ত্রণা চাও সে ত তাঁহার নখাগ্রে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যচালনা সম্বন্ধে, এমন কি কৃষিকার্য্য সম্বন্ধেও তাঁহার পরামর্শ একেবারে তুচ্ছ করিবার নহে। অন্ততঃ নিরাবো সে সম্বন্ধে যে একেবারে অজ্ঞ একথা কেহ বলিতে পারিবে না। প্রাণশক্তির ন্যায় তাঁহার মনন শক্তিরও আছে কেমন সহজ সামর্থ্য। স্পঞ্জের মত চারিদিক হইতে সকল বিদ্যা সে শোষণ করিয়া লইতেছে। নিজের অন্তর হইতে তিনি যে বেশী কিছু উদ্ভাবনা করিয়াছেন তাহা নয়, উপকরণ সব সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতে, সৃষ্টি করিতে তাঁহার অবসর নাই। অন্যে যাহা ভাবিয়াছে, লিখিয়াছে, যোগাড় করিয়া দিয়াছে সে সবই তিনি আপনার করিয়া লইয়াছেন, অপরের হইতে হুবহু চুরি করিতেও তাঁহার আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? নিরাবোর চক্ষু বা কর্ণের সহিত যে বস্তুর কোথাও এতটুকু স্পর্শ হইয়াছে, তাহাই একেবারে মস্তিষ্কের ভিতরে প্রবেশলাভ করিয়াছে, সেখান হইতে এক নূতন জীবন, নূতন শক্তি, নূতন অভিব্যঞ্জনা লইয়া তাঁহার বাকো ধরা দিয়াছে। আমরা যাহাকে মার্জিত বুদ্ধি বলি, নিরোবার বোধহয় তাহা ছিল না। নিরোবার চিন্তা ঠিক তর্কলব্ধ চিন্তা নয়, এমন কি বিচার করিয়া ধাপে ধাপে সিদ্ধান্ত হইতে সিদ্ধান্তেও চলা নয়—তাহা যেন একটা চিৎশক্তির ভাণ্ডার হইতে বিচ্ছুরিত অগ্নিকণা, তাহার মধ্যে রহিয়াছে প্রকৃতিরই কোন গুপ্ত মনীষার তীব্র ওজঃশক্তি, অকাট্য শৃঙ্খলা। নিজের জীবনের অন্তরঙ্গ উপলব্ধির দ্যোতনা লইয়া তাঁহার চিন্তা প্রভু সুস্পষ্ট অনন্ত। সমস্ত জীবন তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন দ্বন্দ্ব বৈপরীত্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে, উহারই প্রতিকৃতি স্বরূপ মনেও তাঁহার চিন্তা তেমনি জ্বলিয়া উঠিয়াছে সংঘর্ষে সংঘর্ষে।

নিরাবো নিজের বহ্নিকের মূল্য জানিতেন। যদি না জানিতেন তবে তিনি নিরাবো হইতেন না। এক সময়ে তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলা হয় "লাফাইএতের (Lafayette) যে সৈন্য আছে," অমনি তিনি প্রত্যুত্তর দিলেন, "কিন্তু আমার আছে এই বাথা।" নিরাবো আপনাকে সম্পূর্ণরূপেই চিনিতেন। শুধু তাহাই নয়, একটু অতিরিক্ত মাত্রাতেই চিনিতেন। চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তিনি কেবল দেখিতেন অল্পপ্রাণ পতঙ্গমাত্র। বাস্তিল কারাদুর্গ যাহারা দখল করে সে জনসঙ্ঘ তাঁহার কাছে হাস্যকর জীব (Les plus grandes drôles de paris) আর মন্ত্রীবর্গ, রাজপরিষদ তাঁহার কাছে সব নপুংসক (imbeciles), সমস্ত জগৎকে তিনি যেন তর্জনিসঙ্কেতে অবলীলাক্রমে চালাইতে পারেন। নিজের শক্তির প্রতিভার উপর তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা। স্ফীতবক্ষে, স্থিরমস্তকে

ক্ষুদ্রমানবগকলকে কর্ত্তব্যপথে চালাইয়া লওয়া নিরাবোরই কার্য্য, এক নিরাবোরই পক্ষে উহা সম্ভব। দাম্ভিক, সন্দেহ নাই। বাগাড়ম্বর অনেকখানি তাহাও স্বীকার করিব। কিন্তু অভী, দৃঢ়চিত্ত, নেতা হইবার যোগ্য—তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। নিরাবো নিরাবো ব্যতীত আর কিছু চাহেন না, নিরাবোর প্রতিভার চমক তিনি দেখাইতে চান। দেখাইতে চান বলিলে বোধ হয় ভুল হইল। কারণ চাহিবার প্রয়োজন নাই, প্রতিভা যে তাহার ভিতরে ভরাট, ফাটিয়া বাহির হইবেই—ইহা সত্তার প্রকাশের ধর্ম্ম। কিন্তু এই সত্য বস্তুটির সহিত যদি কিছু আড়ম্বর কিছু ঠাট আসিয়া পড়ে তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি? প্রকৃতপক্ষে নিরাবোর এই যে আন্তরিকতা, এই যে আপনাকে দিয়া পৃথিবী ভরিয়া ফেলা, এই যে গলাবাজী—এ সব নিরাবোর আভরণ মাত্র, এ সকলের দাস নিরাবো নহেন। প্রতিভার মধ্যে আমরা যে পাই একটা প্রশান্তমতি, একটা স্থিতপ্রজ্ঞা নিরাবোর তাহা যথেষ্ট ছিল। শত চাঞ্চল্য উন্মত্ততার মধ্যেও তিনি আপনহারা হইয়া পড়েন নাই। একটা নিগূঢ় ঈশ্বরত্বের প্রভাবে লোককে অবস্থাকে যেমন ধরিয়া রাখিতে, পরিচালনা করিতে পারিতেন, নিজেকেও ঠিক তেমনি নিয়ন্ত্রিত করিতে জানিতেন। অদম্য প্রেরণার বেগে তিনি ছুটিয়া চলিতেন বটে, প্রবৃত্তির রাশ তিনি কখন পিছনে টানিয়া ধরেন নাই, তবুও সে রাশ তাঁহার মুঠির ভিতরেই ছিল—উত্তেজনার বিপুল কলোর্ম্মী সে সুদৃঢ় আধারের মধ্যেই বিধৃত ছিল, উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে নাই। সকল মহাপুরুষই গঠিত প্রকৃতির এক অন্তরঙ্গ মৌলিক শক্তিতে (elemental)। নিরাবোর মধ্যেও এইরূপ বিশ্বশক্তির একটা মূল আদিম প্রেরণাই অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার ভোগলালসা, প্রবৃত্তির আবেগের মধ্যে রহিয়াছে যেন প্রকৃতিরই আপন প্রাণশক্তির তেজ ও সামর্থ্য। আর তাঁহার প্রাণে শুধু নহে, মনে ও চিন্তা শক্তিরও মধ্যে খেলিয়াছে প্রাকৃতিক শক্তিসুলভ সে মৌলিক আবেগ। জিনিষের যাহা মূর্ত্তিকে ভেদ করিয়া তাহা সরল ঋজুভাবে একেবারে অন্তরের সার সত্তাটি যাইয়া ধরিয়াছে। নিরাবোর প্রতিভা বস্তুতন্ত্র—প্রাকৃতিক শক্তির মতনই স্পষ্ট স্ফুট বিগ্রহান্বিত স্থূলপ্রতিষ্ঠ, একটা জাগ্রত সত্যের দৃঢ়তায় ভরাট। তাঁহার প্রেমের লীলায় কবিজনসুলভ ভাবনেশা স্বপ্নাবেশ কিছু ছিল না, হৃদয়ে হৃদয়ের স্পর্শ তাঁহাকে কোন কল্পলোকে উধাও করিয়া দেয় নাই—তাঁহার চিন্তার খেলার মধ্যেও নাই অশরীরী কল্পনা, অর্থহীন বাক্‌জাল, অবান্তর প্রলাপ। তাঁহার কুটিল ভ্রূভঙ্গী, তাঁহার বিদ্রূপবাণী যেন তড়িতের কশাঘাতে মিথ্যার দ্বিধার সংশয়ের আবরণ সব দীর্ণ করিয়া দিয়াছে, অবাধে ব্যক্ত করিয়া ধরিয়াছে গুপ্ত সত্য। ঘটনার অবস্থার মর্ম্ম একটি বাক্যে ধরিয়া দিয়াছেন, একটি রেখায় আঁকিয়া দিয়াছেন মানুষের অন্তরাত্মার অনন্ত আলেখ্য।

প্রবর্ত্তক—বৈশাখ, ১৩৩০

মিরাবো যখন কেশর দুলাইয়া একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, জগৎ তখন স্তম্ভিত আতঙ্কিত থরথর কম্পমান—ইহা মিরাবোর নিজের কথা। কিন্তু এই বিরাট মনীষা, বিপুল তেজ, নয়নে অগ্নিশিখা, কণ্ঠে ঘোর গর্জন—তাহা যে খেলিবে সে ক্ষেত্র কোথায়? এই উল্কাপিণ্ড, এই ধূমকেতু, এই ভূমিকম্প কাহাকে ধ্বংস করিবে—তাহার তৃপ্তি ত অল্পে হইবার নয়? চল্লিশ বৎসর ধরিয়া সে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, প্রতিনিয়ত আপনাকে পরাক্ষা করিয়াছে, শত বিপর্য্যয়, আবেগ উচ্ছৃঙ্খলতা কলহ কোলাহল বিপদ আপদের মধ্যেই সে লালিত পালিত পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এখন সে চায় তাহার পূর্ণ বিক্রমের খেলা দেখাইতে—কোথায় সেই রঙ্গভূমি? কিন্তু প্রকৃতিদেবী তাঁহার এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই অদ্ভুত যন্ত্রটি পিটিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন, উহার কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। সময়ও আসিয়াছে। মানবসমাজের জগতের সে এক সঙ্কুল মুহূর্ত্ত। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি, আভিজাত্য ও সাধারণ্যের মধ্যে যে সংঘর্ষ শতাব্দী হইতে গুমরিয়া উঠিতেছিল আজ তাহা ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম। সমাজের যাহারা শীর্ষদেশে, যাহারা কুলীন কেবল তাহারাই একচ্ছত্র প্রভুত্ব করিতে থাকিবে? না, গণশক্তি, সমাজের নিম্নতর স্তরে যাহারা তাহারাও আপন স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্যে প্রবুদ্ধ হইয়া মাথা তুলিবে? অল্পের সমৃদ্ধি বাহাল্যের কাছে বহু কি চিরকাল আপনাকে বলি দিয়া চলিবে? না, ছোট হউক বড় হউক, ধনী হউক দরিদ্র হউক প্রত্যেক মানুষই আপন মর্য্যাদায় অক্ষত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবে? এমন বিপুল সংঘর্ষ অনুভব করিয়াই বুঝি মিরাবোর প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার সমস্ত জীবনের অস্থিরতা ইহাকেই বোধ হয় খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু কোন্‌পক্ষ পাইবে মিরাবোর সেবা, কে মিরাবোকে তাহার নেতা তাহার যোদ্ধারূপে বরণ করিয়া লইবে?

মিরাবোর নিজের জন্ম অভিজাত কুলে। তিনি ছিলেন পরম মর্য্যাদাভিমানী আভিজাত্যের গুমরে ভরপুর। এই বংশমর্য্যাদা মিরাবোদিগের এক মহা গৌরবের জিনিষ ছিল, তাঁহারা গর্ব্ব করিয়া বলিতেন তাঁহাদের রক্তে কোন খাদ মিশে নাই, এক মেদিসি বংশে (Medici) ছাড়া আর কাহারও সহিত তাঁহারা অনুলোম বিবাহ করেন নাই। মনে রাখা উচিত, এই মেদিসিরাই ফ্লোরেন্স রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছে, এই মেদিসিরাই ফরাসীকে দিয়াছে এক রাজবংশ। মিরাবো তাঁহার পিতৃপুরুষ হইতে এই আভিজাত্যের অভিমান পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছিলেন আভিজাত্যের আসন টলমল, তাহাতে ঘুণ ধরিয়াছে, রাজশক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে তাহার বাহাল্য। ইহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে নবজাগ্রত প্রাণশক্তি, সর্ব্বসাধারণ্যের স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃবোধ। মিরাবোর প্রাণ ছিল কৌলীন্য প্রপূরিত কিন্তু নিজেরই জীবনে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন সে কৌলীন্যপ্রথার কি বিষময় ফল, কি অত্যাচারে অবিচারে আভিজাত্য দেশকে দশকে জর্জ্জরিত

করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার মনোগত অভিলাষ ছিল রাজা রাজপরিষদ অভিজাত সম্প্রদায়কে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবেন, উপর হইতে দেশকে ক্রমে সংস্কারের পথে চালাইয়া লইবেন। তিনিই হইবেন প্রধান মন্ত্রী, তাঁহারই বুদ্ধির প্রভাবে শক্তির সহায়ে অর্ধহীন অনুষ্ঠান নিপীড়িত গৃহকলহে বিচ্ছিন্ন ফরাসী দেশ নবজীবন পাইবে, রাজশক্তিকে কেন্দ্র করিয়া সুসংহত ও মহীয়ান হইয়া উঠিবে। শতাব্দী পূর্বে রিশলিউ (Richelieu) যে কার্য্য করিয়াছিলেন, মিরাবো আবার তাহা পূর্ণতর ভাবে নির্দোষ করিয়াই সুসম্পন্ন করিবেন। মিরাবোর শক্তি মিরাবোর প্রতিভা এইরূপে চরিতার্থ হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হইল না। আভিজাত্য তাঁহাকে স্বীকার করিল না—মিরাবো হইয়া পড়িলেন গণশক্তির মুখপাত্র। যে নবশক্তি যে বিপ্লববন্যা সাধারণ্যের অন্তঃকরণ হইতে নির্গত হইয়া, উপরে যাহা কিছু আছে—রাজা, রাজপরিষদ, আভিজাত্য—সকলকে ভাসাইয়া লইতে ছুটিয়াছে তাহাই লইল মিরাবোকে বরণ করিয়া। বস্তুতঃ পুরাতনকে ধরিয়া রাখিতেছিল যাহা আছে যাহা যতই জীর্ণ হউক না কেন তাহাকেই লইয়া আঁকড়াইয়া থাকিতে মিরাবোর উল্লাস হইবে কেন? তাহার মধ্যে যে প্রচণ্ড রুদ্রশক্তি সে ত বিশেষভাবে ধ্বংসের জন্য। যাহার প্রাণ আপনাকে প্রকাশ করিয়া, চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া যাহা জীবন্ত বীর্যবন্ত—মিরাবো যে তাহারই জাগ্রত বিগ্রহ। আভিজাত্য-অভিমানী, প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী মিরাবোর প্রতিভা খেলিল সাধারণ্যের স্বাধীনতার পক্ষ লইয়া, তাহা জ্বলিয়া উঠিল আভিজাত্যকে, প্রভুত্বকে ধ্বংস করিবার জন্য।

নব জীবনের বিপুল বিপ্লব যখন সজাগ হইয়া কেবল নাথা তুলিতেছে, চক্ষু মেলিয়া আপন শক্তির পরিধিটি দেখিয়া লইতেছে, লক্ষ্যটি চিনিতে পারিয়া সেই দিকে অব্যর্থ অখণ্ডিত-ভাবে আপন শক্তিরাজি প্রয়োগ করিতে চলিয়াছে তখনকার সেই সজ্ঞানে আপন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইবার যে প্রথম প্রয়াস তাহাই হইতেছে মিরাবো। এতদিন যে শক্তি ধীরে ধীরে গোপনে গুমরিয়া উঠিতেছিল, এখানে ওখানে বিদ্যুৎচমকের ন্যায় দেখা দিতেছিল আজ তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে, দুর্বার বেগে চারিদিক চঞ্চল মুখর কল্লোলিত করিয়া তুলিয়াছে। এতদিন সে প্রকৃতির কোলে অন্ধভাবে আপনহারা হইয়া ফিরিতেছিল আজ সে মানুষের চেতনায় প্রবুদ্ধ হইয়া পথ ধরিয়াছে। মিরাবোর এই প্রথম জাগরণ, মুখ ফুটিয়া এই সুস্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণা, বারুদের স্তূপে অগ্নিশলাকার প্রথম স্পর্শ। মিরাবোর মধ্যে ফরাসী বিপ্লব—অথবা আরও বৃহত্তরভাবে দেখিতে গেলে সমস্ত আধুনিক জগৎ—তাহার যোগ্য প্রতিনিধিই পাইয়াছে। প্রথম অগ্রণীর সে নির্ভর নির্ভীকতা, একটা দারুণ দুঃসাহস, সে জলন্ত উৎসাহ, সে অটুট ধৈর্য্য, সে অক্লান্ত অধ্যবসায় আর সর্বোপরি সে তীক্ষ্ণ মনীষা তেজঃপূর্ণ চিন্তাশক্তি, কর্ম্ম-কৌশল—এ সকলের জন্যই মিরাবো বিপ্লবের প্রারম্ভে উহার আদর্শ নেতা ও পরিচালক হইয়া উঠিয়াছিলেন।

প্রথম অজানার আলোড়নের মধ্যে যখন পর্য্যন্তও তাহা একটা বিশেষ রূপ বিশেষ ধারা

লইয়া স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে নাই তখনকার সেই তরল আকৃতিহীন বিপুল সত্তার মধ্যে মিরাবো আসিয়া পড়িলেন যেন একটি রাসায়নিক পদার্থ। তাহার সংস্পর্শে সকল ফেনায়িত হইয়া উঠিল, অশরীরী অস্ফুটভাব সমস্ত ভনিয়া উঠিতে লাগিল, পাইতে লাগিল একটা প্রকট নিদিষ্ট অঙ্গসম্বলিত বিগ্রহ। মিরাবো যেন ঘোড়শ লুই প্রেরিত প্রতিনিধিদিগকে হাঁক ছাড়িয়া কহিলেন, "যাও, তোমাদের মনিবকে যাইয়া বল, আমরা এখানে আছি জনসাধারণের ইচ্ছায়, সঙ্গীণ না চালাইলে এখান হইতে আমরা উঠিয়া যাইব না।"* সেদিন ফরাসী বিপ্লবের—শুধু ফরাসীর কেন বিশ্ব-বিপ্লবের বুকে যে একখানি গুরুভার পাথর চাপা ছিল তাহা এক মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল, ইহার পর হইতেই সে স্রোত চলিল অবাধে অনিতবিক্রমে, তাহার তরঙ্গাঘাত আজ পর্য্যন্ত জগতের গায়ে আসিয়া লাগিতেছে। জনসাধারণের—ক্ষুদ্রের, দরিদ্রের, পতিতের—যে বিরাট শক্তি আপনাকে এতদিন ঠিক ঠিক চিনিতে পারে নাই, নিজেকে দুর্ব্বল অক্ষমই বলিয়া জানিয়াছে, সমষ্টির যে মহিমা ব্যষ্টির মহিমার কাছে কেবল মস্তক অবনত করিয়া আসিয়াছে, মিরাবো তাহার চক্ষু খুলিয়া দিলেন। সে যে এখন কি করিবে, কোথায় চলিবে তাহার সীমা আর নির্দ্দেশ করিয়া দিবে কে?

প্রকৃতপক্ষে মিরাবোর কার্য্য ছিল একটা সন্ধি-মুহূর্ত্তে, তাঁহার স্থান মধ্যস্থ হিসাবে। প্রাচীনের মধ্যে নূতন যখন কেবল উছলিয়া আসিয়া পড়িতেছে, আভিজাত্যের প্রভুত্বের অন্তরে কেবল ভাঙ্গন ধরিয়াছে কিন্তু ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, আপন শক্তি আপন অধিকারকে আঁটি রাখিবার জন্য যখন সে চেষ্টা করিতে বিরত হইতেছে না, গণতন্ত্র কেবল শক্তির বিস্ময়ের আস্বাদন মাত্র পাইয়াছে কিন্তু স্থির-প্রতিষ্ঠ হয় নাই, সেই সময়ের যে একটা বিশ্রভাব তাহাই মিরাবোর মধ্যে প্রতিফলিত। গুণী, শিষ্ট শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত বলিয়া যাঁহারা সমাজ হইতে দূরে থাকিতে চাহেন অথচ পূর্ণমাত্রায় পাইতে চাহেন সমাজের দাসসুলভ পূজা তাঁহাদের দর্প আত্মম্ভরিতা মর্য্যাদাজ্ঞান কর্তৃত্বাভিলাষ, একটা অতিমাত্র বিশেষত্ব ও পার্থক্যবোধ—মিরাবো এ সমস্তই পাইয়াছিলেন। আবার এই সকলের সহায়েই তিনি সর্ব্বসাধারণের মুখপাত্র হইয়াছেন, বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন সে প্রভুত্ব সে একচ্ছত্র কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। আভিজাত্যের অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মিরাবো ধ্বংস করিয়াছেন আভিজাত্যকে। এই ধ্বংস পর্য্যন্তই মিরাবোর কার্য্য, কিন্তু তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রাণের আনন্দ ছিল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট করিয়া, কিন্তু তাহার বর্ত্তিকের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল গড়িয়া

* Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baionnettes.—এই বিখ্যাত কথাটি মিরাবো সত্য সত্যই বলিয়াছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। কিন্তু মিরাবো ঠিক ঠিক ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া থাকুন বা নাই থাকুন তাহাতে বিশেষ আসে যায় না। ফরাসী যে এতদিন ধরিয়া মুখে এই বাক্যটি দিয়াছে—ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে তিনি কি ভাবের অভিব্যক্তি ছিলেন, সে যুগের মহানাট্যে তিনি কোন ভূমিকা লইয়াছিলেন আর সেকেই বা তাঁহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে।

তুলিবার একটা প্রেরণা। এই মনের চিন্তা আর পূর্বগত এক সংস্কার শুধু বিদ্রোহের মধ্যে তাঁহাকে সন্তুষ্ট হইতে দেয় নাই, তাঁহাকে লইয়া চলিয়াছে আবার সংরক্ষণের দিকে। তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন সাধারণ্যের সহিত আভিজাত্যের, প্রজাশক্তির সহিত রাজশক্তির মিলন করিয়া দিবেন। তাঁহারই মধ্যস্থতায়, তাঁহার অপূর্ব প্রতিভায় এই বিরোধী শক্তিদ্বয় আপন আপন মর্য্যাদায় অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাঁহারই নেতৃত্বে ফরাসী জাতি এক মহা সম্মেলনে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। ইহাই ছিল তাঁহার আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন।

কিন্তু মানুষীবুদ্ধি মানুষীশক্তি যতই বলীয়ান হউক না কেন, প্রকৃতির প্রেরণাকে কে নিয়মিত করিবে? শতাব্দী শতাব্দী ধরিয়া যে শক্তিকে সঙ্কুচিত সম্পুটিত করিয়া রাখা হইয়াছে আজ সে মুক্তি পাইয়াছে—এত সহজেই তাহার বুভুক্ষিত বাসনা তৃপ্ত হইবে, তাহার উদ্বেলিত আবেগ স্তিমিত হইয়া যাইবে? মিরাবো তাঁহার অন্তিমকালে স্পষ্টই দেখিতেছিলেন যে এই নবজাগ্রত শক্তি ক্রমে তাঁহার হাত এড়াইয়া চলিয়াছে, তিনি আর উহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। যে বিপ্লবের সূত্রসকল নিজের মুঠির ভিতর রাখিয়াছেন জানিতেন, আজ তাহা চারিদিক দিয়া খসিয়া পড়িতেছে। নূতন আকস্মিক ঘটনারাজি উদ্ভূত হইয়া তাঁহার মৎলব তাঁহার উদ্দেশ্যকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছে। আর যতই তিনি দেখিতে লাগিলেন নূতনের সে বিপুল উৎকট দুর্বার আবেগ ততই তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষা ক্ষয়িয়া পড়িতে লাগিল; তিনি বোধ করিতে লাগিলেন তাঁহার সে বিপুল প্রতিভাও আর সেখানে খই পাইতেছে না। সমাজের নিম্নতম স্তর যতই আলোড়িত হইয়া উঠিল, যতই কদর্য্য কুৎসিত উৎকট ভীষণ মূর্ত্তিসকল সেখান হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সমাজকে ছাইয়া ফেলিতে লাগিল, তাঁহার মধ্যেও ততই যেন এক নিগূঢ় প্রতিক্রিয়ার ফলে আভিজাত্য-বোধ জাগিয়া উঠিল। প্রত্যুত মিরোবার কার্য্য শেষ হইয়াছে। তাঁহার কর্ম্ম ছিল বন্যাকে ডাকিয়া আনা, তাহা আসিয়াছে। বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিবার কাজ তাঁহার নয়, চেষ্টা করিলেও পারিবেন না, বন্যা এখন চলিবে নিজের বেগে নিজের ধর্ম্মে। মিরাবো ছিলেন একটি মাত্র যন্ত্র—প্রথম ও অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু যন্ত্র হইতে যন্ত্রী মহত্তর। মিরোবাকে দিয়া আর তাহার প্রয়োজন নাই, তাই সে মিরোবাকে ছুঁড়িয়া ফেলিল। কালের ঘর্ঘর-চক্র-নিম্নে মিরাবো পড়িয়া গেলেন। মিরাবোর কাজ পূর্ণ করিয়া লইতে আসিতেছে অন্য প্রকার আধার, আরও সব শক্তিমান পুরুষ। ব্যক্তিগত প্রতিভার দিক দিয়া দেখিলে ইঁহাদের অনেকেই হয়ত মিরাবো অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। কর্ম্মের কঠোরতার দিক দিয়া দেখিলেও তাঁহারই উচ্চাসন। কিন্তু তবুও কালধর্ম্মের উপযোগিতা হিসাবে, বিশেষ যুগের বিশেষ কর্ম্ম সাধন করিবার জন্য তাঁহাকে বিচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থান অপরে লইতে আসিতেছে। আসিতেছে দান্তন, আসিতেছে রোবস্পিয়ের, আর সেই অলোকসামান্য বিভূতি নেপোলিয়ন।

প্রবর্ত্তক—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

[প্রথম পাদ—দিব্যকর্মযোগ]

৩

কর্মযোগীর আত্মসমর্পণ—গীতোক্ত সাধনা

আগেই বলেছি যোগের সাধনা চলবে জীবন জুড়ে—জীবন হতে বিমুখ হয়ে নয়। কুঁড়ি যেমন আলোর ছোঁয়ায় ফুল হয়ে ফোটে, জীবনও তেমনি বৃহতের ছোঁয়ায় বৃহৎ হয়ে উঠবে। তার ভাবনা বেদনা সঙ্কল্প—সব-কিছুরই ঘটবে দিব্য-রূপান্তর। আত্মচেতনার এই বিস্ফারণ আর আত্মপ্রকৃতির রূপান্তর—এই হল যোগের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে আত্ম-সমর্পণে।

আত্মোৎসর্গের স্বাভাবিক পরিণাম আত্মসমর্পণ। পাহাড়ের বুক থেকে নদী ছুটে চলেছে সমুদ্রের পানে—কোনও বাধা সে মানে না, পিছনপানে ফিরেও তাকায় না। তারপর একদিন তার খাতবহা জলের ধারা সমুদ্রের বুকে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে তার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। নদীর এইখানে সাঙ্গ, কিন্তু বলতে গেলে যোগীর এইখানেই শুরু।

আত্মসমর্পণ হল নিজেকে অমনি করে নিঃশেষে ঢেলে দেওয়া। কার মাঝে? —না বৃহতের মাঝে। সে-বৃহৎ কোনও তর্কের বিষয় নয়, অপরোক্ষ-বোধের বিষয়। এই অপরোক্ষ-বোধ সবারই হতে পারে, যদি সে একটু শান্ত আর অন্তর্মুখ হয়। প্রাকৃত-চেতনার সমস্ত বৃত্তিই সসীম; কিন্তু তাকে ঘিরে যে অসীমের বিস্তার স্তব্ধ হয়ে আছে, এটা জানতে বা মানতে কারও কোনও বাধা নাই। শুধু একটা পরম-সত্তার অনুভব—এই যেমন 'আমি আছি' অথবা ঐ 'আকাশ আছে', আর সেই নির্বিশেষ থাকাটুকুকে আশ্রয় করে বিচিত্র নাম-রূপের উল্লাস। এই অস্তিত্বকেই বলি বৃহৎ—অন্তর্হৃদয়ে আকাশের শূন্যতা।

এই বৃহৎ কতদূর ছড়িয়ে আছে? যেখানে জগৎ ফুরিয়ে গেছে সেখানে সে আছে, জগৎ ছড়িয়ে আছে যেখানে সেখানেও আছে, আবার আছে প্রত্যেক জীবের চেতনার গভীরে গুহাহিত হয়ে। ব্রহ্ম বিশ্বোত্তীর্ণ, ব্রহ্ম বিশ্বাত্মক, ব্রহ্ম গুহাহিত।

এই কথাটাই আমাদের অহং বোঝে না বা বুঝতে চায় না। প্রাকৃত-জীবনের কেন্দ্রে অহং, তাকে ঘিরে ভাবনা-বেদনা-সঙ্কল্পের আবর্তন চলছে দিনরাত। সে ভাবে, এই আবর্তনের সে-ই নিয়ন্তা। কিন্তু তার জ্ঞান কত সঙ্কীর্ণ। নিজেকে সে কতটুকু জানে, চেতনার

অন্তরমহলের কতটুকু খবর সে রাখে ? জগৎকে সে জানে যার ও কন, অপরের সঙ্গে সেখানে নিজের চাইতে পরমিলই তার বেশী। আর যা লোকোত্তর, তার কথা ছেড়েই দিলাম।

এই অন্ধকূপের মাঝেই সবার জীবন কাটছে। অথচ তারই মাঝে প্রকৃতির আলোর তপস্যাও চলছে। অহংএর মাঝে তা-ই নিচ্ছে আত্মবিস্ফারণের রূপ। জগতে সবাই চায় বৃহৎ হতে। কিন্তু সে-চাওয়ার মাঝে সুর থাকে না ছন্দ থাকে না—কেননা মানুষ সাধারণত বড় হতে চায় বাইরে, অন্তরে নয়। উপকরণের সঞ্চয়ে ভোগ আর ঐশ্বর্য নিরঙ্কুশ হ'ক—এই তার কামনা। এ-কামনা কোথাও সার্থক হয়, কোথাও-বা হয় না। সার্থক হলেও অপঘাত তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, কেননা উপকরণবাহুল্য মানুষের অন্তরাত্মাকে শেষ পর্যন্ত কখনই তৃপ্ত করতে পারে না। নচিকেতার মত একদিন তাকে বলতেই হয়, 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ' কারণ এই তর্পণের মাঝে আছে জরার অভিশাপ। তাছাড়া একে উপলক্ষ্য করে অহংএর সঙ্গে অহংএর সংঘাত আর তার যাতনা তো আছেই।

ভোগ আর ঐশ্বর্য বস্তুত নিন্দনীয় নয়, কিন্তু তাদের সত্যকার রূপটি চেনা চাই। ভোগের স্বরূপ হল আত্মারামের আনন্দ, আর ঐশ্বর্যের স্বরূপ হল বিবিক্তের স্বাতন্ত্র্য। উপকরণনির্ভর না হয়েও তাদের পাওয়া যায়, আর সেই পাওয়াই হল সত্যকার পাওয়া। তার পথ হল অন্তরাবৃত্তি। প্রতিদিন যেমন ঘুমের মাঝে তলিয়ে যাই, তেমনি এই জাগ্রতেই মুহূর্তে-মুহূর্তে অনুভব করা হৃদয়ের গভীরে একটা বিরাট শূন্যতা—শুধু 'আমি আছি'র একটা নিষ্কিঞ্চন অনুভব, মৃত্যুর শুভ্রতায় ছাওয়া সত্তার মাধুরী। আর এই 'আমি আছি'কে ঘিরে আর-এক মহাশূন্যতা—বৃহৎ আকাশের অপরিমেয় শূন্যতা। উপনিষদের ঋষির ভাষায় এক আকাশ এই হৃদয়ে, আরেক আকাশ ঐ দ্যুলোকে অন্তরিক্ষে ভূলোকে সর্বত্র। এ-আকাশ মিলিয়ে যায় ঐ-আকাশে, ঐ-আকাশ জড়িয়ে ধরে এই আকাশকে। আর এই যুগনদ্ধ রিক্ততার গাঢ়রস্য হতেই ফোটে সত্তার আনন্দ আর স্বাতন্ত্র্য। তারই আলোর ছটা এসে পড়ে বাইরের উপকরণের 'পরে, ঘটায় ভোগ আর ঐশ্বর্যের রূপান্তর। মানুষ তখন স্বরাট হয়, তার জীবনযাপন হয় বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সুরে গাঁথা আত্মবিসৃষ্টির উল্লাস।

আত্মচৈতন্যের এই সহযুদল স্ফুরণই যোগের লক্ষ্য। এ-স্ফুরণ প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়তি। অপরা-প্রকৃতিতে তার চেতনা অস্পষ্ট, ক্রিয়া বিশৃঙ্খল এবং মন্থর; যোগ তাকেই করতে চায় সচেতন ঋতচ্ছন্দা এবং ক্ষিপ্র। যোগের ফলে চেতনার উৎকর্ষের অনুষঙ্গে আসে আত্মপ্রকৃতিরও রূপান্তর। তারপর একটি আধারে চিন্ময়-পরিণাম সম্যক্‌সিদ্ধ হলে স্বভাবের নিয়মেই তার প্রভাব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আনে বিশ্বপ্রকৃতির মাঝেও একটা আলোড়ন। সর্বভূতাত্মভূতাত্মা সিদ্ধের চেতনায় তখন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে লোকোত্তরের দিব্যসদ্ভাব—সমষ্টি প্রকৃতির রূপান্তর।

পরমচৈতন্যের আবেশে আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ এবং আত্মপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির রূপান্তর—এই হল তাহলে পূর্ণযোগের লক্ষ্য।

যিনি আমার অন্তর্যামী তিনিই জীবনের নিয়ন্তা, আমার বহির্মুখ ক্ষুদ্র অহং নিয়ন্তা নয় — এই দৃষ্টিই সত্যকার যোগদৃষ্টি। অহং জীবনের প্রেরণা পায় প্রাণবাসনার চরিতার্থতা থেকে ; তাকে শেখাতে হবে আপনাতে আপনি থেকেই কি করে নির্মল প্রসন্নতায় অন্তর ভরে উঠতে পারে। বাসনাই অহন্তার আশ্রয়। বাসনা না থাকলে সূর্যোদয়ে কুয়াসার মত অহংএর ছায়া মিলিয়ে যায়, তাঁর আলোয় জীবন ঝলমলিয়ে ওঠে। জীবন তাতে পঙ্গু হয় না, বরং বৃহতের যোগে আরও সমর্থ হয়। এখন মনবুদ্ধি চলছে হুঁড়িয়ে-হুঁড়িয়ে, দিনকানার মত হাতড়ে-হাতড়ে : তখন তারা চলবে অন্তর হতে উপচে পড়া প্রসন্ন আলোর পথে। এখন বাসনার আবিলতা আছে বলে আমাদের সঙ্কল্প বাধা পায় : তখন তা হবে তাঁরই অবন্ধ্য ইচ্ছার স্বত-উৎসারণ। এখন হৃদয় অতৃপ্ত আতুর, তখন চৈত্য-সত্তার উন্মেষে সে হবে চিরনন্দন প্রেম ও রসোল্লাসে ডগমগ।

এক কথায় স্পর্শমণির ছোঁয়ায় জীবনকে আমাদের সোনা করে তুলতে হবে। এ যে অসম্ভব, তা নয়। বরং এ-ই আমাদের দিব্যনিয়তি। একথা যে বোঝে না, তার এখনও সময় হয়নি। কিন্তু আরেকটা জীবনের একটুখানিও আভাস যে পেয়েছে, বুঝতে হবে তার সময় হয়েছে—তিনি এসে তার হাত ধরেছেন। তখন আর ভাবনা-চিন্তা কিছুই নয়, পিছন পানে আর ফিরে তাকানো নয় জীবনের সব ভার তাঁর হাতে তুলে দিয়ে অনিঃশেষে নিজেকে তখন তাঁর মাঝে ঢেলে দেওয়া—আকাশের বুকে আলোর মত। আমার আর 'করবার' কিছুই থাকবে না তখন, জীবনে সব-কিছুই 'ঘটবে' এবং ঘটবে তাঁরই ইচ্ছায়। সে-ইচ্ছাও আর যবনিকার আড়ালে থাকবে না, দেহ প্রাণ মনের প্রতি তন্ত্রে তা ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে। আরও আলো, আরও আনন্দ, আরও শক্তি বাঁধভাঙা প্লাবনের মত জীবনের কূল ছাপিয়ে চলবে।

অথচ জীবনের হারাবে না কিছুই, যা আছে তা-ই আরও সত্য এবং সার্থক হয়ে ফুটবে। আগুনের ছোঁয়ায় ইন্ধনে শক্তির মুক্তি ঘটে, তার প্রতিটি অণু অগ্নিময় হয়ে যায়। তখন তার আলো আর তাপ অনায়াসে তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রূপান্তর আনে স্বচ্ছন্দ বিকিরণের সামর্থ্য।

বস্তুত এই বিকিরণ তাঁরই ইচ্ছার বিকিরণ—সহস্ররশ্মির আত্মবিকিরণের মত। এই তাঁর দিব্য কর্ম। সেই কর্মেরই স্পন্দনে আমাদের জীবন। সে-স্পন্দন অব্যাহত হবে যখন, তখনই জীবনের সার্থকতা। আমরা তখন তাঁর নিমিত্ত, তাঁর শক্তিবিচ্ছুরণের আধার। এতেই কর্মযোগের পূর্ণ সিদ্ধি।

এই আত্মসমর্পণমূলক কর্মযোগ সবারই সাধ্য—এমন-কি জ্ঞান বা ভক্তির দিকে যাদের প্রবণতা আছে, তাদেরও। বস্তুত জ্ঞান ভক্তি আর কর্মে কোনও বিরোধ নাই—একথা আগেও বলেছি। জ্ঞান আর ভক্তির প্রকাশ হয় অন্তরে, কর্মের প্রকাশ বাইরে। কিন্তু বাইর আর ভিতর দুটা তো আলাদা নয়, তারা একই সত্তার এপিঠ আর ওপিঠ। কর্মের উৎস হল শক্তি। কিন্তু শক্তিও তো একটা বোধ মাত্র। তাকে বলতে পারি জ্ঞান বা ভক্তির বীর্য। বীর্য

আত্মবিচ্ছুরণে প্রকাশ পাবেই। যা ভিতরে আছে, তা বাইরে ফুটবেই—যেমন গাছের জীবনরস নিজেকে প্রকাশ করে ফুল আর পাতার বাহারে।

আবার কর্ম শুধু সিদ্ধেরই আত্মবিকিরণ নয়, সাধকেরও তা অপরিহার্য সাধন। চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম প্রাথমিক সাধন—এতো আছেই। কিন্তু শুদ্ধচিত্ত যে কেবল নিজের মাঝে তলিয়েই যাবে, এতেও তো জীবনের পূর্ণ সার্থকতা নয়। অন্তরে ডুবে অবর-প্রকৃতির বাধেলা হতে অব্যাহতি পেতে পারি, কিন্তু তার রূপান্তর ঘটাতে হলে বাইরে আমাকে আসতেই হবে। আর পূর্ণযোগের চরম লক্ষ্য যদি হয় সর্বজনীন রূপান্তর, তাহলে বিশ্বকর্ম নিরুদ্ধ হয়ে যাক এমন কথা তো ভাবাই চলবে না। বিশ্বের কর্ম যদি থাকে, তাহলে ব্যক্তির কর্মও থাকবে। কিন্তু কর্ম তখন হবে অভাবের তাড়নায় নয়, ভাবের স্ফূর্তিতে। জগৎ জুড়েই এমনি হবে। সেই সুদূর সিদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রেখেই আমাদের ব্যষ্টিজীবনের সাধনার ছক বাঁধতে হবে। অবশ্য যোগের পথ স্বভাবের পথ। সুতরাং উদার বুদ্ধির উন্মেষ যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ স্বভাবের প্ররোচনায় সঙ্কীর্ণ পথে চলতেও কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, ক্রমে আমাদের মাঝ থেকে যাতে সীমার সঙ্কোচ দূর হয়ে যায়, বিশ্বে এবং বিশ্বোত্তীর্ণে মুক্তি পেয়ে ব্যক্তির ভাবনা যাতে সার্থক হয়।

* * *

চিন্ময় কর্মসাধনার সঙ্কেত আমরা পাই গীতার কর্মযোগে। সাধনার কথা সেখানে খুঁটিয়েই বলা হয়েছে, কিন্তু সিদ্ধির কথাটা রয়েছে উহ্য। গীতার দর্শন একটা অখণ্ড জীবন-দর্শন। জীবনের কুরুক্ষেত্রেই তাঁকে পেতে হবে, জীবন থেকে সরে দাঁড়িয়ে নয়—এই হল গীতার অমোঘ নির্দেশ। কর্মের সাধনায় যেমন তাঁকে পাওয়া, তেমনি আবার তাঁকে পাওয়ার ভিতর দিয়েই কর্মপ্রবৃত্তির রূপান্তর ঘটানো—সাধনার মাঝে এমনিতর একটা অন্যোন্যভাবনা (reciprocity) হল গীতার মূল সুর। তৎপর হয়ে, সমস্ত কর্ম তাঁতে সন্ন্যস্ত করে আত্মসমর্পণের ভিতর দিয়েই প্রাকৃতকর্মের রূপান্তর ঘটবে দিব্যকর্মে—এই সাধনার কথাটাই গীতায় আছে। কিন্তু তার ফলশ্রুতির কথাটুকু রয়ে গেছে রাজগুহ্য। সেইটুকু আমাদের ক্রমে-ক্রমে স্পষ্ট করে তুলতে হবে।

গীতোক্ত কর্মযোগের দুটি মূল সূত্র—সমত্ব আর একত্ব। সমত্বের সাধনা নিজের মাঝে, আর সমস্ত বিশ্বে একত্বের সাধনা। বাইরের জগৎ আমাদের অহরহ নাড়া দিচ্ছে, আর আমরা তাতে সাড়া দিচ্ছি অন্তরের সুখ-দুঃখ বা রাগ-দ্বেষ দিয়ে—এই দ্বন্দ্বের দোলাটাই হল আমাদের জীবন। সমত্ব আমাদের এই দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠতে শেখায়। শুধু দুঃখেই অনুদ্বিগ্ন থাকা নয়, সুখেও নিঃস্পৃহ থাকা—এই হল সমত্বের লক্ষণ। অন্তর হবে আকাশের মত প্রসন্ন এবং উদার—আলোর খেলা আর মেঘের ছায়া দুয়েতেই অসঙ্গ এবং নির্বিকার।

সমত্বের সাধনা সহজ হয় একত্বের ভাবনা থেকে। আবার ঐ আকাশের দৃষ্টান্ত দিয়েই বলতে পারি—সবাইকে ছেয়ে সবার মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সবাইকে ছাপিয়ে আছে এক

আকাশ। যেমন সে আছে বাইরে, তেমনি আছে অন্তরে। বাইরে রূপ আর অন্তরে নাম (conceptual entity). সবই ফুটেছে ঐ আকাশ থেকে—অরূপ থেকে ফুটছে রূপ, অনাম থেকে নাম, নৈঃশব্দ্য থেকে ভাষ। এই সর্বব্যাপী সর্বাবগাহী সর্বাতিশায়ী একত্বের ভাবনায় মনত্ব সহজ হয়। অহংই বহু। তা-ই থেকে যেমন মেশামেশি, তেমনি আবার রেষারেষিও। কিন্তু বহু অহং একেরই বিভূতি, অন্তরে এই বোধ জাগ্রত থাকলে অভিষ্বঙ্গ (clinging) বা জুগুপ্সা (shrinking) কোনটাই থাকে না—চেতনা আলোর মত সহজে সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

এই হল বিদ্যার জীবন, সেখানে একের প্রশাসন। আর অহংতন্ত্রিত জীবন অবিদ্যা-গ্রস্ত, সেখানে বহুর শাসন। অহং নিজেকে মনে করে স্ব-তন্ত্র, কিন্তু বাস্তবিক সে কি তা-ই? পরতন্ত্র আমরা পদে-পদে। জীবনে কত-কিছুই আমরা ঘটাতে চাই, কিন্তু পারি কি? ভাবি এক, হয় আর—এ-ব্যর্থতার বেদনা কার নাই? কিন্তু এ-বেদনা হতে মুক্তি পেতে পারি, যদি সব ঘটনার পিছনে দেখি সেই একেরই স্পন্দনকে। আমার সঙ্কল্প তখন হয় তাঁরই দিব্যসঙ্কল্পের অধীন। তার সার্থকতা বা ব্যর্থতার দায় তখন আর আমার নয়। সঙ্কল্প যদি সিদ্ধ হয়, সে তাঁরই সিদ্ধি; যদি অসিদ্ধ হয়, সেও তাঁরই সিদ্ধি। আপাতত যা অসিদ্ধ, তাও এক পরম-সিদ্ধিরই অঙ্গীভূত—চেতনা অহং থেকে নির্মুক্ত হয়ে বৃহৎ ও প্রশান্ত না হলে এ-দৃষ্টি আসেনা।

অথচ এটা হাল ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারও নয়। আমরা যে পরতন্ত্র, এতে কোনও ভুল নাই। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের অভিমানও তো আমাদের মধ্যে আছে। সে-স্বাতন্ত্র্য কার? যদি বলি অহংএর স্বাতন্ত্র্য, তাহলে যে ভুল হবে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যদি বলি, প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য, আমরা তারই পরতন্ত্র—তাহলেও ভুল হবে। এ-দর্শনও সম্যক্ দর্শন নয়, এও অবিদ্যার দর্শন। কিন্তু যদি বলি স্বাতন্ত্র্য তাঁরই, আমরা সেই একেরই পরতন্ত্র, তাহলেই স্বাতন্ত্র্যে আর পারতন্ত্র্যে বিবাদ ঘুচে যায়। তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে যখন অনুভব করি জীবনে, তখন তাঁর শক্তিকেও অনুভব করি—কেননা স্বাতন্ত্র্যের অর্থই হচ্ছে শক্তির অবাধিত স্ফূর্তি। তখন তাঁর স্বাতন্ত্র্যেই আমার স্বাতন্ত্র্য, অর্থাৎ আমি তাঁর দিব্যসঙ্কল্পের বাহন, জীবনের কুরু-ক্ষেত্রে তাঁর সব্যসাচী নিমিত্ত।

প্রাকৃত কর্ম দিব্য হয়ে ওঠে এই বোধে।

* * *

সাংখ্যের বিবেকজ্ঞান দিয়ে সাধনা শুরু করা ভাল। সাংখ্য বলেন, প্রকৃতি আর পুরুষের মাঝে বিবেকের কথা। বিবেক মানে তফাত করা, প্রকৃতির ক্রিয়া থেকে পুরুষকে আলাদা করা।

আমাদের মাঝে যে-চৈতন্য আছে, তা-ই হল পুরুষের লক্ষণ। এই চৈতন্যের তিনটি বৃত্তি আমরা দেখতে পাই—ভোক্তৃত্ব, কর্তৃত্ব আর দ্রষ্টৃত্ব। জগৎটা বাইরে থেকে বা ভিতরে

থেকে অহরহ আমাদের নাড়া দিচ্ছে আর আমরা সুখ-দুঃখের বোধ দিয়ে তাতে সাড়া দিচ্ছি। এইটা হল আমাদের ভোক্তৃত্ব। আবার শুধু যে অবশ হয়ে সাড়া দিয়েই যাচ্ছি তা নয়, উলটে জগৎটাকেও আমরা নাড়া দিচ্ছি—সুখ পেলে তাকে আঁকড়ে ধরে জিইয়ে রাখতে চাইছি, দুঃখ পেলে ছিটকে পড়ে তাকে তাড়া করছি। এইটা আমাদের কর্তৃত্ব। ভোক্তৃত্ব আর কর্তৃত্ব চৈতন্যের বৃত্তি হলেও সাংখ্যকার তাদের বলেন প্রকৃতির গুণক্রিয়া। এই ক্রিয়াটা যান্ত্রিক। ভাল লাগা আর মন্দ লাগা, সুখ খোঁজা আর দুঃখ এড়ানো—এগুলোর কতকগুলি বাঁধাধরা রীতি আছে। আমরা যন্ত্রের মত তার অনুবর্তন করি। অনুবর্তন করাটা আমার স্বভাব বা প্রকৃতি। আমরা প্রকৃতির বশ। সাংখ্যের ভাষায় পুরুষ বা চৈতন্য এখানে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, নিজেকে তা থেকে আলাদা করতে পারছে না বলে প্রকৃতির উপর তার কোনও প্রশাসনও নাই। এর নাম অবিবেক।

এই অবিবেকের অবস্থা থেকে চৈতন্য কিন্তু ভিতরে-ভিতরে ছাড়া পাবার চেষ্টাই করছে। এই চেষ্টার ফলে চৈতন্যের বিকাশের ধাপগুলিকে সাংখ্যকার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন প্রকৃতির গুণক্রিয়া দিয়ে। প্রথম ধাপটায় চৈতন্য আচ্ছন্নই থাকে—যেমন উদ্ভিদে। এটা তমোগুণের অবস্থা। তারপর তার অর্ধাচ্ছন্ন প্রকাশ হয়, কিন্তু কোনও স্বাতন্ত্র্য থাকে না—যেমন পশুতে। এখানে তমোগুণের সঙ্গে খানিকটা রজোগুণের মিশ্রণ ঘটে। তারপর চৈতন্য অনেকটা স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় মানুষে··তখন রজোগুণের সঙ্গে সত্ত্বগুণের মিশ্রণ ঘটে। বিশুদ্ধ সত্ত্ব মানুষের মাঝেও খুব কম। তাকে ফুটিয়ে তোলাই হল যোগের লক্ষ্য।

শুদ্ধ-সত্ত্বের উপমা দেওয়া হয় আলোর সঙ্গে। আলো স্বচ্ছ, প্রশান্ত, প্রসন্ন—তার কাছে সব-কিছু সুস্পষ্ট। পুরুষের প্রকৃতি যখন শুদ্ধসত্ত্ব হয়, তখন সে হয় এই আলোর মত। তাকে বলতে পারি—পরা-প্রকৃতি। যেখানে আলো-আঁধারি, সেখানে সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজোগুণের আর তমোগুণের ভেজাল আছে বুঝতে হবে। রজোগুণের ফলে সেখানে দেখা দেয় চাঞ্চল্য, আর তমোগুণের ফলে জড়তা। বোকার মত ছটফট করছি—আমাদের সবারই বলতে গেলে এই দশা। ছটফটানিও কমে এল, শেষে আঁধারে সব ছেয়ে গেল—এর নাম তমঃ। আমাদের প্রকৃতির বেদিকটা আলো-আঁধারের মাঝে এমনি ছটফট করতে-করতে বারবার আঁধারে তলিয়ে যাচ্ছে, তাকে বলি অপরা-প্রকৃতি। এই অপরা-প্রকৃতির বশ্যতা হতে নিজেকে আলোর জগতে টেনে তুলতে হবে—বিবেক দিয়ে। বিবেক জাগে দ্রষ্টৃত্ব থেকে। এখন আমরা ভোগ করছি, কর্মও করছি—কিন্তু করছি যন্ত্রের মত। কিসে থেকে কি হচ্ছে, আমরা কিছুই জানছি না দেখছি না। দেখতে চাইলে প্রকৃতির এই যান্ত্রিক আবর্তনের উর্ধ্বে উঠতে হবে। সাংখ্যের ভাষায় আমি তখন দ্রষ্টা এবং স্বরূপে অবস্থিত। আমি তখন হুঁশে আছি। আর হুঁশে আছি বলেই অপরা-প্রকৃতিকে শাসনও করতে পারছি।

এইটি করতে পারলেই অপরা-প্রকৃতির এলোমেলো চলনের মাঝে ছন্দ আর সৌষম্য জাগে। তখন পরা-প্রকৃতির উন্মেষ। অপরা-প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক হল বিবেকের

আর পরা-প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্যের। পুরুষের অবিলুপ্ত দ্রষ্টৃত্ব তখন তাঁর ভোক্তৃগুণকে করে স্বস্থ ও স্বচ্ছ, কর্তৃত্বকে স্ব-তন্ত্র। পুরুষ আত্মার মহিমাকে অনুভব ক'রে তখন বিশ্ব এবং বিশ্বোত্তীর্ণের সঙ্গে এক হয়ে যান।

সদাজাগ্রত বিবেক দিয়ে অপরা-প্রকৃতির বশ্যতা হতে মুক্তিলাভ করাই তাহলে সাধনার প্রথম সোপান।

*

কর্মযোগীর জীবনাদর্শ তাহলে এই :

তাকে কর্ম করতেই হবে। কিন্তু কর্ম করবে সে সর্বদা সজাগ থেকে, নিজের মাঝে নিজেকে অবিচল রেখে। অহংকে কর্তা সাজিয়ে অথচ অপরা-প্রকৃতির গোলাম হয়ে সে কর্ম করবে না।

অপরা-প্রকৃতির গুণক্রিয়া হতে বিবিক্ত থাকবে বলেই তার মাঝে জাগবে সমত্ব। তার ফলে কর্মে তার ফলাকাঙ্ক্ষা থাকবে না, সিদ্ধি আর অসিদ্ধি তার কাছে সমান হবে। আর তার সর্বভূতে হবে সমদৃষ্টি।

এই সমত্ব এবং সমদৃষ্টি তার মাঝে জাগাবে একত্বের বোধ। সে জানবে এই বিশ্ব এবং বিশ্বকর্ম এক পরমপুরুষেরই প্রজ্ঞার বিসৃষ্টি এবং প্রাণের ছন্দ। তার জীবন এবং কর্ম তাঁরই সত্তার সমুদ্রে একটা তরঙ্গমাত্র।

তখন তার যোগযুক্ত চেতনায় কর্মযোগের তিনটি পরম রহস্য একে-একে ফুটে উঠবে। প্রথম সে অনুভব করবে—সে কিছুই করছে না, সে অকর্তা, প্রকৃতি-পরিণামের সাক্ষী মাত্র। তারপর সে অনুভব করবে—কর্মে তার পরা-প্রকৃতি তাঁরই যন্ত্র। যন্ত্রী তিনিই, সে তাঁর নিমিত্তমাত্র। অবশেষে তাঁর পরমা-প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্যভাবনায় সে রূপান্তরিত হবে তাঁর শক্তিতে। তখন কর্ম হবে সাক্ষাৎভাবে তাঁর প্রজ্ঞা প্রাণ এবং আনন্দের বিসৃষ্টি। প্রথম অকর্তার কর্ম, তারপর নিমিত্তের কর্ম এবং অবশেষে দিব্যকর্ম। কর্মযোগের এই সিদ্ধি।

* * *

প্রাকৃত-জীবনে অহংই হল কর্মকর্তা, নিজেকে সে বসিয়েছে ঈশ্বরের জায়গায়। তার কর্মের লক্ষ্য হল ভোগ। ইচ্ছা হবে অপ্রতিহত আর কামনার তর্পণ হবে নিরঙ্কুশ—এই তার জীবনের লক্ষ্য। এ হল প্রবৃত্তির ধর্ম। প্রবৃত্তি মিথ্যা নয়, কিন্তু সে লক্ষ্যভ্রষ্ট। একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির মাঝে প্রবৃত্তির চরিতার্থতার প্রয়াস দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। চেতনা তাতে ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে—এই হল প্রবৃত্তির অভিশাপ। কিন্তু বৃহত্তের প্রশাসনে প্রবৃত্তি রূপান্তরিত হয় উদ্দীপনায়। কর্মের কর্তা তখন অহং নয়, অন্তর্যামী।

অহন্তা আর কামনা—কর্মযোগের এই দুটি হল সবচাইতে বড় বাধা। অহং কর্ম করে ফলের আশায়। সে-ফল স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে পরার্থসিদ্ধিও হতে পারে, বাইরের লাভ হতে পারে অন্তরের লাভও হতে পারে। যা-ই হ'ক না কেন,

সবক্ষেত্রেই আসল কথাটা হল—আমি একটা কিছু চাই, আমি কাঙাল। কাঙালীপনার একটা হীনতা আছে। কিন্তু আত্মশক্তির দম্ভে সেটা আমাদের নজরে পড়ে না। যা চাই তা যদি পাই, তাহলে কেনোপনিষদের দেবতাদের মত ভাবি, এ আমারই বিজয়, আমারই মহিমা। যদি না পাই, তাহলে মুষড়ে পড়ি। হীনতাটা তখন প্রকট হয়ে পড়ে। তাই, যে বুদ্ধিমান সে লাভালাভ বা সিদ্ধি-অসিদ্ধির ঊর্ধ্বে থাকতে চায়। সে জানে, কর্ম স্বভাবের নিয়ম, সুতরাং কর্ম তাকে করতেই হবে। কোন্ কর্মের কি ফল সম্ভাবিত তাও সে জানে, কেননা সে বোকা নয়। কর্মের কল্যাণময় আদর্শের প্রেরণাও সে অনুভব করে, প্রেরণা অনুযায়ী কর্মও করে। এই পর্যন্ত হল প্রবৃত্তির অধিকার। কিন্তু বুদ্ধিমান বলেই তার পরের অধিকারটুকু আর সে দাবি করে না—কর্মের ফল সে চায় না। উদ্দিষ্ট ফল ফলতেও পারে, নাও ফলতে পারে। কিন্তু তাতে তার হর্ষও নাই, শোকও নাই। গীতায় একেই বলা হয়েছে 'নিষ্কাম কর্ম'।

কাজ করব কিন্তু ফল চাইব না—এই হল কর্মযোগীর আদর্শ। কথাটা বলতে সোজা, কিন্তু জীবনে তাকে ফলিয়ে তোলা সোজা নয়। ফল চাই না, কিন্তু কর্তব্যবোধে কাজ করছি, ব্যর্থতার আঘাতেও অটল থাকছি, প্রশান্ত আনন্দে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দিচ্ছি—এসবই ভাল কথা, উঁচু অবস্থার কথা। কিন্তু এও চরম অনুভব নয়। সে-অনুভব আসে অন্তর্যামীর সঙ্গে সাযুজ্যের বোধ থেকে। গীতায় ভগবান বলেছেন, 'আমার করবার কিছুই নাই, কিছু পাইনি বা পেতে হবে তাও নয়; তবুও আমি কাজ নিয়েই আছি।' তাঁর এ-কর্ম কোনও-কিছুর তাগিদে বা তাড়নায় নয়। এ তাঁর অচলপ্রতিষ্ঠ অনুত্তচেতনার আত্ম-উৎসারণ। তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হলে কর্মযোগীর কর্মও হয় এমনিতর। কামবাসনার তখন রূপান্তর ঘটে সত্যসঙ্কল্পে। সে-সঙ্কল্প অসীমের, কর্মযোগী তার বাহনমাত্র। কর্মে তখন দায় থাকে না ভার থাকে না আঁকুপাঁকু থাকে না, অথচ তার মুক্তধারায় ছেদও থাকে না।

এই কর্মই মুক্তের কর্ম। সমত্ব তার লক্ষণ। অক্ষুব্ধস্থিতজ্ঞানসত্ত্বই হল সমত্ব—আকাশের মত। তারই মত সমত্ব হল চেতনার একটা সহজ প্রসন্ন উদার এবং অবিচল প্রতিষ্ঠা। হতাশায় অভিমানে বা ঔদাস্যেও একরকম সমত্ব আসে—এ কিন্তু তা নয়। ওগুলি হল আত্মনিগ্রহ, তার মূলে কাজ করছে সঙ্কীর্ণ অহন্তা। আর, এ-সমত্ব হল অনিবার্য আত্মবিস্ফারণ।

তিতিক্ষাও সত্যকার সমত্ব নয়, যদিও সাধনার প্রথম অবস্থায় তিতিক্ষা অপরিহার্য। আঘাত এল, প্রত্যাঘাত করলাম না, সরে গেলাম, কিন্তু বুকে একটা ক্ষোভ হয়তো থেকেই গেল—এটা তিতিক্ষার প্রথম স্তর। দেহ-প্রাণ-মনে ক্ষোভ এলেও তার অভিব্যক্তি হল না, আর অন্তর অবিক্ষুব্ধই রইল—এটা হল দ্বিতীয় স্তর। কিন্তু অক্ষোভও একটা নেতিবাচক অবস্থা। তারও গভীরে রয়েছে অন্তরাত্মার একটা পরিব্যাপ্ত প্রসন্নতা। যখন তাতে আমাদের স্থিতি হয়, তখনই সমত্বের শুরু। আকাশের মত স্থিতি নিত্যকালীন হওয়া চাই।

প্রশান্ত এবং পরিব্যাপ্ত প্রসন্নতা যখন দেহ-প্রাণ-মনের সর্বত্র সঞ্চারিত হয়, তখনই সমত্বের সিদ্ধি। তখন ঐ আকাশবৎ সমত্বের ভূমিকায় চিৎসূর্যের উদয় হয়, শুরু হয় আত্মবিকিরণ—বিশ্বব্যাপী প্রশান্তির বিকিরণ। এই হল সমত্বসাধনার সাধ্যাবধি।

প্রশ্ন হবে, এমনি করে প্রশান্তিতেই যদি ডুবে যাই, তাহলে কর্ম করা কি সম্ভব হবে? উত্তরে বলব, নিশ্চয় হবে। প্রথম হয়তো সম্ভব হবে না, কিন্তু তাকে সম্ভব করে তোলাই হল যোগসাধনার লক্ষ্য। প্রাকৃত-জীবনে আমরা কর্ম করি ক্ষুদ্র অহংএর তর্পণের জন্য। কর্মের প্রেরণা আসে বাসনা হতে, কিন্তু বাসনার উৎস কোথায় তা জানি না। সুতরাং বস্তুত আমরা কর্ম করি অন্ধপ্রবৃত্তির তাড়নায়—যন্ত্রের মত। কর্মযোগের লক্ষ্য, এই অন্ধতা আর যান্ত্রিকতা হতে চেতনাকে মুক্ত করা। তার উপায় হল বিবেক দ্বারা কর্ম হতে কর্তাকে আলাদা করে নেওয়া, যার কথা আগেই বলেছি। বিবিক্ত পুরুষ সাক্ষী, সুতরাং কর্মপ্রেরণার উৎস তাঁর অগোচর নয়। আবার তিনি স্ব-স্থ, সুতরাং সুখ-দুঃখরূপ কর্মফলের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে যান না। তাইতে অকর্তা থেকে নিষ্কামভাবে কর্ম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। এই হল কর্মযোগের একটা দিক, যা জ্ঞানের সঙ্গে অন্বিত। গীতা প্রথম এই আদর্শের কথা বলে তার পর বলছেন আরও গূঢ় একটা রহস্যের কথা। যোগস্থ হয়ে সমত্বে প্রতিষ্ঠিত থেকে কর্ম করা—সে তো আছেই। তার চাইতেও গভীর কথা হল তাঁতে সমস্ত কর্ম সন্ন্যস্ত করে যজ্ঞার্থে কর্ম করা। এই যজ্ঞভাবনাতেই কর্মযোগের পরম সিদ্ধি।

সমত্ব, ফলত্যাগ, যজ্ঞার্থে কর্ম—এই তিনটি হল গীতোক্ত কর্মযোগের মূল কথা।

৪

যজ্ঞ ও যজ্ঞেশ্বর

মীমাংসক বলেন, দেবতার উদ্দেশে যে-দ্রব্যত্যাগ, তা-ই হল যজ্ঞ। দ্রব্যত্যাগ বস্তুত আত্মত্যাগ। জীবনের যজ্ঞবেদিতে অভীপ্সার আগুন জ্বালিয়ে দেবতার উদ্দেশে নিজেকে আহুতি দিই, তা-ই সত্যকার যজ্ঞ। দ্রব্যযজ্ঞের চাইতে জ্ঞানযজ্ঞ বড়—এ হল গীতার কথা।

যজ্ঞের দুটি রূপ—দেবযজ্ঞ আর মানুষযজ্ঞ। বৈদিক ঋষি বলেন, দেবযজ্ঞ বা পুরুষ যজ্ঞই 'প্রথম ধর্ম' বা আদিম যজ্ঞ। পুরুষ নিজেকে আহুতি দিয়েছেন আগে, তবে এই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। তাঁর আত্মাহুতির আদর্শেই মানুষ যজ্ঞ করতে শিখেছে। যজ্ঞ তার চেতনার উত্তরায়ণের সাধন।

দেবযজ্ঞ অবতরণ, আর মানুষযজ্ঞ উত্তরণ। বিশ্বের জীবনে এই দুটি ছন্দ। দুটি ওতপ্রোত। গীতা বলেন, এ হল দেবতা এবং মানুষের অন্যোন্যসম্ভাবন।

যিনি বৃহৎ, তিনি অকৃপণ—নিজেকে না দিয়ে তিনি পারেন না। মা যেমন সন্তানের মাঝে নিজেকে ঢেলে দেন। তাইতে সন্তান তিলে-তিলে বড় হয়ে ওঠে।

কিন্তু বড় হতে গেলেই ছাড়তে হয়। ছাড়তে হয় নিজের ক্ষুদ্রতাকে, অঙ্গীকার করতে হয় বৃহৎকে। ভূমাকে স্বীকার করে অল্পকে ছাড়া, যথবা বৃহতের মাঝে আত্মাহুতি দেওয়া—এই হল মানুষযজ্ঞ। দেবযজ্ঞ আর মানুষযজ্ঞ ওতপ্রোত। বিশ্বের সমস্ত সার্থক কর্মই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এই যজ্ঞভাবনার দ্বারা। বৃহতের আত্মত্যাগে সর্বত্রই ক্ষুদ্র বৃহৎ হয়ে উঠছে আত্মোৎসর্গের ফলে। দেবতা সর্বত্র। তাঁর দান এই জীবন। এ-জীবন আবার তাঁকেই ফিরিয়ে দিতে হবে—দিয়ে তাকে ভোগ করতে হবে 'ত্যক্তেন'. তাঁর প্রসাদরূপে। তাতেই এই পার্থিব-জীবন দিব্য হবে। গীতা বলেন, তাঁর দান তাঁকে না দিয়ে যে ভোগ করে, সে চোর।

যজ্ঞের মূলে আত্মত্যাগ। আবার এই আত্মত্যাগই যথার্থ আত্মসম্পূর্তি। মানুষের সমস্ত যজ্ঞই অনুষ্ঠিত হয় বৃহতের উদ্দেশে, বৃহৎকে দিয়ে নিজেকেই আমরা পাই বৃহৎ করে এবং সেই বৃহৎ চেতনার দ্বারাই বৃহৎকে বুঝতে পারি। তখন বৃহতের সঙ্গে আমার সাযুজ্য ঘটে। অনুভব করি—বৃহতে আমি, আমাতে বৃহৎ। এই সাযুজ্যবোধই প্রেম। প্রেমেই অদ্বৈতসিদ্ধি।

এই প্রেম সহজ। এতে যেমন বঞ্চনা নাই, তেমনি কৃচ্ছ্রতাও নাই। বৃহৎকে দিয়ে কখনও আমি বঞ্চিত হই না। আমার দান প্রতি মুহূর্তেই প্রতিদানে সার্থক হয়ে ওঠে। দিয়ে যেখানে বুক ভরল না, সেখানে বুঝতে হবে—দেবতাকে দিইনি, দিয়েছি আমারই অহংতাকে বা কামনাকে। দিতে যেখানে বুকে বাজে, সেখানেও দান সার্থক হয়নি,—কেননা বৃহৎকে সেখানে আমি দেখতে পাইনি, তাই আবার অহংই আমার অকুণ্ঠ আত্মদানের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সূর্যের আলোয় যেমন কমল ফোটে, বৃহতের ছোঁয়ায় তেমনি হৃদয় আপনা হতে বিকশিত হয়—আত্মদানে তখন কৃচ্ছ্রতা থাকে না। যাজ্ঞবল্ক্য তাই বলেছিলেন, 'পত্নীর জন্য পত্নী আমাদের কাছে প্রিয় হয় না, আত্মার জন্যই প্রিয় হয়।'

যজ্ঞভাবনার তাহলে দুটি দিক। প্রথমত, চেতনায় প্রতিনিয়ত এই ভাবটি জাগিয়ে রাখতে হবে : তিনি বৃহৎ, আত্মদান বা আত্মবিকিরণ বৃহতের ধর্ম, তাই প্রতি মুহূর্তে তিনি নিজেকে আমার মাঝে ঢেলে দিচ্ছেন। তারপর, এই অনুভূতিতে উদ্দীপ্ত হয়ে মুহূর্তে-মুহূর্তে নিজেকে তাঁর মাঝে ঢেলে দেওয়া। আগুনের শিখা যেমন প্রতি মুহূর্তে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়, তেমনি আমার প্রত্যেকটি কর্ম প্রত্যেকটি ভাবনা এখানকার সঙ্কীর্ণ বাসনার বাঁধন কাটিয়ে প্রতি মুহূর্তেই মিলিয়ে যাবে তাঁরই মাঝে। আমি যা-কিছু করব, তা আত্ম-তর্পণের জন্য নয়—করব যজ্ঞেশ্বরের বিশ্বযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দেবার জন্য।

* * *

এমনি করে জীবন আর যজ্ঞ আমাদের কাছে এক হয়ে যাবে। তখনই গীতার ভাষায় যজ্ঞার্থে অবন্ধন কর্ম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। স্বার্থপ্রণোদিত যে-কর্ম, তা চেতনাকে

সঙ্কুচিত করে, তা আত্মভাবনামাত্র। গীতা তাকে বলেছেন, 'কেবল নিজের জন্য পাক করা।' পরার্থে যে-কর্ম তা স্বার্থিক কর্মের চাইতে শ্রেষ্ঠ, তাতে চেতনার বিস্ফারণ ঘটে। গীতা তাকে বলেছেন, 'লোকসংগ্রহার্থ' কর্ম—যা সমাজস্থিতির কারণ। কিন্তু যজ্ঞার্থে কর্ম তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। সে-কর্মের উদ্দিষ্ট দেবতা শুধু মানুষ নয়—মানুষের মাঝে যে-লোকোত্তরের প্রকাশ, সর্বভূতের যিনি অন্তর্যামী, কর্মের ভিতর দিয়ে আমার আত্মাহুতি তাঁরই উদ্দেশে। এমনকি যা-কিছু আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার—সেই খাওয়া শোওয়া বসা চলা নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত হবে তাঁর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অঙ্গীভূত। দেহের প্রাণের মনের এমন-কোনও কর্মই আমার থাকবে না যা তাঁর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হবে। 'যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।'

এমনিতর যজ্ঞভাবনার তিনটি ফল। প্রথম ফল, কর্মে সেবাবুদ্ধির উদয়। ভালবেসে যে-কর্ম, তার নাম সেবা। আমি বুদ্ধের মত কর্ম করছি না বা উগ্র অহংবোধ নিয়ে কিছু করছি না, করছি তাঁকে ভালবেসে, তাঁর হয়ে তাঁরই তৃপ্তির জন্যে তাঁর কাজ করে যাচ্ছি। ঘটে-ঘটে দেখছি তাঁকেই, আর আমার অন্তরের সমস্ত মাধুরী ঢেলে দিয়ে মৃন্ময়ের মাঝে সেই চিন্ময়েরই সেবা করে চলেছি। এই হল কর্মযোগে ভক্তির সিদ্ধি।

দ্বিতীয় ফল হল কর্মের মাঝেই জ্ঞানের সিদ্ধি। জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম এমন-কি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসটি পর্যন্ত যদি যজ্ঞাঙ্গ হয়, তাহলে তো একমুহূর্তও তাঁকে ভুলে থাকা চলে না। উপনিষৎ একে বলেছেন 'ধ্রুবা স্মৃতি'। আর এই ধ্রুবা-স্মৃতিই হল তাঁর সহজ বিজ্ঞান। আমার প্রত্যেকটি কর্মই যদি যজ্ঞভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহলে অচেতনভাবে কোনও কর্মের অনুষ্ঠান আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। এই সচেতনতার একটি প্রান্তে রয়েছে আমার সেবার আকুতি—আমার সব দিয়ে আমি তাঁর পূজা করতে চাই। আর তার আরেক প্রান্তে রয়েছে তাঁর নিত্যসান্নীপ্যের বোধ। যাঁর সেবা করব তিনি তো দূরে নন—এই যে তিনি অন্তরে, এই যে তিনি বাইরে। হৃদয়ের আতটপূর্ণ আকাশে তিনি, আবার বাইরের সর্বাবগাহী আকাশেও তিনি। সেই আকাশের মাঝেই রূপের মেলায় অন্তরের ভাবনার উপচারে তাঁর নিত্যপূজা। এই অবিক্ষুব্ধ জ্ঞানই যজ্ঞার্থক কর্মের দ্বিতীয় ফল।

তৃতীয় ফল হল অহংবুদ্ধির বিলোপ। 'আমি কর্তা' এ-বুদ্ধি গিয়ে আসছে 'বিশ্বের কুরুক্ষেত্রে আমি তাঁর সব্যসাচী নিমিত্তমাত্র' এই পরম স্বস্তিময় বোধ। সঙ্কল্প ছাড়া কর্ম হয় না; কিন্তু আমার কোনও সঙ্কল্পই কামসঙ্কল্প নয়—নিত্যযুক্ত চেতনায় তাঁরই সত্য-সঙ্কল্পের অভিব্যক্তিমাত্র।

এমনি করে যজ্ঞার্থক কর্ম একদিকে ভক্তির সঙ্গে এবং আরেকদিকে জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশ্বের যজ্ঞবেদিতে আত্মোৎসর্গের দ্বারা তাঁরই সঙ্কল্পকে জীবনে জয়যুক্ত করে, জীবন হয় কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গমতীর্থ।

*

যজ্ঞেশ্বরকে লাভ করাই হল যজ্ঞের লক্ষ্য। বরণীয়ার এ-উক্তিকে মনস্তত্ত্বের ভাষায় তর্জমা করে বলতে পারি, আমরা এমনভাবে কর্ম করব যাতে চেতনার পরিপূর্ণ উন্মেষ ঘটে। যে-কর্ম চেতনার উৎকর্ষ ঘটায় না, তা বিকর্ম—তাতে শুধু শক্তির অপচয় এবং বৃথাই আয়ুক্ষয়।

চেতনার উৎকর্ষ ঘটে ব্রহ্মসাযুজ্যে বা বৃহতের নিত্যজাগ্রত বোধে—যে-বৃহৎ আমার সঙ্কীর্ণ অহন্তার ঊর্ধ্বে, যে-বৃহৎ বিশ্বের সমস্ত অহন্তার অধিষ্ঠান। যেমন আকাশ। আমার ক্ষুদ্র আধারকে পূর্ণ করে আকাশ ছড়িয়ে আছে অনন্তে, জড়িয়ে আছে সবাইকে। এই আকাশকে যদি পাই, তাহলে আমাকেও যেমন পরিপূর্ণরূপে পাই তেমনি সবাইকে পাই আমার মাঝে। আত্মপথের প্রাচীর তখন ভেঙে যায়, জীবনের সকল অস্বস্তি আর ঝামেলার অবসান ঘটে। কুরুক্ষেত্র রূপান্তরিত হয় শ্রীক্ষেত্রে। চেতনার উৎকর্ষণের এই ফল। এ যদি না হয়, তাহলে কর্ম কখনও যজ্ঞ হয়ে ওঠে না।

এইজন্য কর্মের মূলে একটা অন্তরাবৃত্ত চেতনার অধিষ্ঠান থাকা চাই। সে-চেতনা হয় বিবিক্ত এবং সাক্ষী আত্মচেতনা, অথবা বিশ্বের আধার ব্রহ্মচেতনা। যোগী এবং অযোগীর কর্ম বাহ্যদৃষ্টিতে এক হতে পারে, কিন্তু এই অন্তশ্চেতনার দিক হতে তাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত হয়ে যায়। একজন কাজ করে ব'লে, আরেকজন করে বেহ'শ হয়ে। একজনের কর্ম, অন্যেকজনের বিকর্ম।

এই অন্তশ্চেতনাই যজ্ঞেশ্বরের স্বরূপ। তিনি আমার এবং বিশ্বের অন্তর্যামী। তাঁকে হৃদয়ে রেখে কর্ম করে যেতে হবে, যাতে তাঁর অনন্তস্বরূপ আমার চেতনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সেই বোধের অগ্নিবীর্যে আমার সমস্ত আধারকে যোগাগ্নিময় করে তুলতে পারে।

তাঁর স্বরূপের চেতনা আমাদের মাঝে তিনভাবে ফুটতে পারে। কিন্তু জানতে হবে সমস্ত অনুভবই হল নির্বিশেষ অনন্তের অনুভব—সমস্ত সীমার অতীত এক অসীমের অনুভব। নাম-রূপ আছে, থাক্; কিন্তু জানব, তা অনাম অরূপেরই বিভূতি। জেনে নাম-রূপের সঙ্গে কখনও জড়িয়ে যাব না। আকাশে যেমন তারা ফোটে, তেমনি অনন্তের বুকে ফুটছে সান্তের মেলা। তারাকে যখন দেখছি, সেই সঙ্গে আকাশকেও দেখছি—আকাশকে বাদ দিয়ে তারাকে দেখা অসম্ভব। প্রাকৃত-মনের দৃষ্টিতেও জানতে হবে এই সীমাহীন দর্শনের ঔদার্য। অসীমের প্রাতিভ-সংবিৎ (intuitive experience) আগে, তারপর সীমার সংবিৎ—এমনি করে প্রাকৃত-দৃষ্টির বিপর্যয় ঘটাতে হবে। তবেই ঘটে-ঘটে তাঁকে দেখতে পাবে—সব দর্শনই হবে তাঁর দর্শন, সব স্পর্শই তাঁর স্পর্শ, সব বোধই তাঁর বোধ।

আত্মচৈতন্যকে ভিত্তি করে এই আনন্ত্যের বোধ আনতে হবে—এই তার এক রূপ। 'মদাত্মা সর্বভূতাত্মা' এই হল তার মন্ত্র। চৈতন্যের প্রত্যক্ষ অনুভব হয় আমাতেই বা আত্মাতেই। প্রাকৃত-ভূমিতে এই আত্মচৈতন্যের চারদিকে থাকে অহংএর বেড়া। আমি তখন আমাকেই একান্ত করে দেখি, অপরকে দেখতে পাই না বা চাই না। অথচ আমার মাঝে প্রেম বা

বৈরাগ্যের অঙ্কুরও থাকে, যা আমাকে 'আমি'র গণ্ডির বাইরে টেনে আনে। আমার সঙ্গে অপরের ভেদ তখন লুপ্ত হয়ে যায়, আমার আত্মচৈতন্যের বিস্ফারণ ঘটে। এই বিস্ফারণ যদি প্রশান্ত ও স্বচ্ছ হয়, অহমিকার লেশমাত্রও যদি তাতে না থাকে, তাহলে আত্মচৈতন্যের এক নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকায় অনুভব হয়—আত্মাতেই বিশ্ব বা আত্মাই বিশ্ব, আমাতেই বিশ্ব বা আমিই বিশ্ব। সে-আমি অবশ্য প্রাকৃত গণ্ডি অহং নয়, সর্বোপাধিনির্মুক্ত এক অনন্ত 'শিবোঽহম্'।

এ-অনুভব প্রত্যক্-বৃত্ত (subjective), এবং অনেকের পক্ষে স্বাভাবিকও—বিশেষত জ্ঞানযোগীর পক্ষে। আবার আনন্তের একটা পরাক্-বৃত্ত (objective) অনুভবও আছে। তখন তাঁকে দেখি প্রথম আমার মাঝে নয়, বিশ্বের মাঝে। বিশ্ব এক অনন্ত অমৃতজ্যোতির বিভূতি, রূপে-রূপে তাঁরই প্রতিরূপ। আকাশের আলোঝলমল চেতনা তিনি—সবার মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সব-কিছু ছেয়ে আছেন। যেমন আছেন বাইরে, তেমনি আছেন অন্তরে। অসীম সমুদ্রের বুকে যেমন তরঙ্গ ফেনা আর বুদ্‌বুদ, তেমনি তাঁর মাঝে তাঁরই সত্তার আমার সত্তার খেলা আমার প্রাণন আমার মনন। আমার সবটাই তিনি। 'আমার দেহ-দেহী সকল তুমি, তবে কি আর রইলাম আমি।' আমি কোথাও নাই, আমার আমিটুকুও তোমারই এক বিচিত্র তুমি, অরূপের অপরূপ রূপায়ণ।

আগের অনুভবটি যদি বলি পুরুষের, তাহলে এ-অনুভব প্রকৃতির। একটির মূলে যেমন জ্ঞানের সংস্কার, তেমনি আরেকটির মূলে ভক্তির। কিন্তু দুটি অনুভব অন্যোন্যসঙ্গত। তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি—সত্তার দ্বিদলে তাঁর যুগনদ্ধ প্রকাশ।

অনুভবের এই বিভঙ্গকে ছাপিয়ে আনন্তের আর-একটা সর্বনাশা অনুভব আছে, যাকে বলা চলে সব অনুভবের চূড়ান্ত। অনুভবের কোনও উপাধি যখন থাকে না, তখন তা পর্যবসিত হয় বিশুদ্ধ সত্তার অনুভূতিতে। সে-অনুভব গাঢ়তর হলে সত্তারও বিলয় হয় এক অনুপাখ্য (ineffable) অসত্তায়। 'পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে শেষপর্যন্ত আর কিছুই থাকে না।' রঙ্গমঞ্চ শূন্য হয়ে গেল যখন, তখন থাকল শুধু একটি দীপ—যার আলোয় অভিনয় চলছিল। শেষকালে ঐ দীপটিও নিবে গেল। কি থাকল? কিছুই না। এই হল শূন্য বা নির্বাণ—নেতিপ্রত্যয়ের চরম অনুভব। এর ঊর্ধ্বে আর কিছুই নাই। হয়তো এর পরে আর মানুষ ফিরে আসে না। 'শোনা যায়, কালাপানিতে গেলে আর জাহাজ ফেরে না।' যদি কেউ ফিরে আসে, তার কাছে জগৎটা হয় স্বপ্নবৎ। যে-চিত্তের আভাস তখনও থাকে, তার মাঝে নামে এক হিমশৃঙ্গের শান্তির শৈত্য।

'সব আমি' 'সব তুমি' অথবা 'সব শূন্য'—এই তিনটি হল অনন্তের তিনটি বিভঙ্গ। চেতনার উজান বেয়ে তাঁর স্বরূপের পাই এই পরিচয়। এ-পরিচয় মৌল, তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে এও মানতে হবে, এ তাঁর স্থাণুরূপ—এখন তা অতিষ্ঠাই (transcendent) হ'ক বা প্রতিষ্ঠাই (immanent) হ'ক। এতে

তাঁকে পেলাম 'প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্'-রূপে। কিন্তু শিব তো অশক্ত নন, তিনি যে নিত্যশক্তিযুক্ত। শক্তিতে যেমন তিনি আপনাতে আপনি আছেন, তেমনি আবার অনন্ত সম্ভূতিতে (Becoming) বিচ্ছুরিত হচ্ছেন। বলতে পারি, একটা তাঁর স্বরূপ (transcendent) লক্ষণ, আরেকটা তটস্থ (instrumental) লক্ষণ। স্বরূপে জানলে মূলকে জানি, আর তটস্থ বিভূতি দিয়ে জানলে স্থূলকে জানি। কিন্তু সবই যখন তিনি, তখন মূলে আর স্থূলে স্বরূপে আর তটস্থে তো কোনও বিরোধ নাই। যদি মূলকে বাদ দিয়ে স্থূলকে জানি, তবে সেটা নিশ্চয় অবিদ্যা। কিন্তু স্থূলকে বাদ দিয়ে মূলকে জানাও তো অবিদ্যা। মূলকে ছেনে তারই আলোকে যদি স্থূলকে জানি, তাহলে রিক্ততার পটভূমিতে ফোটে জ্ঞানের ঐশ্বর্য। আর সেই জানাতেই পাই তাঁর অখণ্ড স্বরূপের পরিচয়।

যজ্ঞেশ্বরকে যেমন জানতে হবে তাঁর স্বরূপে, তেমনি জানতে হবে তাঁর সম্ভূতিতে। স্বরূপ যেমন অধিষ্ঠান, সম্ভূতি তেমনি অধিষ্ঠিত। অধিষ্ঠান যদি সত্য হয়, তাহলে অধিষ্ঠিতও সত্য। পরমার্থসৎ যেমন সত্য, তেমনি তাঁর প্রতিরূপ জগৎও সত্য, 'সন্মূলাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।' মিথ্যা হচ্ছে এই কথাটা না জানা। 'অদ্বৈতের অর্থ হল, শুধু একই আছে, দুই নাই'—এ হল তর্কবুদ্ধির বিচার। কিন্তু মননীয়ার হৃদয় বলে, 'দুয়ে যেখানে এক হয়ে আছে, তাকে বলি অদ্বৈত।'

এই অদ্বৈতদৃষ্টি নিয়ে লোকোত্তরের ভূমিকায় লোকাতীতের পরিচয় নিতে হবে। তাহলেই যজ্ঞেশ্বরকে পুরাপুরি জানতে পারব। তখন দেখব, উজানপথে চলতে গিয়ে প্রথম একটা দ্বৈতভাবের সৃষ্টি হচ্ছে, আর যুগলের একটিকে বাদ দিয়ে আমরা অদ্বৈত-প্রতিষ্ঠা করছি। কিন্তু ভাটিয়ে এসে দেখছি, দুয়ে মিলে আবার এক হয়ে যাচ্ছে।

যজ্ঞেশ্বরের স্বরূপের পরিচয় নিতে গিয়ে দেখেছিলাম,—কারও অনুভবে তিনি সৎ, কারও-বা অনুভবে অসৎ। বলতে পারি, তাঁর সৎ-স্বরূপেরও আবার তিনটি বিভঙ্গ—তিনি ব্রহ্ম, তিনি পুরুষ, তিনি ঈশ্বর। তিনটি বিভঙ্গই শক্তিযুক্ত অতএব যুগনদ্ধ। এই যুগনদ্ধ বিভঙ্গের সংজ্ঞা হল—ব্রহ্ম-মায়া, পুরুষ-প্রকৃতি, ঈশ্বর-শক্তি। প্রথম দৃষ্টিতে আমরা শক্তিকে ছেড়ে শক্তিমানের উপর জোর দিই বেশী—কেননা প্রাকৃত-ভূমিতে আমরা জড়িয়ে আছি শক্তির জালে, তার বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়াই হয় আমাদের পুরুষার্থ। কিন্তু মুক্তচেতনায় শক্তির যথার্থরূপ যখন ফুটে ওঠে, তখন দেখি শক্তি-শক্তিমান অভেদ। দ্বৈতের দ্বিধা হতে উত্তীর্ণ হয়ে তখন আমরা প্রতিষ্ঠিত হই সত্যকার অদ্বৈতবোধে।

একটি যুগনদ্ধ বিভঙ্গ হল ব্রহ্ম-মায়া। ব্রহ্মের পরিচয় হল তিনি অনন্ত সত্তা—যা এখানকার সব-কিছুর অধিষ্ঠান; তিনি অনন্ত চৈতন্য—এখানকার সান্তচৈতন্য যার ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া; তিনি অনন্ত আনন্দ—এখানকার সুখ যার স্ফুলিঙ্গমাত্র। অসীম দেশে এবং শাশ্বত কালে তাঁর বৃহৎ বিস্তার। তাঁর ভাবনায় এক অখণ্ড অসীম শাশ্বত সংবিতের উদয় হয়। এই সংবিৎসিদ্ধিই আমাদের পুরুষার্থ।

এই সংবিৎ প্রথম জাগে কাত্তিরেকমুখে অর্থাৎ ব্রহ্মকে বোধ হয় যেন জগৎ-ছাড়া। ব্রহ্ম সৎ চিৎ আনন্দ, আর জগতে চেতনা ও আনন্দের প্রকাশ অনিত্য আচ্ছন্ন এবং বিড়ম্বিত। ধ্যানের গভীরে যে-সত্যকে প্রত্যক্ষ করি, জাগ্রৎ ব্যবহারে তার দেখা পাই না। বাধ্য হয়ে তখন সত্যতার তারতম্য স্বীকার করতে হয়। বলি, ব্রহ্মের সত্যতা পরমার্থিক, আর জগতের ব্যাবহারিক সত্যতা আপেক্ষিক। ব্রহ্মই জগৎকারণ, কিন্তু কারণের সঙ্গে কার্যের চেহারার মিল নাই। কেন এমন হয় তা বুঝতে পারি না, বলি মায়ার খেলা। ব্রহ্মের বোধ বিদ্যা, আর জগতের বোধ অবিদ্যা। বিদ্যা আর অবিদ্যা যেন আলো আর আঁধারের মত—দুয়ে নিত্য বিরোধ। আমি আঁধারে থাকতে চাই না, চাই আলো।

বিদ্যা আর অবিদ্যার বিরোধটা আমরা আলো-আঁধারের উপমা দিয়ে বুঝতে চাই। কিন্তু কথাটা তাতে পরিষ্কার হয় না। এখানে আলো আর ওখানে আঁধার—এইভাবে যদি দেখি, তাহলে দুয়ে বিরোধ আছে মানতেই হবে। কিন্তু এটা হল বস্তুস্থিতির দিক হতে বিচার করা। আবার, যেমন স্থিতি আছে, তেমনি গতিও তো আছে—সেখানে দেখি শক্তির প্রকাশ। শেষরাত্রে দেখি, অন্ধকার ক্রমে তরল হয়ে আলো ফুটছে। তখন দুয়ের বিরোধের চেহারাটা আরেকরকম হয়ে দেখা দেয়। যদি আলোর শক্তিকে বিশ্বাস করি, অন্ধকারকে আর ডরাই না।

তবুও পৃথিবীতে যতদিন থাকি, দিন-রাতের আবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে আলো-আঁধারের একটা পর্যায় থেকেই যায়। কিন্তু একবার যদি সূর্যে যেতে পারি, তাহলে এই পর্যায়ের ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভব হয়। ব্রহ্মের মায়াতে যে ছায়াতপের লীলা,—তার ছায়ার দিকটাকে বড় করে দেখা তাই ঠিক নয়। আমার ঔপার্থের (value) বোধ বলছে, ছায়ার সত্যের চাইতে আতপের সত্যই বড়। বড় সত্য দিয়ে ছোট সত্যকে বিচার করতে পারলেই বিচার পরম-পুরুষার্থের অনুকূল অতএব যথার্থ হয়। তাই অবিদ্যাকে বুঝতে চাইব বিদ্যা দিয়ে, তাহলেই তার রহস্য বুঝতে পারব এবং বিদ্যা আর অবিদ্যার বিরোধও তখন মিটে যাবে। ব্রহ্মের মায়াশক্তিকে তখন বলব বিদ্যারই শক্তি। অবিদ্যা তার কুক্ষিগত এবং বিদ্যার প্রশাসনেই তার গতি নিয়ন্ত্রিত। এইটি যখন বুঝতে পারি, তখন অবিদ্যা হতে শুধু উত্তীর্ণই হই না, তাকে বিদ্যার অনুকূলে ব্যবহারও করতে পারি। আগেরটা বিদ্যার মুক্তি, আর পরেরটা বিদ্যার সিদ্ধি। জ্ঞানের স্ফুরণে মুক্তি, আর শক্তির স্ফুরণে সিদ্ধি। জ্ঞান আর শক্তি, ব্রহ্ম আর মায়া যুগনদ্ধ অন্বয়সত্তা।

ব্রহ্ম আর মায়ার মত আর-একটি বিতন্ত্র হচ্ছে পুরুষ আর প্রকৃতি। এখানেও প্রথমে সাধকের মনে দেখা দেয় একটা দ্বৈতের দৃষ্টি, তার অনুভূতি গভীরতর হলে তা পর্যবসিত হয় অদ্বৈতভাবনায়। ব্রহ্মের বোধ আসে চেতনাকে আকাশের মত ছড়িয়ে দিয়ে; আর পুরুষের বোধ আসে তাকে নক্ষত্রের মত গুটিয়ে নিয়ে। প্রথমটি চরমে এনে দেয় মহতোমহীয়ানের বোধ, দ্বিতীয়টি অণোরণীয়ানের। ব্রহ্মের আত্মশক্তি যেমন মায়া, তেমনি পুরুষের আত্মশক্তি

প্রকৃতি। মায়ার খেলা বিশ্বে, আর প্রকৃতির খেলা ব্যক্তিতে। অবশ্য দুয়ের মাঝে একটা ওতপ্রোত সম্বন্ধ আছে, কেননা ব্যক্তি আর বিশ্ব অন্যোন্যনির্ভর।

যদি আত্মভাবনা দিয়ে সাধনা শুরু করি, তাহলে প্রথমেই দেখি আমার সঙ্গে না পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির বিরোধ। আমারই প্রকৃতি, অথচ সে আমার বশে নাই। আমার দেহ অসাড়, প্রাণ অতৃপ্ত, ইন্দ্রিয় দুর্বার, মন চঞ্চল—এ-ঝামেলার যেন আর অন্ত নাই। অথচ আমি চাইছি আমারই মাঝে এমন-একটা কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে প্রতিষ্ঠিত থেকে এই নৈরাজ্যকে স্বারাজ্যে রূপান্তরিত করতে পারি। প্রথমেই লক্ষ্য করি, কোনও ক্রিয়াকে বশে আনতে হলে তার ঊর্ধ্বে থাকতে হয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে গেলে চলে না। চাকার সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে, সে চালক হতে পারে না—সে চাকার খেয়ালে চলে, চাকা তার ইচ্ছায় চলে না। তাই প্রকৃতি-প্রশাসনের প্রথম উপায় হল প্রকৃতি থেকে তফাত থাকা। তাকে বলে বিবেক। প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক হল সাংখ্যসাধনা বা আত্মযোগের গোড়ার কথা।

বিবেকের শক্তি চলে নিরোধের দিকে, নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার দিকে। প্রথমটায় প্রকৃতিকে বাগ মানাতে গিয়ে তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে হয়। প্রকৃতি যা বলবে তা-ই করব, তা হবে না ; তার প্রত্যেকটা প্ররোচনায় আমি যন্ত্রের মত সায় দেব না। রাশ টেনে তার উদ্দাম গতিকে আমি সংযত করব। সংযম বিবেক-সাধনার ভিত্তি।

সংযমে নিজের শক্তি বাড়ে, নিজের উপর বিশ্বাস আসে। সঙ্গে-সঙ্গে আসে একটা প্রসন্নতা। এই প্রসন্ন এবং সদর্থ আত্মপ্রত্যয় নিয়েই প্রথম নিজেকে পুরুষ বলে চিনতে পারি। সত্যকার পুরুষের কাছে প্রকৃতিও যেন অন্যরকম হয়ে যায়, আগের মত অতটা খামখেয়ালি তার আর থাকে না। তবুও সংস্কার একেবারে যায় না। পৃথিবীর উপরটা ঠাণ্ডা, কিন্তু ভিতরে তার তাপ আছে। মাঝে-মাঝে অগ্ন্যুৎপাতে আর ভূমিকম্পে তা প্রকাশ পায়। তবে আত্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষকে তা বিচলিত করে না।

এই প্রথম তিনি অনুভব করেন, প্রকৃতির ক্রিয়াগুলি যান্ত্রিক। দুনিয়া জুড়ে এই যন্ত্রের ক্রিয়া চলছে। তিনি তাতে যোগ দিতেও পারেন, না দিতেও পারেন। না দিলেই বেশ লাগে। তিনি উপশান্ত, উপদ্রষ্টা—সাক্ষী থেকে প্রকৃতির খেলা দেখে যাচ্ছেন। দুনিয়াতে তার নানারকম বেয়াড়াপনা চলছে, হয়তো চলবেই। তা চলুক। কিন্তু তাঁর ভিতরটা প্রশান্ত। তিনি আপনাতে আপনি আছেন—তিনি একা, তিনি নিঃসঙ্গ। সাংখ্য-যোগের ভাষায় এ হল পুরুষের স্বরূপস্থিতি বা কৈবল্য। প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ বা বিবেকটা এমনি করে চরমে পৌঁছয়।

কিন্তু অনুভবের এইটিই চরম নয়। যার থেকে বিবিক্ত বা তফাত হয়েছি, সে হল অপরা-প্রকৃতি। অপরা-প্রকৃতিও চিৎশক্তিই—কিন্তু চেতনা সেখানে মূঢ় এবং চঞ্চল। যেমন চিমনি-ছাড়া লণ্ঠনের আলো। আলোর শিখা তখন ধূমল আর চঞ্চল। কিন্তু লণ্ঠনে চিমনি পরিয়ে দিলে সেই শিখাই অধূমক স্থির জ্যোতি নিয়ে জ্বলতে থাকে। স্বরূপস্থিত

কেবল পুরুষের চেতনাও তা-ই। তারও আলো আছে, তাপ আছে। এই তাঁর আত্ম-প্রকৃতির বা আত্মশক্তির রূপ। একে বলতে পারি পরা-প্রকৃতি। অপরা-প্রকৃতিই সংহত ও বিশুদ্ধ হয়ে পরা-প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, আত্মজ্যোতির অচঞ্চল অধূমক শিখা হয়ে জ্বলছে পুরুষের হৃদয়ে। প্রকৃতি পুরুষকে ছেড়ে যায়নি, আরও নিবিড় হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে। সতী হয়েছে শিবের নিত্যসঙ্গতা। আবার দেখছি, পুরুষ আর প্রকৃতি এক যুগনদ্ধ অন্বয়সত্তা। এখানেও আগে অপরা-প্রকৃতি হতে মুক্তি, তারপর পরা-প্রকৃতির সিদ্ধি ঐশ্বর্য বা বিভূতি। আলো আর তাপের বিকিরণ তখনও চলছে এবং আরও সুষম স্বাচ্ছন্দ্যেই চলছে।

আরেকটি যুগনদ্ধ বিভঙ্গ হল ঈশ্বর-শক্তি। আগের দুটি মিথুন হতে এটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে গোড়াতেই দুয়ের সম্পর্কটা মেলামেশার—ছাড়াছাড়ির নয়। বেদান্তের মায়া-বাদে আর সাংখ্যের প্রকৃতিবাদে মায়া এবং প্রকৃতি যথাক্রমে ব্রহ্ম এবং পুরুষের বিরোধী তত্ত্ব। কিন্তু তন্ত্রের শক্তিবাদে এই বিরোধের ছায়া পড়েনি। শক্তিমান আর শক্তি অভেদ—এই সিদ্ধান্তই তন্ত্রের ভিত্তি। উপমা দেওয়া হয়, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। কল্পনায় দুটিকে আলাদা-আলাদা করে ভাবতে পারি, কিন্তু বাস্তবে পৃথক করতে পারি না। যেখানে শিব সেখানেই শক্তি, যেখানে শক্তি সেখানেই শিব—এটা যে একটা সহজ অনুভবের কথা। ভালবাসায় স্ত্রী-পুরুষ এক হয়ে যায়। বিচার করলে দেখি, দুটি আলাদা-আলাদা তত্ত্ব, দুয়ে গরমিল কত বেশী। কিন্তু সংসারটা চলছে দুয়ের গরমিলটাকে বড় করে নয়, যেখানে দুটিতে এক হয়েছে সেই সামরস্যকেই মুখ্য করে। দুটিতে যেখানে এক হয়েছে, সেখানে তারা পরস্পরের পরিপূরক—যেন গভীরের এক অন্বয়সত্তারই দুটি বিভঙ্গ, একটিকে ছেড়ে আরেকটির কোনও অর্থ হয় না। যেমন দেহ আর আত্মা। দুটিতে মিলে এক অখণ্ড সত্তা। আত্মার প্রকাশ দেহে, দেহের আশ্রয় আত্মায়। এই অন্যোন্যভাবটি (mutuality) যতক্ষণ বজায় আছে, ততক্ষণই জীবন। আর জীবনের অনুভবই হল সকল অনুভবের সার। মরণের অনুভব যদি এই জীবনেই জোটে, তবেই নেতিবাদেরও সার্থকতা। অনুভবমাত্রেই জীবনধর্মী। অনুভব শিব, জীবন শক্তি; অথবা অনুভব বিষ্ণু, জীবন শ্রী। দুটিকে কি আলাদা করা যায়? থাকলে দুটিই আছে, না থাকলে কোনটিই নাই। যখন কিছুই থাকে না, তখনকার কথা ভাবছি এখানেই বসে—এটা একটা বস্তুশূন্য বিকল্প (unreal mental construction), কিনা মনের মায়া। ঈশ্বর-শক্তির এই যুগনদ্ধ তত্ত্বটি ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচেতনাকে আবিষ্ট করে আছে যুগ-যুগ ধরে, কেননা এটি একটি সহজ-বুদ্ধির কথা। মায়াকে যেই সে মা বলেছে, অমনি তার সঙ্গে তার সকল বিরোধের অবসান হয়েছে। মা-ই বেঁধেছেন, আবার মা-ই বাঁধন খুলে দেবেন—কেননা মা কল্যাণময়ী। বাবাকে চিনিয়ে দেবেন মা-ই, কেননা কেবল তিনিই তাঁকে চেনেন তাঁর হৃদয়েশ্বরী হয়ে। আমি শুধু মাকে জানি তাঁর হৃদয়ের সুধাসমুদ্রে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে। যক্ষ কে, তা

অগ্নি জানতে পারলেন না, বায়ু পারলেন না, ইন্দ্রও না। অকস্মাৎ আকাশে ফুটে উঠল হৈমবতী উমার রূপ। তিনি জানিয়ে দিলেন, ব্রহ্ম এই। এগুলি আপাতর সাধারণ সহজ অনুভবের কথা, ভারতবর্ষের প্রাণের কথা।

তবে এই যুগনদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যেও একটা দ্বিধার চিড় কখনও-কখনও দেখা দেয়। একসময় হয়তো মনে হয় শিব বড়, আরেকসময় শক্তি বড়। তবে এ-দ্বিধা স্থায়ী হয় না। সত্য বলতে, বেদান্তের ব্রহ্মবাদ আর সাংখ্যের পুরুষবাদের সার্থক পর্যবসান তন্ত্রের এই শক্ত্যা-লিঙ্গিতবিগ্রহ-মহেশ্বরবাদে।

তারপর আরও একটি যুগনদ্ধ আছে—শূন্যতা আর বিগ্রহের দ্বিদল। পরমতত্ত্বকে যদি বলি ব্রহ্ম পুরুষ ঈশ্বর অথবা ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, তাহলে তার সৎ-রূপের পরিচয় দিই। কিন্তু সৎএরও উজানে আছে অসৎ, এমন-একটা ভূমি আছে যেখানে কিছুই নাই। এই নাস্তিত্বের নানা নাম—অসৎ, শূন্য, অসম্ভূতি, অব্যাকৃত ইত্যাদি। আর তার অনুভবের নাম নির্বাণ। নির্বাণ লোকোত্তর।

কিন্তু লোকোত্তরের উলটাপিঠেই আবার লোক। লোকোত্তরে কিছুই নাই, আবার লোকে-লোকে আছে সবই। এই সবকে জড়িয়ে নিয়ে বলতে পারি 'এক'—এক ব্রহ্ম, এক পরমাত্মা অথবা এক ঈশ্বর। ঐ একের মধ্যে আবার পুঞ্জিত হয়ে আছে 'বহু'—যেমন একটা মৌচাকে অনেকগুলি ঘরের মত, একই দেহে বহু কোষের মত। প্রত্যেকটি কোষ একটি ব্যক্তি, যেন একটি পুরুষ। আবার সব ব্যক্তি জড়িয়ে এক 'মহা ব্যক্তি', উপনিষদের ভাষায় 'পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণম্'। আবার আদিত্যের ওপারে মহাশূন্য। শূন্য—এক—বহু। শূন্য নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal); ব্যক্তিভাবনা (Personality) আছে একে আর বহুতে। এক আর বহুর মাঝে শক্তিকে নিয়ে আছে দ্বন্দ্বের খেলা বা নিধুনের লীলা, যার কথা আগেই বলেছি। তাহলে পরামার্থতত্ত্বের রূপায়ণের একটা ছক দাঁড়ায়: অবচন—একবচন—দ্বিবচন—বহুবচন। যেখানে বহুবচন, সেখানে ব্যক্তির বিগ্রহ; যেখানে অবচন, সেখানে ব্যক্তিও নাই বিগ্রহও নাই। আর মাঝখানটায় বিগ্রহ না থাকলেও ব্যক্তি আছে।

এখন প্রশ্ন হবে, অবিগ্রহে আর বিগ্রহে, নৈর্ব্যক্তিকতায় আর ব্যক্তিভাবনায় কি বিরোধ আছে? আপাতত মনে হয় আছে। কিন্তু আসলে তা নাই। বিগ্রহ থেকে অবিগ্রহের দিকে যখন যাই তখন দুয়ে বিরোধ দেখি—অবিগ্রহ তখন বিগ্রহের প্রতিষেধ। এটা হল প্রলয়ের দিক। কিন্তু অবিগ্রহে গিয়ে দেখি, বিগ্রহের সে-ই উৎস। কবির ভাষায় 'এঁকে-বেঁকে আকার এঁকে চলছে নিরাকার।' নরনীয়া বলছেন: প্রথম হ্রস্ব-ই দিয়ে বানান করলাম 'নিরাকার' তারপর দীর্ঘ-ঈ দিয়ে করলাম 'নীরাকার'; এখন আবার দেখছি 'নরাকার'। সব বানানই ঠিক।

অরূপ রূপ ধরছেন, তার নাম সৃষ্টি। যেমন আগুন থেকে ঠিকরে পড়ছে ফুলকি,

আকাশের নিকষকালো ফুটছে তারার চুনকি হয়ে। অসীম সীমার বাঁধন পরলেন বিগ্রহে। মনে হয়, যেন খাটো হয়ে গেলেন। কিন্তু সত্যি কি তা-ই? খাটো হলেন, না ঘন হলেন? অসীমের শক্তি পরমাণুতে সংহত হল। শক্তি সেখানে নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু তার বিস্ফোরণ কী প্রচণ্ড, তা বুঝতে পারি পরমাণুটিকে ভাঙলে।

বিগ্রহে শক্তি ঘনীভূত হচ্ছে—এই হল সৃষ্টির রহস্য। ঘনীভূত শক্তির মুক্তিই হল পুরুষার্থ। শিব শক্তিকে নিগৃহীত করে জীববিগ্রহ হয়েছেন। শক্তি যখন মুক্তি পেল, তখন জীব আবার হলেন শিব। কিন্তু শিব হতে গিয়ে কি হারাণো হয়ে গেলেন? তা নয়। জীববিগ্রহই হল শিববিগ্রহ—'কেবলম্', অথচ 'জ্ঞানমূর্তিম্'। এই হওয়াই তো স্বাভাবিক, কেননা সবই যে শিব—শক্তিও, জীবও, বিগ্রহও।

উজানপথে চলছি যখন, তখন তাঁকে বলছি 'অকায়ম্-অব্রণম্'। আবার ভাটার বুকে দাঁড়িয়ে প্রথম বলছি 'স্বয়ম্ভূঃ পরিভূঃ' আরও ভাটিয়ে এসে বলছি 'সর্বদেবময়ঃ'; আবার শেষে এই পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে বলছি, এই যে তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখছি, তুমি 'মানুষীং তনুমাশ্রিতঃ'—এসেছ অবতার হয়ে, গুরু হয়ে, মনের মানুষ হয়ে। যদি না আসতে, আমার জগৎ মিথ্যা হয়ে যেত, আমার অস্তিত্বের কোনও তাৎপর্যই থাকত না। এ জীবনের ভার তাহলে বইতাম কি করে?

অবিগ্রহের বিগ্রহ হওয়া—এ তর্কের কথা নয়, গীতির অনুভূতির কথা, যে-অনুভূতিতে আধারের রূপান্তর ঘটে, নূনয় বিগ্রহ চিন্ময় হয়।

* * *

এই হল তাহলে যজ্ঞেশ্বরের পরিচয়। দেখলাম তিনি চতুষ্পাৎ। তিনি শুক্ল-মায়া, পুরুষ-প্রকৃতি, ঈশ্বর-শক্তি, অবিগ্রহ-সবিগ্রহ। তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দঘন-বিগ্রহ পুরুষোত্তম। তিনি নিত্যশক্তিযুক্ত। আমার যজ্ঞতপস্যার তিনিই ভোক্তা।

যজ্ঞেশ্বরকে পাওয়াই হল জীবনযজ্ঞের লক্ষ্য। তাঁকে পেতে চাই পূর্ণরূপে—কিছু বাদসাদ দিয়ে পাওয়া নয়, একেবারে চার-পো পাওয়া, তাঁতে মিশে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে তাঁকে পাওয়া।

তার তিনটি ধাপ। প্রথম তাঁর স্বরূপসত্তার সঙ্গে এক হয়ে তাঁকে পাওয়া। এই হল জ্ঞানযোগীর সাধ্য—ফল অবিদ্যা হতে মুক্তি। তারপর তাঁতে নিত্যস্থিতির দ্বারা তাঁর স্বরূপানন্দের আস্বাদন। এই হল ভক্তিযোগের সাধ্য—ফল ভুক্তি। আর অবশেষে তাঁর স্বরূপশক্তিতে অবগাহন করে আত্মপ্রকৃতির রূপান্তর দ্বারা তাঁর সাধর্ম্যলাভ করা। এই হল কর্মযোগীর পরম পুরুষার্থ—ফল শক্তি। মুক্তি ভুক্তি আর শক্তি—এই তিনটিই পূর্ণযোগীর অখণ্ড সাধ্য। তাঁকে পাই, তাঁতে থাকি, থেকে তাঁরই কাজ করি—এতেই জীবনের পূর্ণতা। নিত্যযুক্ত থেকে দিব্যকর্মের যে-সাধনা, তা-ই আধারের রূপান্তরকে ক্ষিপ্র এবং সহজ করে। এই হল কর্মযোগের উত্তম রহস্য।

সব সাধনাই প্রথমটায় হল উজিয়ে যাওয়া, তারপর এখানে ভাটিয়ে আসা। ওখানে যা পেলাম, তাকে যদি এখানে প্রতিষ্ঠা না করতে পারি, তাহলে বুঝতে হবে পাওয়া সম্পূর্ণ হয়নি। ওখানকার ভাব এখানে ধরে রাখাটাই কঠিন। অথচ তাতেই শক্তির পরিচয়। আর শক্তি ছাড়া মুক্তি বা ভুক্তির সাধনা কোনটাই সার্থক হয় না।

ধৈর্য ধরে সাধনা করে যেতে হবে দীর্ঘদিন ধরে—'অনিমিষেন চেতসা'। মনমরা ভাব যেন কিছুতেই না আসে। আর চাই আন্তরিকতা। আমার বাইরের আমিটা একটা নকল আমি। আসল আমি রয়েছে অন্তরের গভীরে—সে কেবল তাঁকেই চায়, আর কাউকে নয়। তার বোধকে যত স্পষ্ট করে তুলতে পারব, ততই সাধনা সহজ হবে।

এখন উৎকর্ণ হয়ে আছি, কখন বাঁশি বাজবে। চারদিকে কোলাহল, কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। একটু যদি নিজের মাঝে ঢিতিয়ে যেতে পারি, তখন শুনি বাঁশী তো বাজছেই, চিরকাল ধরেই যে বাজছে। আমার চাওয়া ফোটবার আগেই যে তিনি আমায় চেয়ে রয়েছেন।

তাঁর এই স্বয়ংবরণকে যখন বুঝতে পারি, তখন সাধনা অভয় হয়, অনায়াস হয়।

[ক্রমশ]

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

নববর্ষের বাণীটির অর্থ ?

উত্তর : তোমাদের ক্লাসে একবার আমি বলেছিলাম প্রকৃতির অন্তহীন প্রাচুর্যের কথা, কেমন ক'রে সেই অশেষ সৃষ্টিকারিণী অগংখ্য রকমের জিনিস গড়ে' তাদের একত্রে মিশিয়ে দিতে থাকে, আবার আলাদা আলাদা ক'রে নিয়ে আবার নতুন ক'রে গড়ে, নিত্যই এমনি একবার ভাঙে আর একবার গড়তে থাকে, এই ভাবে পুরানোকে ভেঙে ভেঙে নিত্য নতুন জিনিসে পরিণত করাই তার কাজ। আরো আমি বলেছিলাম, এ যেন এক বিরাট কলাইয়ের মধ্যে রান্না চাপানোর মতো, বারে বারে খুন্তি নাড়া হচ্ছে আর তার থেকে নতুন কিছু জিনিস রান্না হয়ে বেরিয়ে আসছে। আর কোনোটি যদি বন:পুত না হলো, অমনি সেটিকে বাতিল ক'রে আবার নতুন রকমের জিনিস বানানো হচ্ছে। প্রকৃতির কাছে এমনি একটি দুটি বা একশো রকমের সৃষ্টি বাতিল হয়ে গেলেও কিছু যায় আসে না গড়তে গড়তে কত হাজার হাজার রকমের জিনিস গড়া হয়ে গেছে, আর তা কত হাজার বা লক্ষ বছর ধরে, তাতেও তার কিছু ক্লান্তি আসে না, কারণ তার সামনে তো পড়ে রয়েছে অনন্তকালের অবসর। তাই তার কিছুমাত্র তাড়াহুড়ো নেই, এতে বরং সে আমোদই পাচ্ছে। যদি তার কাছে বলতে যাও যে অমুক জিনিসটা একটু তাড়াতাড়ি দেয়ে ফেল, তাহ'লে সে তার নিজের একই উত্তর শুনিয়ে দেবে "কেন বাপু, এত তাড়া কিসের ? এই তো বেশ হচ্ছে।"

তোমাদের কাছে এই সব কথা বলে যাবার পরে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রকৃতির এই সব লীলার অন্দরমহলের মধ্যে ঢুকে দেখবার জন্য আমি তার সঙ্গে একেবারে একাত্ম হয়ে গেলাম। সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যাওয়াতে তার কাছ থেকেও একটা আহ্বান এলো, পরস্পরের মধ্যে নিবিড় একটা অন্তরঙ্গতা ঘনে উঠল ; তার সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হতে হতে শেষ পর্যন্ত এলো এক অনুভূতি, ৮ই নভেম্বর তারিখে।

দেখলাম যে প্রকৃতি হঠাৎ সম্প্রতির ব্যাপারটা যেন বুঝে নিয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে, এই যে নতুন রকমের চেতনা সদ্য নেমে এসেছে, এ প্রকৃতিকে কখনো প্রত্যাখ্যান বা তাচ্ছিল্য করবে না, বরং সম্পূর্ণভাবেই স্বীকার ক'রে নেবে। সে বুঝে নিলে যে এই নতুন ধরণের আধ্যাত্মিকতা পার্থিব জীবনকে এড়িয়ে যেতে চায় না, প্রকৃতির জগৎজোড়া ক্রিয়া থেকেও সরে দাঁড়াতে চায় না, বরং প্রকৃতির সকল রকমের ক্রিয়াবৃত্তিকে মেনে নিয়ে অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিতে চায়। এই অতিমানস তাকে খর্ব করতে আসেনি, এসেছে সম্পূর্ণ করতে।

তখন সবের উপরকার নূল মহাসত্য থেকে আদেশ এলো "জাগো জাগো প্রকৃতি, এবারকার লীলায় সর্বৈশ সহযোগিতার সঙ্গে সানন্দে তুমিও যোগ দাও।" আর প্রকৃতিও অমনি সমগ্রভাবে সাড়া দিয়ে মহা আনন্দে মেতে উঠে বললে "প্রস্তুত প্রস্তুত. এতে আমি নিশ্চয়ই সহযোগিতা করবো।" নিরবধি কালকে সামনে রেখে প্রকৃতি দেখলে যে এই অতিমানস চেতনার অবতরণ হচ্ছে তাকেও আরো সার্থক ক'রে তোলবার জন্য তার সৃষ্টি-শক্তিকে আরো বাড়িয়ে দেবার জন্য, তার লীলার মধ্যে আরো ব্যাপক সম্ভাবনা এনে দেবার দেবার জন্য। তাই তার এমন আনন্দ। আর এদিকে সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল এক অটল নীরব প্রশান্তি, পূর্ণ নিস্তরঙ্গ অচঞ্চলতা, দেহের আধারটি যাতে ওর বেগ উপযুক্তরূপে ধারণ করতে পারে, যাতে অতখানির ভারে ভেঙে না পড়ে, কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত প্রকৃতির আনন্দ বন্যাকে যাতে সে অক্লেশে সহ্য করতে পারে।

অকস্মাৎ আরো শুনলাম যে পৃথিবীর দশ দিক থেকে অপূর্ব এক সঙ্গীতধ্বনি বেজে উঠেছে. চেতনার সূক্ষ্ম স্তরে গিয়ে পড়লে যেমন কখনো কখনো শোনা যায়, কতকটা যেন বেঠোফেনের বিখ্যাত কনসার্টের অপূর্ব হার্মনির সুরের মতো. অথবা যেমন জগতের কোনো বিশেষ প্রগতিমুহূর্তে বিপুল এক বিজয়বাদ্য ঝংকার দিয়ে ওঠে তেমনি ক'রে যেন শত শত বাদ্যযন্ত্রী একসঙ্গে মিলে ঝংকার দিয়ে উঠল, তার মধ্যে একটিমাত্রও বেসুর যাওয়াজ নেই। প্রকৃতি আর পুরুষ আবার নতুন ক'রে একত্রে মিলেছে, তারই এই আনন্দ ঘোষণা, দুই পুরোনো সাথী অনেককাল পর্যন্ত আলাদা আলাদা হয়ে চলতে থাকার পরে আবার তারা একসাথে জুটেছে।

ঠিক সেই সময়েই আমার মাঝে এসে গেল ঐ কথাগুলি: "প্রকৃতি। নুনয়ী মা! তুমি বলেছ তুমি সহযোগিতা করবে—এ সহযোগিতার মহিমার অন্ত নাই যে কোথাও।"

নববর্ষের ঐ বাণী এমনি ক'রেই আমি বলেছিলাম।

কিন্তু তোমরা যেন এই অনুভূতির ব্যাপারটিকে ভুল বুঝে এমন কথা ভেবে নিওনা যে তাহ'লে বুঝি এবার থেকে সব কিছু বিনা চেষ্টায় আপনা-আপনি ফলে যেতে থাকবে, আমরা যে যেমন চাইবো তেমনই সব হতে থাকবে। তা নয়. সে স্তরে এখনও আমরা পৌঁছুইনি। যেমনি বললাম বৃষ্টি থেমে যাক অমনি তা থেমে গেল. যেমনি বললাম জগতে অমুক কাজটা হয় না কেন অমনি তা হয়ে গেল, সমস্ত দুঃখ ঘুচে গিয়ে পৃথিবী রূপকথার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হলো। তা ঠিক নয়, কিন্তু তার চেয়ে আরো কিছু গভীর রকমের ব্যাপার। প্রকৃতি তার শক্তিলীলার মধ্যে এই নবাগত শক্তিকে বরণ ক'রে নিচ্ছে, একেও তার সকল কাজের মধ্যে জড়িয়ে নিচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতির সকল কাজের ধারাই এমনি যে তা মানুষের সমস্ত বাস্তব হিসাবকে অসংখ্যগুণে ছাপিয়ে যায়, তাই প্রকৃতি কখন কি করছে তা মানুষের সাধারণ চেতনাতে ধরা পড়ে না। এখন পৃথিবীতে যে জিনিসের সৃষ্টি হলো তা আমাদের স্থূল

চোখে দেখবার মতো কোনো পটপরিবর্তন নয়, সে হলো এক আভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাবনার ব্যাপার।

এ কথা তোমাদের স্পষ্ট করেই বলে দিলাম, যাতে তোমরা লোভের বশে এমন আশা পোষণ করতে না থাকো যে পৃথিবী এবার গল্পে শোনা স্বর্গরাজ্য হবে। তার সময় এখনো হয়নি।

কেমন ক'রে কোনটি আসতে পারে তা বুঝতে গেলে প্রচুর ধৈর্য ও অতি ব্যাপক রকমের সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকা দরকার। অলৌকিক যা কিছু ঘটছে তা আভিধানিক শব্দার্থ অনুযায়ী অত্যাশ্চর্য অভাবনীয় কিছু অলৌকিক কাণ্ড নয়, যেমন কেবল রূপকথার মধ্যেই হতে পারে। সে অলৌকিককে দেখতে হলে খুবই গভীর দৃষ্টি চাই, সে দৃষ্টি হবে যেমন অতলস্পর্শী, তেমনি অন্তর্বোধী, তেমনি দূরপ্রসারী।

ভগবৎ-কৃপাকে চিনে নিতে হলে, সে কেমন ভাবে কাজ করে তাই বুঝে তাকে সেই ভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হওয়া চাই। ভিতরের গভীরতর সত্যকে জানতে হলে বাইরের কিছু দেখেই যাতে চোখ না ধাঁধায় এটুকু সামর্থ্য আসা চাই।

কিন্তু আপাতত আজকের সন্ধ্যাতে আমরা এই কার্যকরী সংকল্পটি ক'রে রাখি যেন সারা বছরের জন্য আমরা নিজেদের যথাসাধ্য চেষ্টাতে লেগে থাকি, বৃথা যেন সময় নষ্ট না করি।

* * *

প্রশ্ন : পরীক্ষকদের সম্বন্ধে?

উত্তর : পূর্ণযোগের শিক্ষানবিশীতে পরীক্ষা জিনিসটা ধারাবাহিক ভাবেই চলবে, আগের থেকে জানতে না পারলেও তাতে পাস করা চাই, তাই এই পরীক্ষা সম্বন্ধে তোমাদের সব সময়েই সজাগ ও প্রস্তুত থাকা দরকার।

তিন রকমের পরীক্ষক এই পরীক্ষাগুলি নেয়। তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো মিল আছে বলে মনে হয় না ; পরীক্ষার রীতি তাদের এতই স্বতন্ত্র রকমের ও পরস্পরবিরুদ্ধ যে সকলের উদ্দেশ্য একরকম বলে মনে করা যায় না, কিন্তু কাজে দেখা যায় যে একটি অন্যটির পরিপূরক, তাই পূর্ণ ফল আনতে পরস্পরের সহযোগিতা অনিবার্য।

তিন রকমের পরীক্ষা হয় তিন দিক থেকে—প্রকৃতি-শক্তির দ্বারা, দিব্য আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা, আর বিরুদ্ধ শক্তির দ্বারা। শেষোক্ত রকমের পরীক্ষাই সব চেয়ে বেশি প্রতারণা করে, সুতরাং সে পরীক্ষা যাতে তোমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে আচমকা না ঠকিয়ে যায় তার জন্য সব সময়েই থাকতে হবে প্রস্তুত, থাকতে হবে একনিষ্ঠ, বিনীত, নমনীয়ভাবে।

খুবই সাধারণ ঘটনা, দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ ব্যাপার বলে, যাকে মনে করা যায়, আর আশপাশের লোকজন, এরাই থাকে ঐ তিনরকম পরীক্ষকদের কারো না কারো সাহায্যকারী। সেই জটিল পরীক্ষার ব্যাপারে জীবনের যে সকল ঘটনাকে আমরা সব চেয়ে গুরুতর

বলে মনে করি তাতে পাস ক'রে যাওয়াই বরং সকলের চেয়ে সহজ, কারণ সেই সব ক্ষেত্রে তুমি আগের থেকে হুঁশিয়ার হতে পারো। কিন্তু পথের ছোটোখাটো নুড়িগুলিতেই প্রায় ঠোক্কর খেতে হয়, কারণ সেগুলি আগের থেকে নজরে পড়ে না।

প্রকৃতির পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হবার জন্য চাই অসীম ধৈর্যগুণ ও নমনীয়তা, প্রফুল্লতা, ও সকল ব্যাপারেই নির্ভয়তা।

আধ্যাত্মিক পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হবার জন্য চাই আস্পৃহা, শ্রদ্ধা, আদর্শপ্রিয়তা, উদ্যম ও অকুণ্ঠ আত্মদান।

বিরুদ্ধ শক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য চাই সদা-জাগ্রত সতর্কতা, অটুট ঐকান্তিকতা ও বিনীত নম্রতা।

কিন্তু এমন কথা ভেবোনা যে পরীক্ষক আলাদা আর পরীক্ষিত আলাদা। স্থানবিশেষে একই ব্যক্তি পরীক্ষক এবং পরীক্ষিত দুইই হতে পারে, এমনও হতে পারে যে নিজেই তুমি একাদিক্রমে পরীক্ষিত হচ্ছো আবার পরীক্ষকও হচ্ছো। আর সে পরীক্ষার ফল যা হবে তা নির্ভর করবে আপন আস্পৃহার তীব্রতা ও চেতনার জাগরণের উপর।

শেষ পর্যন্ত একটা বিষয়ে সাবধান ক'রে রাখি : কখনো যেন অন্য কারো পরীক্ষক হতে যেও না। এ কথা সর্বদা মনে রাখা ভালো যে নিজেরই তোমার গুরুতর পরীক্ষা চলছে, এ-অবস্থায় অপর কারো পরীক্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছ এমন ধারণা করা খুবই বিপজ্জনক। ওর থেকেই তোমার মধ্যে এসে পড়বে হাস্যকর রকমের দেমাক ও মারাত্মক অহংকার। ভালো-মন্দের বিচার হবে কেবল সর্বোচ্চ প্রজ্ঞার দ্বারা, অজ্ঞান মানুষের ইচ্ছামত তা হতে পারে না

নভেম্বর ১২, ১৯৫৭

যতবারই এগোবার পালা, ততবারই পরীক্ষায় পাস করা চাই।

নভেম্বর ১২, ১৯৫৭

নিজেকে প্রসারিত ক'রে দাও বিশ্বের প্রান্তসীমা পর্যন্ত...এবং তাকেও ছাড়িয়ে।

এগিয়ে চলবার জন্য যা কিছু দরকার সমস্তকেই মেনে নাও, আর সমস্তকেই শেষ পর্যন্ত বিলনানন্দে পরিণত করতে কৃতসঙ্কল্প হও। তবেই তুমি দিব্যের স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারবে।

নভেম্বর ১৩, ১৯৫৭

* * *

প্রশ্ন : "আমি তোমাদের সাথে সাথে রয়েছি", একথার প্রকৃত অর্থ কি?

আমরা যখন ব্যাকুল প্রার্থনা জানাই কিংবা ভিতরকার কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য প্রাণপণ আকিঞ্চন করি, তখন তা কি বাস্তবিক কারো কানে গিয়ে পৌঁছয়, আমাদের যত ত্রুটি এবং অপূর্ণতা সত্ত্বেও, আমাদের বেখাপ ইচ্ছা এবং ভ্রান্তি সত্ত্বেও? কে শোনে আমাদের সেই কথা? কে আসে আমাদের কাছে?

আর তুমি কি না থাকো তোমার পরমতম চেতনাতে, নির্ব্যক্তিক তোমার দিব্যশক্তিতে, তোমার অসীম যোগশক্তিতে, অথবা তুমি থাকো এই দেহধারিণী না হয়ে তোমার স্থূল চেতনাতে? সে কি কোনো অনামী শক্তি নয়, বরং বাস্তবিকই এক ব্যক্তিগত উপস্থিতি যা আমাদের প্রত্যেক চিন্তাটিকে জানছে আর প্রত্যেক কাজটিকে লক্ষ্য করছে? কেমন ভাবে তুমি আমাদের সাথে সাথে থাকো তা কি বুঝিয়ে বলবে?

আমরা শুনি, শ্রীঅরবিন্দ আর না দুজনে মিলে একই চেতনা, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিগত প্রভাব আর তোমার ব্যক্তিগত প্রভাব দুটো আলাদা আলাদা জিনিস হয়ে আলাদা ভাবেও কাজ করে না কি?

উত্তর আমি তোমাদের সাথেই রয়েছি, যেহেতু আমিই হচ্ছি তোমরা কিংবা তোমরাই হচ্ছ আমি।

আমি তোমাদের সাথে রয়েছি, এ কথা বললে বিস্তর রকমের জিনিস বোঝায়, যেহেতু আমাকে তোমাদের সঙ্গে সকল রকম ধাপে সকল স্তরেই থাকতে হয়েছে, সর্বোচ্চ সূক্ষ্মচেতনা থেকে সর্বনিম্ন স্থূলচেতনা পর্যন্ত। এখানে এই পণ্ডিচেরীতে তোমরা আমার চেতনা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর শ্বাস পর্যন্ত নিতে পারো না। সূক্ষ্মস্তরের দিক থেকে বলতে গেলে এখানকার আবহাওয়া সর্বক্ষণ ওতেই ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে, মেপে বলতে গেলে এখান থেকে দশ কিলোমিটার তফাতের ঐ হ্রদের কাছ পর্যন্ত। আমার এই চেতনাকে তোমরা প্রাণের স্তরে, মনের স্তরে, এবং তার চেয়েও উপরকার স্তরে সর্বত্রই অনুভব করবে। এখানে আমি যখন প্রথম এসে উপস্থিত হই তখন এমনি বাস্তব রূপেই আমি শ্রীঅরবিন্দের আবহাওয়া অনুভব করতাম দশ মাইল দূর পর্যন্ত, মাত্র দশ কিলোমিটার নয়। ওর মধ্যে এলেই সেই আবহাওয়া হঠাৎ টের পাওয়া যেতো, একেবারে নিরেট, নিখুঁত, জ্যোতির্ময়, আর হাল্কা, সে এমনই হাল্কা যে তোমাকে আকাশের দিকে তুলে দেয়।

কিছুকাল আগের কথা বলছি, তোমরাও তা জানো যে শ্রীঅরবিন্দ তখন এই আশ্রমের সর্বত্র এক বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দিয়েছিলেন: "প্রত্যেকে তোমরা এ কথা সর্বদার জন্য স্মরণ রাখবে যে না তোমাদের সব কিছুই দেখতে পাচ্ছেন, কারণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর উপস্থিতি সর্বত্রই রয়েছে।" এ কেবল একটা বাজে সতর্কবাক্য নয়, সত্যই তাই। বাস্তব রূপেই আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যারা সূক্ষ্মদর্শী তারা তা দেখতেও পায়।

সাধারণভাবে আমার শক্তি সর্বদাই তার কাজ করছে, তোমাদের প্রত্যেকের মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে সর্বদাই নতুন নতুন যোগাযোগের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তোমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন গবাক্ষ উদ্‌ঘাটিত ক'রে ধরছে যাতে নিজেরাই দেখতে পাও নিজেদের কোন জিনিসটা বাড়াতে বা বদলাতে বা বর্জন করতে হবে।

কিন্তু এ ছাড়াও, তোমাদের সঙ্গে আমার একটা আলাদা রকমের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ রয়েছে,

যে-কেউ শ্রীঅরবিন্দ ও আমার শিক্ষাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে তাদের সকলের সঙ্গেই—এ তো জানা কথা। নিকট-দূরের কোনো প্রশ্নই এখানে নেই, তুমি ফ্রান্সেই থাকো বা পৃথিবীর অপর প্রান্তেই থাকো বা এই পণ্ডিচেরীতেই থাকো, সে সম্বন্ধ সর্বদাই জীবন্ত। যখনই তোমাদের কাছ থেকে ডাক আসে, যখনই আমাকে কিছু জানানোর দরকার হয় যাতে আমার দিক থেকে কোনো শক্তি বা সাহায্য বা রক্ষার কোনো উপায় ক'রে পাঠাতে হবে, তখনই হঠাৎ কোনো রকমে সে খবর আমার কাছে পৌঁছে যায়, আর তখন যা করবার তা আমি ক'রে থাকি। ঐরূপ খবরাখবর যে-কোনো মুহূর্তেই আমার কাছে এসে পড়ে, তাই তোমার ও অনেক সময় দেখে থাকবে যে কথা বলবে বলতে বা কিছু কাজ করতে করতে হঠাৎ আমি থেমে যাই ; তার কারণই হলো ওই, কোনো একটা ডাক আসাতে সেই দিকেই তখন নিবিষ্ট হয়েছি।

যাদের শিষ্য বলে গ্রহণ করেছি, যাদের "আচ্ছা" বলে সম্মতি দিয়েছি, তাদের সম্বন্ধে কেবল ঐ বন্ধনই নয়, তার চেয়েও বেশী কথা, আমার অংশবিভূতি তাদের কাছে কাছে থাকে। কোনো কিছুর দরকার হলেই সে আমাকে তা জানিয়ে দেয়, কখন কি ঘটছে তা আমাকে বলে দেয়। বস্তুত সব সময়েই আমার কাছে নানারকম খবর আসছে, কিন্তু সেগুলো আমার সক্রিয় স্মৃতির এলাকাতে স্থান পায় না, তাহ'লে তো আমি তার ভারে চাপা পড়ে যেতাম ; আমার স্থূল চেতনা সেখানে ছাঁকুনির মতো কাজ ক'রে সেগুলোকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু সূক্ষ্মস্তরে সেগুলি রেকর্ড করা হয়ে সুষুপ্তির মধ্যে তোলা থাকে, যেমন কোনো গানের সুর আপাতত বাজানো না হলেও রেকর্ডের মধ্যে ধরা থাকে। তারপর যখনই আমার স্থূল চেতনাতে তার কথা জেনে নেবার দরকার পড়ে তখন সেই সূক্ষ্মস্তরকে নাড়া দিলেই সেই রেকর্ড অমনি বাজতে শুরু করে। তখন চেয়ে দেখি জিনিসটা কি দাঁড়াচ্ছে, কালক্রমে তা কোন দিক দিয়ে এগোবে, তার বাস্তব ফল কি হবে।

যদি কোনো কারণে তোমরা আমার সাহায্য চেয়ে আমাকে সে কথা লিখে জানাও, আর আমি জবাব দিয়ে বলি "আমি তোমার সাথে রইলাম," তার অর্থ এই হবে যে তোমার সঙ্গে আমার সংযোগ রইল, কিছুকালের জন্য তুমি আমার চেতনার সামনে রইলে, যতকালের জন্য তার প্রয়োজন আছে।

তোমাদের সঙ্গে আমার এই বন্ধন কখনই ছিন্ন হয় না। এমন তো অনেকেই আছে যারা বহুকাল এই আশ্রম ছেড়ে চলে গেছে, হয়তো বিদ্রোহ ক'রেই গেছে, তবুও আমি তাদের খবর রাখি, আর সাহায্যও করি। কেউই পরিত্যাজ্য হয় না।

বস্তুত তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমার নিজের দায়িত্ব রয়েছে, এমন কি জীবনে যাকে মাত্র একটি বারের জন্য দেখেছি তার সম্বন্ধেও।

এখন একটি কথা বলি তা মনে রেখো। শ্রীঅরবিন্দ আর আমি হচ্ছি একই চেতনা, একই অভিন্ন ব্যক্তি। কেবল, যখন এই শক্তি বা এই উপস্থিতি—যা একই কথা—তোমার

ব্যক্তিগত চেতনার মধ্যে গিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম আকার নেয়, আর তা নির্ভর করে তোমার নিজেরই ধাতুর উপর, তোমার আশ্পৃহা, তোমার চাহিদা, তোমার আপন সত্তার বিশেষ ঝোঁকের উপর। তোমাদের ব্যক্তিগত চেতনা অনেকটা ফিল্টারের মতো, ঘড়ির নির্দেশক কাঁটার মতো, সে নিজেই একটা কিছুকে বিশেষভাবে বেছে নেয়, দিব্যের অনন্ত প্রকার সম্ভাবনার মধ্যে একটিকে সে ধরে নেয়। প্রকৃতপক্ষে এই হয় যে দিব্যচেতনা যেখানে যেমন প্রত্যাশা সেখানে তেমনি করেই নিজেকে ধরা দেন। তোমার মনে যদি এই প্রত্যয় থাকে যে ভগবান অতি নির্মম ও দুর্লভ, তাহ'লে তোমার কাছে তিনি নির্মম ও দুর্লভ হয়েই থাকবেন, কারণ শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে তোমার মঙ্গলের জন্য তাইই তোমার পক্ষে দরকার ছিল ; কালীভক্তের জন্য তিনি কালীই হবেন, আবার আনন্দময়ের ভক্তের জন্য তিনি পরমানন্দ মাধবও হবেন। অপরপক্ষে জ্ঞানযোগীর জন্য তিনি পরম প্রজ্ঞাও হবেন, মায়াবাদীর জন্য নির্ব্যক্তিক পরাৎপরও হবেন ; নিরীশ্বরবাদীর কাছে তিনিই নিরীশ্বর স্বরূপ, প্রেমিকের কাছে তিনিই প্রেমস্বরূপ। তোমার কাছে তিনি অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকবেন, পরম বন্ধু হয়ে থাকবেন, যারা তাঁকে সকল কাজের আভ্যন্তরীণ দিশারী বলে জেনেছে তাদের কাছে তিনি সর্বদা তেমনি সহায়স্বরূপ হয়ে থাকবেন। যদি তোমার এমন বিশ্বাস থাকে যে তিনি সব কিছু দোষ মুছে দিতে পারেন, তাহ'লে তিনি অক্লান্তভাবে তোমার সমস্ত দোষত্রুটি ও স্খলনকে মুছেই দিতে থাকবেন, আর প্রতি মুহূর্তেই সেই অনন্ত কৃপার আস্বাদ তুমি পেতে থাকবে। বস্তুত তোমার গভীরতম আশ্পৃহাতে তুমি যেমনটি প্রত্যাশা করবে, ভগবান তোমার জন্য ঠিক তেমনটি হবেন।

আর যখন তুমি এমন চেতনাতে গিয়ে পৌঁছবে যেখান থেকে সব কিছুকে তুমি সমান দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছো, ভগবানের সঙ্গে মানুষের যত অসংখ্য ও অনন্ত রকমের সম্বন্ধ রয়েছে সমস্তই তোমার নজরে পড়তে শুরু করেছে, তখন দেখবে যে সে কত আশ্চর্য কাণ্ড। ইতিহাসের দিকে চাইলে দেখবে যে মানুষের যখন যেমন বুদ্ধির বিকাশ এবং তার আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন, ঠিক তারই সঙ্গে তাল রেখে ভগবানও কেমন ক'রে ধাপে ধাপে বিবর্তিত হয়ে এসেছেন। বস্তুতান্ত্রিকদের যুগে তিনিও বস্তুতান্ত্রিক হয়েছেন, আবার মানব চেতনার ব্যাপ্তি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও উত্তরোত্তর নিকটতর এবং উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছেন। প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেকেরই বেছে নেবার স্বাধীনতা রয়েছে। জগতের ইতিহাসে মানুষের সঙ্গে ভগবানের যুগে যুগে এই অফুরন্ত সম্বন্ধবৈচিত্র্য ক্রমিক পরিণতির দিকে যেতে থাকা, এ এক অপূর্ব বিস্ময়। অথচ সমস্তকে মিলিয়ে আজ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে তা হলো তাঁর পূর্ণ অভিব্যক্তির সামান্য একটু কণিকা মাত্র।

তাহ'লে বুঝতে পারছো তোমার যেমন আশ্পৃহা সেই অনুসারেই তিনি তোমার সাথে সাথে রয়েছেন। তার মানে কিন্তু এই নয় যে তিনি তোমার বাহ্যপ্রকৃতির খেয়াল মাফিক নিজেকে তোমার কাছে নামিয়ে এনেছেন—আমি এখানে বলতে চাইছি তোমার সত্তার গভীর-

দেশের খাঁটি সত্যটির সম্পর্কে। যদিও কখনো কখনো তিনি অমনি বাহ্য আশ্পৃহার সঙ্গেও নিল রেখে চলেন, আর যদি তুমি ভক্তজনদের মতো বিরহ-মিলনের দোলায় নিত্য দুলতে থাকো, অর্থাৎ একবার বা আনন্দে উচ্ছ্বসিত আর একবার বা হতাশায় মুহ্যমান হও, তাহ'লে ভগবানও তোমার তেমনি মনোভাব অনুযায়ী একবার নিলে যাবেন আর একবার ছেড়ে যাবেন।

সুতরাং এখানে তোমার নিজের মনোভাবটাই হলো আসল কথা, এমন কি বাহ্যিক মনোভাবও। লোকে বোঝে না যে বিশ্বাসের দাম কতখানি, বিশ্বাসেই কত আশ্চর্য রকমের অলৌকিক ব্যাপার ঘটাতে পারে। যদি প্রতি মুহূর্তেই ঐকান্তিকভাবে চাও যে ভগবান তোমাকে বর্তমান অবস্থা থেকে ছাড়িয়ে নিজের কাছে টেনে নেবেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই তিনি তাই করবার জন্য তোমার কাছে চলে আসবেন, ক্রমশঃ খুবই কাছাকাছি এসে পড়বেন, তখন দেখবে তিনি আরো কাছে, আরো কত কাছে।

* *

প্রশ্ন পূর্ণ স্বাধীনতার কথা?

উত্তর—আমি তোমাদের তাই বলি, "পূর্ণভাবে স্বাধীন হও"; কিন্তু সে কথার মানে কি তা ভালো ক'রে বোঝা চাই। যা-খুশি-তাই করবার অধিকারকে প্রায়ই তোমরা স্বাধীনতা বলে ভুল করো। সাধারণ মনের কাছে স্বাধীন হওয়ার মানে অবাধে সকল রকমের যথেচ্ছাচার করবার সুযোগ। বলা বাহুল্য এখানে আমরা সেই ধরনের স্বাধীনতার কথা বলছি না। যখন তোমাদের বলি, "স্বাধীন হও", তখন সত্যিকার স্বাধীনতার কথাই বলি, অর্থাৎ কোনো রকম বন্ধনেরই অধীন হয়ে না থাকা।

সে অবস্থাতে পৌঁছতে পারা কিন্তু খুব সহজ কথা নয়।

যেমন, তুমি একবার নিজেকেই প্রশ্ন ক'রে দেখ যে স্তুতিনিন্দার কতখানি উপরে তুমি উঠে যেতে পেরেছ। এমন কথা বলছি না যে তুমি নিজেকে এতখানি বড়ো মনে করতে থাকো যাতে অন্য কারো মতামত তোমার গ্রাহ্যের মধ্যেই না আসে, তা নয়; কিন্তু তুমি সাধারণ অজ্ঞানতার কথাও জানবে আর সেই সঙ্গে নিজেকেও অজ্ঞান বলে জানবে, আর এটিও জানবে যে কেউই কাউকে বিচার করতে পারেনা। এখানে দিব্যচেতনাকেই—নিজের মধ্যেই হোক আর গুরুরই হোক,—তার ভার দেবে, আর তাকেই তোমার একমাত্র দিশারী করবে।

সত্যিকার স্বাধীন হবার একমাত্র কৌশল হলো ভগবানের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দেওয়া। নিজের হাতে কিছুমাত্র বাকি না রেখে। তাতেই দেখবে যে সকল বন্ধন, সকল আগল, সকল শৃঙ্খল কেমন করে তার অটুট দৃঢ়তা হারিয়ে আপনা থেকে খসে পড়ে যাচ্ছে।

যাই হোক কিন্তু এ কথাও আমি বলিনি যে অন্যের কাছ থেকে যা কিছু আসে তার মধ্যে

শেখবার কিছু নেই বরং দেখবে যে একটি শিশুর কাছেও কিছু তুমি শিখে নিতে পারো। শিশু তোমার তুলনায় অনেক বেশী অজ্ঞান তো নিশ্চয়ই; কিন্তু সে মুকুর হয়ে তোমার নিজের প্রতিবিম্বকে প্রতিফলিত ক'রে দেখাতে পারে, ওর থেকে তোমার নিজের ভিতরকার এমন কিছু জিনিস ধরা পড়ে যেতে পারে যার সম্বন্ধে তুমি আগে কিছুই জানতে না। অতএব একটি শিশুর কাছ থেকেও অনেক উপকার পেতে পারো, যদি তোমার জানা থাকে যে বিরক্তি না আসতে দিয়ে কেমন ক'রে শিক্ষা নেনে নিতে হয়।

তখন এই অভিজ্ঞতাটি নিলবে যে জীবনের প্রতি ঘন্টাতে তুমি অন্যের কাছে কিছু শিক্ষা সংগ্রহ করতে পারো। কিন্তু তাই বলে অন্যের মতামত বা নজরা যেন তোমাকে খতমত খাইয়ে বাধা দিতে বা বিচলিত করতে না পারে। সর্বদা মনে রাখবে যে একমাত্র উপরকার সত্তাই সব কিছু বিষয়ে জানতে এবং বিচার করতে পারে, আর কেউ নয়।

এই রকম হতে পারলেই তুমি স্বাধীন হলে।

এমনি স্বাধীনতাই তোমাদের আসুক : যাতে সকল বন্ধন থেকে, সকল মুঢ়তা থেকে, সকল প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হও—সব কিছু থেকেই মুক্ত, কেবল ভগবানের কাছে নিবেদিত হয়ে থাকা ছাড়া—কারণ ওতেই আসবে চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক মুক্তি।

স্বাধীনতারও রকমারি আছে—মনের স্বাধীনতা, প্রাণের স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, প্রত্যেকটিই লাভ করতে হয় অনুশীলনের দ্বারা। কিন্তু আরো এক নতুন রকমের স্বাধীনতা কেবল সম্প্রতিই সম্ভব হয়েছে, অতিমানস আসার পর থেকে, তা হলো দেহগত স্বাধীনতা।

অতিমানস দেখা দেবার একটি প্রথম ফল এই হয়েছে যে দেহও এমন মুক্তি ও স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করতে পারছে যা আগে কোনোকালে জানা ছিল না। এ-স্বাধীনতা মানে কোনো মনস্তাত্ত্বিক বা আভ্যন্তরীণ চেতনার দিকের কথা নয়, তার চেয়েও বড়ো রকম এক স্বতন্ত্র জিনিস—আমাদের দেহেরই মধ্যে এবং দেহস্থ কোষগুলির মধ্যে একটা নতুন কিছুর স্ফুরণ। দেহকোষগুলি নিজেরাই এই প্রথম জানতে পারছে যে তারা পরের বাধ্যতা হতে মুক্ত, নিজেদের ভাগ্যনিরূপণ করবার অধিকার তারা নিজেরাই পেয়েছে। পুরানো গতানুগতিক ব্যবস্থার উপরে এই নতুন রকম ব্যবস্থার স্পন্দনগুলি যখন ঘটতে থাকলো, তখনই তা আমি স্পষ্ট টের পেয়ে গেলাম, আর তাই থেকে নিঃসন্দেহে জানলাম যে এবার নতুন সৃষ্টির শুরু হয়েছে।

সাধারণ অবস্থায় আমাদের দেহে সর্বদাই এই ভাবটি বর্তমান থাকে যে সে তার নিজের ঘরের মালিক নিজে নয় : রোগ যখন তার মধ্যে ঢুকতে আসে তখন সে রোগকে আটকাতে পারে না ; আরো কত হাজার রকমের অস্বস্তির বোঝা তাকে বাধ্য হয়ে বইতে হয়, সে তার প্রতিবাদ মাত্র করতে পারে না। মাত্র এইটুকু ক্ষমতা তাকে দেওয়া আছে যে রোগ হলে তখন তার বিরুদ্ধে সে লড়তে পারে, ক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করতে পারে। রোগ যখন

প্রবেশ করেছে তখন তার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে সে তাকে জয় করতে পারে,—বর্তমান চিকিৎসা শাস্ত্রেও সেই কথা বলে যে দেহ যদি বাস্তবিক চেষ্টা করে তাহ'লে সে নিজেকে আরোগ্য করতে পারে ; ওষুধেই যে আরোগ্য আনে সে কথা ঠিক নয়, কারণ ওষুধের দ্বারা রোগটি আপাতত দমন হলেও দেহের যদি সহযোগিতা না থাকে তাহ'লে অন্যত্র অন্যভাবে আবার রোগ দেখা দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ নিজে আরোগ্য হতে মনস্থ না করছে। কিন্তু তবু সেটুকু তার সংগ্রামকারী শক্তির দ্বারা, শত্রু যখন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে কেবল তখনই তা খাটে, একে প্রকৃত স্বাধিকার বলা যায় না।

কিন্তু এখন অতিমানস আবির্ভাবের পর থেকে দেহের তরফে আরো নতুন কিছু জিনিস এসেছে সে তার আপন ঘরের কর্তৃত্ব পেয়েছে, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেয়েছে, নিজের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা পেয়েছে। বাস্তব কথা এই যে সমগ্র সত্তা এখন আপনা থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে, নিজেই নিজের নায়িকরূপে মাথা তুলতে পারছে।

একশো রকমের বাহ্যশক্তির দাপটে আমাদের ঘাড়ে সর্বদাই গুরুতর বোঝা চাপানো থাকতো, তারই ভারে আমাদের মাথা সর্বদা নুয়ে পড়তো। তারাই আমাদের হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতো, কেউই জানতো না যে কিসের জোরে আমাদের টানছে, আমরা কোথায় যাচ্ছি আর কেনই বা যাচ্ছি—আর একেই লোকে বলে ভাগ্য, নিয়তি। যখন যোগ-সাধনা করা হয় তখনই প্রথমে একটা চেতনা জেগে ওঠে—ভারতে তাকে বলে কুণ্ডলিনীর জাগরণ—সে চেতনা কঠিন আবরণ ভেদ ক'রে মাথার উপর দিকে ঠেলে ওঠে, তখন আমরা অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে গিয়ে পড়ি। তখনই হয় আমাদের প্রকৃত দেখা, প্রকৃত জানা, প্রকৃত সংবিৎ ও প্রকৃত উপলব্ধি,—তখন দেখি যে বিপত্তিগুলো যেমন ছিল তেমনই রয়েছে বটে কিন্তু আমরা নিজেরা তার উপরে উঠে গেছি। অতিমানসের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে দেহও ঠিক সেই ধরনের অনুভূতি লাভ করেছে। সেও এখন মাথা তুলে দাঁড়াবে, সেও পেয়েছে স্বাধীনতা।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি, এই ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় আমি রোজই কত রোগ-বাহক মানুষদের সংস্রবে এসেছি। কিন্তু একদিন স্পষ্টই টের পেয়ে গেলাম যে আমার দেহ এ রোগের সংক্রমণকে গ্রহণ করবে না। সে তার আপন স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের কথা স্পষ্টই জানিয়ে দিলে। কোনো উচ্চতর ইচ্ছা হতে নয়, উচ্চতর চেতনাতেও তেমন ইচ্ছা জাগেনি, দেহ কেবল তার নিজের জোরেই এই মনস্থ ক'রে নিলে। যখন উচ্চ চেতনাতে থাকা যায় তখন সবই দেখা যায়, সবই জানা যায়, কিন্তু যেই তুমি জড়ের স্তরে নেমে এলে অমনি যেন ঝরঝরে বালির মধ্যে জল ঢুকে গেল। কিন্তু এখন সে ভাব বদলে গেছে। জড়-দেহও নিজস্ব একটা শক্তি পেয়েছে, অন্যের সাহায্য না নিয়েও। বাইরের থেকে সে জিনিস দেখা না গেলেও একে আমি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি।

দেহের এই নতুন তৎপরতা দেখে রূপান্তরের মর্মটি আমি বুঝে নিয়েছি। কোনো উপরকার ইচ্ছাশক্তি হতে তা আসে না, অর্থাৎ কোনো উচ্চতর চেতনা দেহের উপর এসে রূপান্তরের কোনো প্রভাব আরোপ করে না, স্বয়ং দেহসত্তাই তার কোষগুলির মধ্যে সে বিষয়ে সজাগ হয়ে ওঠে, কোষগুলি নিজেরাই তার পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করে ; অতিমানস অভিব্যক্তির আগেকার কালে যে সব দৈহিক অসঙ্গতি ও গণ্ডগোল প্রায়ই দেখা দিত, এক সম্পূর্ণ নতুন রকমের তৎপরতা আসায় সেগুলি এখন আপনা থেকেই সংশোধিত হয়ে যাচ্ছে।

অবশ্য খুবই ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন আসছে, কিন্তু আমি আশা করি যে একটু একটু ক'রে এই নতুন চেতনা আরো অনেক বেড়ে উঠবে, আগেকার দিনের অপ্রতিহত দমনশক্তি ও ধ্বংসশক্তির আধিপত্যকে খর্ব ক'রে সে নিজের স্থান দখল ক'রে নেবে, যে নিয়তিকে অটল বলে মনে হয় তাও হয়তো এবার টলে যাবে।

* *

প্রশ্ন : যখন কোনো গুরুতর বিষয়ে হেস্তনেস্ত একটা সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলতে হচ্ছে, তখন কেমন ক'রে জানবো যে আমার নিয়তি কোনটির পক্ষে অনুকূল হবে ?

উত্তর তোমার নিয়তি কেবল তো একটাই নয়, অনেকগুলি হতে পারে।

প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে সব চেয়ে গোড়ার উৎপত্তিস্থলে পুনরায় গিয়ে মিলবার, জাগতিক ক্ষেত্রে তার যে স্তরেই অবস্থান হোক—জড়সৃষ্টি মাত্রকেই ভগবান এই অধিকার দিয়ে রেখেছেন, আর তোমারও তাই সত্য নিয়তি। কেবল এই পৃথিবীর বেলাতেই ভগবানের এই বিশেষ দান, অন্য আর কোনো জগতে এটি নেই। আবার ভগবৎ অভিব্যক্তির ব্যাপারে কাকে যে কোন অংশটি গ্রহণ করতে হবে তাও উপর থেকে ঠিক করা আছে, কিন্তু তোমার ভিতরকার "আসল জিনিসটি" আপাতত বিবর্তনের যে স্তরে রয়েছে সেই অনুযায়ী তোমার অংশগ্রহণও বিভিন্ন স্তরে হবে। তোমার সেই ভিতরকার জিনিসটির যদি খুবই কাঁচা অবস্থা হয়, সে ক্ষেত্রে যদিও তোমার উপলব্ধি পুরোপুরি হতে পারে এবং ভগবানের সঙ্গে তোমার মিলনও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু জগতে তোমার সেই উপলব্ধির ক্ষেত্রটুকু খুবই সংকীর্ণ হবে। ক্ষুদ্র হয়েও তুমি সোজা উপরের দিকে উঠে ভগবানের নাগাল পেতে পারো, কিন্তু সমান্তরাল বিস্তৃতির ক্ষেত্রে তোমার উপলব্ধির মাত্রা হবে যৎসামান্য। দৃষ্টান্ত হিসাবে শক্তি- ও প্রজ্ঞা-স্বরূপিণী মহেশ্বরী মাতাকে নিয়েই ধরা যাক। জগন্মাতার এই মহেশ্বরী শক্তি যদি তোমার মধ্যে বিকাশ পেতে চায়, তাহ'লে তোমার ভিতরকার "আসল জিনিসটির" বিবর্তনস্তর অনুসারে তুমি হয়তো সামান্য কোনো দলের দলনেত্রী মাত্র হয়েও দাঁড়াতে পারো, আবার একজন রাণী কিংবা সম্রাজ্ঞীও হতে পারো। সেখানে দলনেত্রীর মধ্যেও থাকবেন তিনি, আবার সম্রাজ্ঞীর মধ্যেও থাকবেন তিনি, কিন্তু তার অভিব্যক্তির বিস্তার হবে স্বতন্ত্র।

সুতরাং আদি উৎপত্তির দিকে উঠে যাবার একই লাইনে তোমার বাহ্য নিয়তি বিভিন্ন রকমের হতে পারে, তোমার নিজস্ব প্রগতির স্তর অনুসারে। যোগের দ্বারা সেই গোটা পথটাকে সটান উত্তীর্ণ হয়ে যাবার প্রয়াস করা হয়, কিন্তু সব সময়ে তা সম্ভব হয় না। তোমার সত্তার মধ্যে রয়েছে নানা রকমের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, কেবল ক্রমিক অতিক্রমতার দ্বারাই তাকে কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে। সে অতিক্রমতা লাভ করতে কয়েক জন্মও লেগে যেতে পারে, আবার কয়েক বছরে, কয়েক মাসে, এমন কি কয়েক মিনিটের মধ্যেও তা মিলে যেতে পারে।

উপরকার চেতনার মধ্যে কেমন করে নিয়তি ও তার সম্ভাবনাগুলি একে একে উন্মেষিত হচ্ছে তা যদি কেউ দেখতে পায় তাহ'লে সে এক-পরম আশ্চর্যের ব্যাপার হবে। এমন এক ধরনের লোক আছে যাদের বলা হয় আতিশয্যওয়ালা পাগল, কারণ তারা তাদের উর্বর কল্পনা থেকে এমন বড়ো বড়ো অসম্ভব ব্যাপারের কথা বলে যা বর্তমান জগতের হিসাব অনুযায়ী কোনো সম্ভাবনার সঙ্গে আদৌ মেলে না। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার অতটা অমিল হয়ে যায় তাদের জ্ঞানের অভাবে, সমুচিত বিচার বিবেচনার অভাবে। নইলে তারা সত্যই হয়তো কোনো উচ্চতর সত্যের আভাস পেয়েছে, হয়তো সুদূর ভবিষ্যৎ নিয়তির কিছু ইঙ্গিত আগের থেকে পেয়েছে, সেই কারণেই তাদের বিশ্বাস থেকে অতটা জোর দিয়ে বলছে— কিন্তু বিচারবুদ্ধির অভাবে এটা দেখতে পায় না যে তার সময় আসতে এখনও বিলক্ষণ দেরি আছে, ক্ষেত্র এখনও প্রস্তুত হয়নি, যে বাস্তব অবস্থার মধ্যে তারা অবস্থান করছে তা এখনও সেই কল্পনাকে সফল করবার পরিপন্থী। সত্যের সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি আসা এক কথা, আর সেই সত্য বাস্তবে সফল হওয়া অন্য কথা, মাঝখানে সময়ের ব্যবধান রয়ে গেছে যথেষ্টই। কিন্তু তাই বলে ঐ সকল স্বপ্নকে একেবারে গলা টিপে মারাও উচিত নয়, তাতে নিজের ভবিষ্যৎকে হত্যা করা হয়। নোট কথা, শ্রীমতী গ্রাণ্ডীর মতো জল্পনা নৈতিকতাকেও আশ্রয় দেবে না প্রশ্রয় দেবে না, আবার সান্ধো পাঞ্জার মতো স্থূল বৈষয়িক বুদ্ধিকেও স্বাগত করবে না। নিজের স্বপ্নকে নিজেরই মধ্যে ধরে রেখে ধৈর্য ধরে বহুকাল পর্যন্ত চুপচাপ অপেক্ষায় থাকতে শেখা চাই।

শেষ পর্যন্ত নিয়তি সম্বন্ধে এইটুকুই বলা যায় : জগতে দুটি নিয়তি এক রকমের হয়

প্রত্যেকের জন্যই আলাদা আলাদা নিয়তি রচিত হয়ে চলেছে, আর যতই ভগবানের কাছাকাছি এগিয়ে যাবে ততই তোমার নিয়তি দিব্যগুণে সমৃদ্ধ হতে থাকবে।

* * *

প্রশ্ন শক্তির কথা আর উপলব্ধির কথা ?

উত্তর : আধুনিক বিজ্ঞান যা কিছু আবিষ্কার করেছে তার মধ্যে সব চেয়ে সত্যিকার

বড়ো কথা এই যে বাইরের থেকে সব জিনিসকে যেমন দেখছো তেমন তা নয়। একটা দেহরূপ দেখ, একটা মানুষ দেখ, একটা বস্তু দেখ, একটা দৃশ্য দেখ, দৃষ্টি, স্পর্শ, ঘ্রাণ, শ্রুতি ও স্বাদ দিয়ে ঐ জিনিষটিকে ঠিক ঠিক জানলাম বলেই তুমি অনুভব করবে। কিন্তু বিজ্ঞান এখন বলছে, "ও তোমার মিথ্যা জানা, আসলে ওর সমস্তটাই তোমার জানাই হয়নি; ওর সমস্তটাকে তুমি স্পর্শ বা আস্বাদ বা আঘ্রাণ করতে পারোনি। তোমার ইন্দ্রিয়গুলির যেমন সাধ্যসীমা সেই অনুসারেই ওর সংস্পর্শে এসে যতটুকু তুমি জেনেছ তা উপরে উপরে একটা বাহ্যিক জানা মাত্র, তা ভ্রমযুক্ত ও অবাস্তব।"

বিজ্ঞানের মতে তুমি নিজেই হলে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি, কিংবা তাও নয়, তার চেয়েও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং নিতান্ত অগোচর অথচ সদাচঞ্চল সক্রিয় কণার সমষ্টি। তোমার দেহ বলে কোনো কিছুই নেই, নাক চোখ মুখ বলে কোনো কিছুই নেই, পূর্বোক্ত জিনিসই এক এক জায়গাতে অনেকগুলো জড়ো হয়ে সেইরকম দেখাচ্ছে মাত্র। অতএব সেই আগেকার আধ্যাত্মিক মহাজ্ঞানীরা যেমনভাবে জগৎটাকে মায়া বলে বোঝাতেন, বিজ্ঞানীরাও কি সেই ধরনেরই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছচ্ছেন না? এ আবিষ্কার সামান্য কথা নয়, এরা এমন জায়গাতে এসে পড়েছে যে আরো এক ধাপ মাত্র এগোলেই সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। অতএব কেউ যখন এসে বলে "আমি নিজে অমুক জিনিসটা চাক্ষুষ দেখলাম, তাকে ছুঁলাম, তাকে পরখ ক'রে নিলাম, তার পরিচয় সম্বন্ধে আমার আর সন্দেহমাত্র নেই," তখন তা বিজ্ঞানের দিক থেকে বাজে কথাই বলা হয়। যারা কোনো কিছুর ভিতরের খবর জানে না, শুধু বাহিরটা দেখে, তারাই এমন কথা বলতে পারে। এখানে বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক একই উক্তি করছে, সম্পূর্ণ বিপরীত দুই প্রান্ত থেকে দুজনে একই সিদ্ধান্তে এসেছে "জগৎকে যেমন তোমরা দেখ তেমন তা নয়, ও দেখা তোমাদের বিভ্রম মাত্র।"

তাহ'লে ওর পিছনে যে সত্য রয়েছে সেটি কি? যারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের রাস্তায় গেছে তারা বলবে: "যা সত্য আমরা নিজেরা তার অনুভূতি পেয়েছি," কিন্তু সে হলো তার ব্যক্তিগত কর্তৃপক্ষীয় অনুভূতির কথা, অপরের কাছে সে অনুভূতিকে প্রমাণ ক'রে দেখিয়ে দেবার এমন কোনো উপায় এখনও পর্যন্ত হয়নি যাতে সকলেই এ-কথা নির্বিরোধে মেনে নিতে বাধ্য হবে। যে সেই অনুভূতি পেয়েছে কেবল তার কাছেই সেটি অবিসম্বাদী সত্য।

বাস্তবক্ষেত্রে কোনো অনুভূতি বা আবিষ্কারকে প্রমাণ করা যাবে তার নিজেরই আনা শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা, যখন সেই শক্তি কোনো কিছুর বাস্তব রূপান্তর ঘটিয়ে তার আগেকার চেহারা বদলে দিতে পারে, দৃশ্যমান জগতের ও বর্তমান ঘটনাস্রোতের আপাতদৃষ্ট অবস্থাকে পাল্টে দিতে পারে, অর্থাৎ যখন সেই অনুভূতির অভিবাক্ত শক্তি তার আপন ইচ্ছাকে সক্রিয়-ভাবে প্রত্যক্ষ প্রকাশ করে। আবার মনে হয় ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অনুভূতির সব চেয়ে সর্বস্বীকার্য প্রমাণ হবে তার নতুন কিছু গড়ে দেখাবার শক্তি, জগৎকে আপাতত যেমন দেখছি তার চেয়ে কিছু অন্যরকম ক'রে দেখানোর ক্ষমতা।

কোনো ব্যক্তির আন্তরিক অনুভূতির যে ফল হয় তা শুধু ব্যক্তিগত চেতনারই উপরে, তার প্রমাণ সে নিজে অস্বীকার করতে পারে না। অনাবিল আনন্দপ্রাপ্তি, সর্বৈব শান্তিবোধ, অম্লান পরিতুষ্টি, গভীর জ্ঞানদৃষ্টি, এগুলি যখন আসে তখন সেই ব্যক্তির কাছে তা অবশ্যই প্রমাণস্বরূপ। তবে বাইরের চেহারাতে তার ফল দেখতে পাওয়া কেবল ঐ অনুভূতি ছাড়াও আরো অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে, বিশেষ ক'রে সেই অনুভূতি আসার মূল হেতুটির উপর সম্ভবত অনেকখানি নির্ভর করে; যাই হোক, কারো ব্যক্তিগত অনুভূতির সাফল্য অন্যের কাছে প্রমাণিত হতে পারে যদি তার কিছু প্রত্যক্ষ শক্তিক্রিয়া ঘটে অন্যান্য ব্যক্তিদের উপর বা কোনো বস্তুর উপর বা কোনো চেতনাগ্রাহ্য বিষয়ের উপর। যেমন মনে করো, কেউ যদি উচ্চতর চেতনার স্তরে উঠে অন্যদের মধ্যে সেই চেতনাকে সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারে, তাহ'লে তার সেই বিশেষ অনুভূতির মূল্য কতক প্রমাণিত হবে, যদিও তা কেবল আংশিকভাবে, কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি আরো বেশী উঁচুতে উঠে পূর্ণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছয় আর এখানকার বাহ্য জগতের জটিল অসঙ্গতির মধ্যেও সেই উচ্চ সঙ্গতির অবস্থা এনে ফেলতে পারে, তাহ'লে তাই দেখে আবার মনে হয় বাস্তববিচারী বিজ্ঞানীর মনের কাছেও তা প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে; যদি দেখা যায় যে বর্তমান জগতের এই বিভ্রান্তিজনক চেহারাটা বদলে গিয়ে তা অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও সুসঙ্গত ও সুখকর হয়ে উঠলো, তাহ'লে তেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণকে আর অস্বীকার করা চলবে না। এবং যদি ব্যাপারটা আরো বেশী অগ্রসর হয়ে শ্রীঅরবিন্দের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অতিমানসের শক্তি ও চেতনা ও আলো এসে জগৎকে বাস্তবিক রূপান্তরিত ক'রে দিয়ে এখানে এক নবজাতির সৃষ্টি ঘটায়, তাহলে কেউই তাদের সেই অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারবে না—যদি অবশ্য তারা বর্তমান মানুষদের চেয়ে বাস্তবিক অন্যরূপ হয় আর সেই পার্থক্য আমাদের অশেষ খুঁৎযুক্ত ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রের কাছেও ধরা পড়ে—যেমন মানুষের প্রথম আবির্ভাবে বানর প্রভৃতি নিম্নজন্তুদের কাছেও তা লক্ষিত না হয়ে পারেনি।

তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে যে সব চেয়ে চূড়ান্ত প্রত্যয়জনক প্রমাণ হলো শক্তির কাজ দেখানো প্রমাণ, আনন্দ ও সত্যের অনুভূতির চেয়ে তা আরো বেশী জোরালো। আর সেই নবসৃষ্ট জাতি যাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ও টেঁকসই হয় তার জন্য তাদের দুর্ধর্ষ পার্থিব শক্তিদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া চাই, শুধু উপযুক্ত শক্তির জোরেই তেমন রক্ষা মিলতে পারে, কাজেই সে শক্তি বাহ্য কৃত্রিম মেকি হলে চলবে না, বিজয়ের তেজসম্পন্ন তা খাঁটি জিনিস হওয়া চাই। সুতরাং এমন হওয়াই সম্ভব যে অতিমানসের ক্রিয়াতে সামঞ্জস্য, আলো, সৌন্দর্য ও আনন্দ আসবার আগে তার দ্বারা রক্ষাকারী শক্তির ক্রিয়াটাই প্রকট হবে। অবশ্য সে ক্রিয়াকেও সার্থক করবার জন্য তার ভিত্তিতে জ্ঞান ও সত্য, প্রেম ও সঙ্গতি মূলগতভাবে থাকবে, এবং এই জিনিসগুলি পরে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে যখন সর্বজয়ী তেজ ও শক্তির ক্রিয়াতে ভালো ক'রে ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।

কিন্তু এর কিছুটাও বাস্তবে সম্ভব করতে হলে আমাদের ভিত্তিতে থাকা চাই সম্পূর্ণ অহংবর্জিত সাম্যভাব, ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাঁর সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি হেতু সম্যক শুচিতা। পূর্ণ সাধনার ভিত্তি যেখানে নেই সেখানে অতিমানস শক্তির আবির্ভাব খুবই বিপজ্জনক, এবং তাকে সাধনার অবস্থার মধ্যে টেনে আনা একেবারেই উচিত নয়, কারণ তার কণামাত্রও এমন ভীষণ শক্তিশালী যে তার দ্বারা সমস্ত দেহযন্ত্রটাই ছারখার হয়ে যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটা বিশেষ উপদেশ তোমাদের দিয়ে রাখি: এগিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষায় এবং আশ্রমের ব্যস্ততায় যেন উপরের শক্তিকে নিজের দিকে জোর ক'রে টানতে যেও না। বরং নিজেকে তার কাছে উৎসর্গ ক'রে দাও, নিত্য-আত্মবিস্মৃত থেকে যথাসম্ভব অনাসক্তভাবে নিজেকে তার দিকে খুলে ধরো, ভিতরের গ্রহণযোগ্যতা যতটা পারো বাড়াতে থাকো; কিন্তু তাকে তোমার দিকে টানতে যেও না, কারণ তা করলে এক মারাত্মক অহং-তৎপরতা ছাড়া আর কিছুই করা হবে না। আশ্রম যতদূর সম্ভব করতে পারো, নিজেকে যত ইচ্ছা খুলে দিতে পারো, নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে পারো, কিন্তু পাবার জন্য লোভী হাত বাড়িও না। সফল না হলে লোকে সেই শক্তিকেই দোষ দেয়, কিন্তু সে তার জন্য দায়ী নয়, দায়ী হলো নিজেদেরই দুরাকাঙ্ক্ষা, অহংপ্রাবল্য নিজেদের আধারেরই অজ্ঞানতা ও দুর্বলতা।

অনাসক্ত হয়ে নিজেকে নিবেদন করো, তাহ'লে ভিতর দিকে তোমার কিছুই অনিষ্ট হবে না। কিন্তু প্রাপ্তির চেষ্টা করতে গেলেই ভয়াবহ গভীর খাদের কিনারায় গিয়ে উপস্থিত হবে।

* *

প্রশ্ন: ব্যক্তিত্বের অর্থ কি, তা কি আসলে অহংভাব নয়?

উত্তর: এই ভুলটি প্রায়ই করা হয়। জিনিস দুটি যদি একই হতো তাহ'লে অহং মাত্রই যখন মিথ্যা ও ধ্বান্তি, তখন ব্যক্তিত্ব মিথ্যা ও ধ্বান্তি হয়ে দাঁড়াতো, যেমন বুদ্ধ ও শংকর বিবেচনা করতেন। কিন্তু তা নয়, ব্যক্তিত্ব জিনিসটার উৎপত্তি স্বয়ং ভগবান থেকে। অহং একটা সাময়িক বিকার মাত্র, কেবল সাময়িক প্রয়োজন মেটাতে; যখন তার কাজ ফুরিয়ে যায়, সত্যচেতনা যখন এসে পড়ে, তখন ওটি ঘুচে যায়।

চেতনা একটাই, সর্বত্র সব কিছুর মধ্যে সেই একই জিনিস, এই হলো সৃষ্টির মূল রহস্য। কিন্তু যে মুহূর্তে তা পরিব্যাপ্তি নিয়ে অভিব্যক্ত হচ্ছে, তখনই বহু হবার প্রয়োজনে তা টুকরো টুকরো হয়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, তার প্রত্যেকটি গুঁড়ো নিয়ে এক এক ব্যক্তিসত্তার সূচনা।

প্রত্যেকটি ব্যক্তিস্বরূপের ভিতরকার ঐ যে গুঁড়ো, ব্যক্তির পক্ষে তা-ই হল জীবন-সূত্র বা জীবন-সত্য। তা যদি না থাকতো তাহ'লে তাকে নিয়ে আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব গড়াই সম্ভব হতো না। হয়তো এক একটা দল বা সমষ্টির জিনিস তৈরি হতে পারতো, কিন্তু

আলাদা আলাদা ব্যক্তিচেতনা নয়। এক যখন বহুতে রূপ নিচ্ছে, তখন তারা জনে জনে সেই একেরই উপাদানকে বিভিন্নভাবে বিকাশ করছে। বস্তুত সেই একই চেতনার, একই সত্তার, একই নিয়মের বহু বহু অংশোপাদান রয়েছে, বিশ্বের মধ্যে তাই বহুধা বিক্ষিপ্ত হয়ে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র রকমের ব্যক্তিত্বে প্রকাশ পেয়েছে।

সেই ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশের প্রয়োজনেই প্রতি ব্যক্তিসত্তাকে তার উৎস মূল থেকে তফাৎ হতে হয়। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তিত্ব নিয়ে থাকার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায়, অর্থাৎ তার ভিতরকার মূল সত্যটিকে পুরোপুরি জানা হয়ে যায়, তখন বহুত্বের অবস্থার মধ্যে থেকেও গভীরতর একাত্মবোধের দ্বারা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মূলের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠ হয়।

দৃশ্যমান জগতে এমন অন্তিমবৈচিত্র্যের কারণই হলো এই ; বিশ্বকে সেই ভাবেই গড়া হয়েছে, যাতে এখানে এমন বৈচিত্র্যই ফুটে উঠতে পারে। অনন্ত এই ভাবে নিজেকেই নিজের কাছে উন্মীলিত করছেন, যাতে নিজেকেই তিনি সম্যক জানতে পারেন।

* * *

প্রশ্ন : মনের দ্বারাই কি সব কিছু বিচার করা ও জানা যায়?

উত্তর : মনকে কখনো বিচারক হতে দেবে না, কোনো জিনিস বা কোনো মানুষ সম্বন্ধে। তাকে বলবার অধিকার দেবে না যে এটা ভালো আর ওটা মন্দ, এটা ঠিক আর ওটা বেঠিক, এ মানুষটির অমুক দোষ আর ঐ মানুষটির তমুক দোষ। কারণ মন বিচার করে তার মূঢ়বুদ্ধি দিয়ে—আসল জ্ঞান তার নেই, সত্যদৃষ্টিও নেই।

জ্ঞান হলো মনের চিন্তার রাজ্যের বহু উপরকার জিনিস, এমন কি চিন্তার মাধ্যমে যে বিশুদ্ধভাব নেমে আসে তারও অনেক উপরকার। যদি তুমি চিন্তাকে ছাড়িয়ে বিশুদ্ধ ভাবের রাজ্যে গিয়ে পড়ো, তবুও সেখানে জ্ঞানের নাগাল পাও না, কারণ ভাব হলো তার নিম্নতর তরজমা মাত্র।

জ্ঞানে পৌঁছতে চাই কেবল একাগ্রতা।

অথচ এই সামান্য মানব মন, যার দৌড় কেবল স্থূলচেতনা পর্যন্ত, সে আবার তার বিচার ক্ষমতা সম্বন্ধে, তার নিজের দেখা ও জানা সম্বন্ধে কতই না নিঃসন্দেহ! সে আবার তার হাস্যকর উচ্চতার মঞ্চে বসে রায় দিতে থাকে : "এটা খারাপ, এটা অনুচিত" কিংবা বলে : "হাঁ, এটা ভালো।"

যদি এরূপ বিচারক না হয়ে তুমি সত্যিকার সুবিচারক হতে চাও তাহ'লে মন থেকে মতামত দিয়ে ফেলার আগে প্রত্যেক জিনিসটিকে অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করবে। স্থির হয়ে সব কিছু দেখেশুনে তার পর আপন সর্বোচ্চ চেতনার কাছে তাকে তুলে ধরবে, আর তেমনি স্থিরভাবে অপেক্ষা করতে থাকবে।

তখন ক্রমশ দেখতে পাবে যে খুব ধীরে ধীরে যেন বহু দূরের বহু উপর থেকে একটা

আলোর মত নেবে আসছে তোমার মধ্যে। সেই আলোর দ্বারাই তুমি সত্যের খানিকটা বুঝতে পারবে।

* * *

প্রশ্ন : এ কেমন করে হয় যে চেতনার উচ্চস্তর থেকে দেখা যায় কোনো সত্তাকে, অথচ এ জগতের ঘটনাচক্র তার সার্থকতাকে অস্বীকার ও ব্যর্থ করে দেয়?

উত্তর : তুমি যদি তোমার দৃষ্টিকে আরো দূরে আরো ছড়িয়ে দিতে, তাহ'লে দেখতে পেতে সেই সত্যটি বাস্তবে সফল হলে তার কি পরিণাম হতো।

মনে করো তোমার বোধবৃত্তির লাইন ধরে তুমি বরাবর এগিয়ে চলেছ।

আমি এখানে "লাইন" কথাটি বলছি, কারণ তোমার দৃষ্টি তেমন ব্যাপক হয়নি যাতে চারিদিকের গোল (global) পরিধি নিয়ে সমস্তটাই তুমি দেখে দেখে চলতে পারো, কাজেই যেমন ভাবেই দৃষ্টিপাত করো তাতে বিশ্বের অনেকটা অংশ বাদ পড়ে যাবে। তাই বলছি লাইন ধরে দেখা, অর্থাৎ তার পরিধি এতই কম যে বরাবর খানিকটা অংশ মাত্রই দেখবে আর অধিকাংশ বিশ্বই তোমার কাছে যেমন অন্ধকার ছিল তেমনি থেকে যাবে।

যদি তুমি সৃষ্টিকার্যের সমস্তটা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না ক'রে আপাতত যেটুকু রাস্তা তৈরি হয়েছে তাই ধরে এগিয়ে যাও—কারণ সত্তাও যেমন ক্রমশ তৈরি হয়ে ওঠে রাস্তাও তেমনি ক্রমশ তৈরি হয়ে ওঠে—অর্থাৎ জগতের বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী যেটুকু সত্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাকেই উপলব্ধি করতে অগ্রসর হও, তাহ'লে তার ফল কি হবে? সমগ্রের সম্পর্কে তোমার সব কিছু ওলটপালট হয়ে যাবে, সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যটুকু নষ্ট হয়ে যাবে, কারণ বিশ্বের অনেকটা অংশই তোমার আয়ত্তের মধ্যে আসেনি। ভগবানকে সমগ্রভাবে না জেনে তাঁর একটু সামান্য অংশমাত্রই জানা হবে, তাতে শেষ পর্যন্ত যেমন করা উচিত তার কিছুই করা হবে না।

তাই বলছি অধৈর্য হয়ো না, হতাশ হয়ো না, দমে যেও না, যদি এমন দেখ যে বাস্তবিকই যা সত্য তার কিছুটা তোমার জানা হলেও জগতের বর্তমান অবস্থা তাকে সফল হতে দিলে না। প্রচুর ধৈর্য নিয়ে গভীর জ্ঞানের সঙ্গে নিজেকে এই কথা বোঝাবে যে তুমি সত্যকেই দেখে-দেখেছিলে বটে কিন্তু তা পূর্ণ সত্য নয়, সমগ্র সৃষ্টিকে আলিঙ্গন করে নিয়ে সত্য নয়, অর্থাৎ বর্তমানের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তা সত্য নয়। তুমি অকালে সেই সত্যকে সফল দেখতে চেয়েছিলে, কিন্তু কাল পরিপক্ক হয়নি বলে ঘটনাচক্র তার অনুকূল হলো না। ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার উপযুক্ত সময় না আসে।

যতই ধৈর্য ধরতে পারবে ততই শেষের জয়লাভ করবে।

* *

প্রশ্ন : পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি সম্পর্কে ?

উত্তর : যদি সত্য কথা বলতে হয় তাহ'লে এ সম্পর্কে আগাগোড়া সকল কথাই বলতে হয়। আমার এই আশী বছরের মধ্যে এত অসংখ্য রকমের উল্টোপাল্টা অভিজ্ঞতা জড়ো হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত এই কথাই বলতে পারি, সবই সম্ভব। অতএব যদি আমি ভিতরের সূত্রটিকে বাদ দিয়ে কেবল অতীত জন্ম গুলির ঘটনার কথাই বলি তাহ'লে তার থেকে তোমাদের মনে একটা গোঁড়া রকমের ধারণা এসে যাবে। একদিন তোমরা নজির দেখিয়ে বলবে, "মা নিজে বলেছেন এটা, নিজে বলেছেন ওটা"। হায়, এমনি করেই একতরফা গোঁড়া মতের সৃষ্টি হয়।

এটা জেনে রাখো যে অভিজ্ঞতা হয়েছে অসংখ্য, তার সকল কথা বলতে বা লিখতে সারাজীবন লেগে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মোটের উপর ধরে নাও যে সব রকমই সম্ভব, তাই নিয়ে কোনো গোঁড়া মত দাঁড় করানো উচিত নয়। এর পরে মোটামুটি কতকগুলি সাধারণ নিয়মের কথা বলি।

কেউ যখন আপন দিব্য আদিমূলের সঙ্গে চেতনায় সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যেতে পারে, কেবল তখনই সে তার সমস্ত বিগত জন্মের স্মৃতির সম্বন্ধে জানতে এবং বলতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে আত্মা পর পর বিভিন্ন আধারের ভিতর দিয়ে উত্তরোত্তর বিকাশপ্রাপ্ত হতে থাকে। যখন সে তার বিকাশের চূড়ায় গিয়ে ওঠে তখন তার একরকম দৃষ্টি খুলে যায়, তার দ্বারা সে কোন পথ দিয়ে কেমন ক'রে এতটা রাস্তা চলে এসেছে তার সম্পূর্ণটাই তার কাছে প্রতীয়মান হয়, তখনই সে পূর্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি ফিরে পায়।

কিন্তু সে-স্মৃতি মনের স্মৃতির মতো নয়। যারা বলে যে কেউ মধ্যযুগের অমুক সময়ে জমিদার হয়ে জন্মেছিল, কিংবা কেউবা অমুক স্থানে অমুক কালে অমুক নামুষটি হয়ে জন্মেছিল, তারা নিজেদেরই মনের কল্পনার দ্বারা প্রতারিত হয়ে ঐরূপ বলে। যথার্থ বিগত-জন্মের স্মৃতি যা থাকে তা দিয়ে এমন রঙিন চিত্র হয় না যে আমি রাজা হয়ে মস্ত প্রাসাদে বাস করতাম, বা সৈন্যদলের মস্ত সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ জয় করেছিলাম। এগুলো নিতান্তই গল্পকথা। স্মৃতি থাকে বিশেষ ক'রে সেই সব সময়ের, যখন তোমার চৈত্যপুরুষ সত্তার ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, অচেতনা থেকে চেতনায় প্রকট হতে পেরেছে, অর্থাৎ যে যে সময়ে তুমি পূর্ণচেতনায় উপনীত হতে পেরেছ। বিবর্তনের চক্রে চেতনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার মধ্যে যে যে বিশেষ সন্ধিক্ষণে তোমার চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়ে এক একটা মোড় নিয়েছে, স্মৃতি থাকে কেবল তারই।

পূর্ব জীবনে যখন সেই বিশেষ মুহূর্তের ভিতর দিয়ে যাচ্ছ, তখন তুমি কোন ব্যক্তিটি হয়ে কোথায় বাস করছিলে, তাই নিয়ে কোনো গুরুত্বই থাকে না, তখন তুমি কোন শহরের

কেমন পৌরজন ছিলে তার স্মৃতিটা তুচ্ছ হয়ে যায়। বরং ঐ সব তুচ্ছ বাহ্য জিনিসের, গৌণ ও ভঙ্গুর জিনিসের স্মৃতি মুছে যায়, যাতে আসল আত্মার উন্মীলনের বা ভগবৎ স্পর্শ-লাভের পূর্ণ জ্যোতিটাই স্মৃতির মধ্যে অম্লান থাকে। যখন অতীতের সেই সকল মুহূর্তের কথা তোমার চেতনায় ভেসে ওঠে, তখন তার স্মৃতি এতই তীব্র হয় যে মনে হয় তা এখনও জাগ্রত রয়েছে, আমাদের বর্তমান জীবনের সাধারণ স্মৃতির চেয়েও তা অনেক বেশী সুস্পষ্ট। কখনো কখনো স্বপ্নের মধ্যে যেমনি এক বিশেষ চেতনার স্তরে চলে যাও, অমনি ঐ ধরনের এক একটা উজ্জ্বল ও বর্ণাঢ্য স্মৃতি জেগে ওঠে যা জাগ্রৎ জগতের সকল কিছুর চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে অন্তরঙ্গ করতে থাকে। তার কারণ ঠিক সেই সময়টিতে তোমার মধ্যে প্রকৃত চেতনা জেগে উঠেছে, তাই তখন যা দেখছো তা তোমার কাছে অসাধারণ রকমে স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, সাধারণ চোখের দেখার চেয়ে আরো অনেক পরিষ্কারভাবেই তখন-কার সব কিছুকে দেখছো।

আত্মার স্পর্শ পাবার সেই বিশেষ মুহূর্তগুলিতে আমাদের জীবনধারা নতুন মোড় নিয়েছে, এগিয়ে গিয়েছে সামনে আরও খানিকটা, চেতনারও হয়েছে আরো প্রসার ও বৃদ্ধি। ওরূপ মুহূর্ত প্রায়ই আসে এক এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে, এমন এক গুরুতর ও মর্মান্তিক অবস্থায় যখন সমগ্র সত্তাটাই অতিমাত্রায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে, তার ব্যাকুলতা এতই তীব্র হয়েছে যে তখন গত্যন্তর না থাকায় অচেতনার কঠিন খোলস কেটে আভ্যন্তরীণ চেতনা তার পূর্ণ দীপ্তিতে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। সত্তার মধ্যে এমনি কোনো ব্যাকুল আহ্বান যখন অত্যন্ত প্রবল হয় তখন তার ডাকে ভগবানের অংশবিভূতিও উপর থেকে নেমে আসতে পারে, তখন তোমার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার ব্যক্তির একজোট হওয়াতে একটা অসাধারণ কিছু ক্রিয়া সাধাও হয়ে যেতে পারে, কিংবা তার দ্বারা কিছু সংগ্রামও জয় হয়ে যায় কিংবা নতুন কিছু ব্যক্তও হয়ে যায়। আবার সে কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে সেই অংশবিভূতি ফিরে চলে যায়। কিন্তু এমনি দৈব সংঘটনের মুহূর্তগুলিতে কি কি ঘটেছিল তার স্মৃতিটি থেকে যায় তোমার মধ্যে, তারপর তুমি সে দৃশ্য পুনরায় দেখতে থাকো, তখন কোন বর্ণের পোষাক তোমার গায়ে ছিল, তোমার গায়ের বর্ণই বা কেমন ছিল, আশপাশের পরিবেশ কেমন ছিল—এ সব আনুষঙ্গিক জিনিসের ছাপ তোমার স্মৃতি থেকে কখনই মোছে না, কারণ যা ছিল সাধারণ ঘটনা তাই তখন তোমার কাছে তাদের সত্যকার রঙে দেখা দিয়েছিল। এইভাবে যে চেতনা তোমার কাছে প্রকট হয় তা আবার সর্ববস্তুর মধ্যে রয়েছে বলে তোমার কাছে প্রকাশ পায়। এই সব খুঁটিনাটির সাহায্যে তুমি কখনো কখনো আবিষ্কার করতে পারো যে কোন যুগে তুমি জন্মেছিলে বা কেমন কাজটি করেছিলে, কোন দেশে থাকতে, আবার তা দিয়ে চমৎকার উপন্যাস রচনা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করাও তেমনি সহজ।

তবে এমন মনে কোরোনা যে পূর্বজন্মের স্মৃতি মানেই এমনি সন্ধিক্ষণের স্মৃতি, একটা মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের, একটা দিব্য প্রকাশেরই কেবল স্মৃতি। স্মৃতির সে-সব মুহূর্ত হতে পারে

একান্ত সরল, স্বচ্ছ—যখন সত্তার একটা পূর্ণ সঙ্গতি প্রকাশ পেয়েছে, পরিপূর্ণ নিরেট সম্বতি। পারিপার্শ্বিক বাহ্য অবস্থা তখন হয়তো একান্ত সাধারণই।

যাই হোক সেই বিশেষ মুহূর্তগুলির সংশ্লিষ্ট পরিবেশ ছাড়া এবং নিগূঢ় চৈত্যসত্তার স্পর্শ পাবার সময়টি ছাড়া আর বিশেষ কিছুই স্মৃতিতে থাকে না। তার কারণ সেই বিরল মুহূর্তটি পার হয়ে গেলেই চৈত্যসত্তা আবার তার নিগূঢ় সুষুপ্তির মধ্যে তলিয়ে যায়, ফলে বাহ্য-জীবন আবার তার গতানুগতিক একঘেয়ে চালে চলতে থাকে, স্মৃতির মধ্যে তার কোনো ছাপই পড়ে না। এখন যেমন উপস্থিত জন্মে তুমি প্রাত্যহিক একটানা জীবন যাপন ক'রে চলেছ, হয়তো কয়েকটি বিশেষ মুহূর্তের জন্য তুমি মন প্রাণ বা দেহের দিক থেকে সত্তার শীর্ষদেশ দু এক বার স্পর্শ করতে পারছো, নতুবা সারা জীবনের বাকি অংশটা একই উদাস রঙের ছবি, অমুক দেশেই থাকো বা তমুক দেশেই থাকো, অমুক কাজেই থাকো বা তমুক কাজেই থাকো তাতে কিছুমাত্র যায় আসে না,—ওর বেলাতেও অনেকটা ঠিক তেমনি ব্যাপার। তোমার নিজের জীবনের গত কুড়ি কিংবা ত্রিশ কিংবা চল্লিশ বছরের কথাই ভেবে দেখ, তার আগাগোড়া এক বছরে দেলে নিয়ে যদি তার লম্বা ইতিহাসের মোটামুটি নির্যাসটুকু স্মরণে আনতে চাও, তখন দেখবে যে ওর ভিতরকার মাত্র দুই তিনটি ছবিই আপনা হতে চোখের সামনে ভেসে উঠছে, আর বাদ বাকি সব কিছুই বেমালুম মুছে গেছে। তোমার নিজের চেতনার মধ্যেই এমনি বাছাইএর কাজ আপনাআপনি হয়ে যায়, আর বিস্তর জিনিস তার চালুনির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। এর থেকেই কতক ধারণা পাবে যে জন্মান্তরের স্মৃতির মধ্যে কতটা কি থাকতে পারে বাছা বাছা বিশেষ কয়েকটা মুহূর্ত, আর বাকি সব একেবারে মোছা।

এ কথাও সত্য যে বিবর্তনের লম্বা ইতিহাসে মানুষের প্রথম প্রথম দিকের জন্মগুলি খুবই প্রাথমিক, তার মধ্যে খুব সামান্যই টেঁকসই জিনিস থাকে, হয়তো দু'একটি ছাড়া ছাড়া স্মরণের স্মৃতির আঁচড়। কিন্তু চেতনা যতই গোলার দিকে এগোতে থাকে আর চৈত্যসত্তা বাহ্যসত্তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে আসে, স্মৃতির দিকটাও ততই বাড়তে থাকে আর তা সুসম্বদ্ধ ও সুস্পষ্ট হতে থাকে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও যা স্মৃতি থাকে তা আত্মারই স্পর্শ ও চৈত্য বিকাশের সম্পর্কে, সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল বা দৃশ্যপরিবর্তন কি কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে নয়। এতেই বুঝবে যে আগেকার পশুজীবনের স্তরের যে সব স্মৃতি সম্বন্ধে বলা হয় তা নিতান্তই অলীক : পশুজীবনের অবস্থায় দিব্য চেতনার স্ফুলিঙ্গ এতই নীচে চাপা পড়ে থাকে যে তার পক্ষে চেতন হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে বাহ্যজীবনের ক্ষেত্রে দেখা দেওয়া সম্ভব নয়। যখন তুমি সর্বদিক দিয়ে পূর্ণচেতনায় পরিণতি লাভ করবে আর আপন আদি-উৎসের সঙ্গে একেবারে মিলে যেতে পারবে, তখনই বলতে পারবে জন্মান্তরের কথা স্মরণ হচ্ছে।

* * *

প্রশ্ন : যদি অতিব্যক্তির সব কিছু জড়ের মধ্যেই থাকে সম্পুটিত অবস্থাতে, তাহ'লে

অতিমানস ছাড়া আরো কিছু কি তার মধ্যে গোপন থাকতে পারে, যা অতিমানসের পূর্ণ বিকাশ হবার পরে তখন বেরিয়ে পড়তে দেখা যাবে?

উত্তর : হাঁ, যুক্তি অনুযায়ী সেই কথাই বলতে হয়, কারণ জড়বস্তুর সঙ্গে তার আদি উৎসের মৌলিক একাত্মতা রয়েছে।

* * *

প্রশ্ন : নিবর্তনও কি কালক্রমে ঘটেছিল, আর বিবর্তনের যেমন ইতিহাস আছে তেমনি নিবর্তনেরও কি কোনো ইতিহাস আছে?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর অনেকটা নির্ভর করছে প্রশ্নকর্তারই মনোভাবের উপর। পণ্ডিতের কাছে শোনা যাবে যে এ বিষয়ে বিভিন্ন মতে বিভিন্ন রকম কথা বলেছে। এক সম্প্রদায়ের তত্ত্বদর্শীরা (metaphysicians) বলবে যে সে-রকম কিছু ইতিহাসই নেই, কারণ তাদের বুদ্ধি একান্তই তর্কনির্ভর, দার্শনিক এবং অতিসূক্ষ্ম, তারা বলবে যে এ বিষয়ের ইতিহাস মাত্রই শিশুদের ভোলাবার কাহিনী। আবার যারা মনস্তত্ত্ববিদ্ তারা বলবে যে চেতনার ক্রিয়াতেই সব কিছু আবহমান হয়ে চলেছে। কিন্তু আরো অনেকে এমন আছে যারা জিনিসটাকে পর পর ছবির মতো দেখে, বিশ্বের ইতিহাস তাদের কাছে বিরাট পর্দার উপর ধারাবাহিক সিনেমা ছবির মতো, সেই ভাবে ক্রমে ক্রমে যা কিছু গড়া হয়েছে তাই হলো জীবন্ত ও বাস্তব ইতিহাসের চিত্র, সাংকেতিক চরিত্রের হলেও এর থেকে আগাগোড়া সব কিছুর মর্ম স্পষ্ট ও নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়।

বলা বাহুল্য তিন রকমের ব্যাখ্যাই সমান সত্য, কেবল তোমাকে সেগুলির সমন্বয় ক'রে একটা সামঞ্জস্য ক'রে নিতে হবে। আপাতত আমাদের ঐ দার্শনিকদের তরফের নীরস মতবাদের কথাটা বাদ দেওয়া যাক, ওগুলি পরে পণ্ডিতদের লেখা বই পড়লেই ভালো ক'রে জানতে পারবে, তারা নিখুঁতভাবে শুষ্ক বিচার ক'রে তা বুঝিয়ে দিয়েছে। আর মনস্তত্ত্বের তরফের মতটি...তা সে বিষয়ে মুখে বলার চেয়ে নিজেদের জীবন থেকে বুঝে নেওয়াই ভালো। তাহ'লে বাকি রইল কেবল শিশুদের শোনবার উপযুক্ত কাহিনী। আমাদের পক্ষে চিরদিন শিশু থাকাই ভালো, আর যদি সেই সব ইতিহাস কাহিনীকে গোঁড়াভাবে অন্ধবিশ্বাস নিয়ে গ্রহণ না করি, কিংবা তার একটু আধটু এদিক ওদিক হলেই অমনি তাকে মারাত্মক অপরাধ বলে মনে না করি, তাহ'লে অন্তত এইটুকু করতে পারি যে এ সব কাহিনী ধরে আমাদের শিশুচেতনায় ফুটে উঠবে জাগ্রত জীবন্ত এমন জিনিসটি যা অন্যথা থাকবে বহু বহু দূরে।

এই যে অল্পবিস্তর সত্য, অল্পবিস্তর সম্পূর্ণ, অল্পবিস্তর অর্ধজ্ঞাপক অনেক গল্প শোনা গেছে তার মধ্যে একটি আমাদের বেছে নিতে হবে। যদি তুমি নিজেকে অন্তরের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে কিম্বা সবের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে—কারণ এক হিসাবে দুইই আসলে সমান

ব্যাপার—এই কাহিনীকে জীবন্ত করে তুলতে পার তোমার জীবনে—আংশিকভাবে ও তার প্রধান ধারাগুলি দিয়ে হলেও—তাহলে জানবে সৃষ্টির রহস্য, তারপর জয় করবে তার যত কার্য্যকারণের সূত্র। কেউ কেউ বাস্তবিক তেমনি করেওছে, তাদেরই বলা হয় গুণী বা অগমবাদী বা ভবিষ্যদর্শী, আমরাও তাই পেয়েছি অনেক সুন্দর সুন্দর গল্পেতিহাসের কথা।

আমিও সংক্ষেপে তেমনি একটি গল্প তোমাদের কাছে বলছি। একে গল্প বলেই ধরে নিও, উপদেশবাণী বলে মনে কোরো না।

ভগবান নিজেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে যখন নিজের ভিতরকার জিনিসকে বাইরে রূপ দিতে ইচ্ছা করলেন, তখন প্রথমে তিনি ভিতরের জ্ঞানচেতনাকে ও শক্তিকে জগৎসৃষ্টির কাজে বাইরে ছেড়ে দিলেন। সেই জ্ঞানচেতনা ও শক্তি বাইরে ছাড়া পেয়ে তাদের কাজ শুরু ক'রে দিলে। ভগবৎ-ইচ্ছার মধ্যে একটা কিছু পরিকল্পনা ছিল, তার মূল সূত্র ছিল আনন্দ ও মুক্তি, তার নিকর্ষ অর্থে, তাতেই ধারণা হয়েছিল যে এই সৃষ্টির ব্যাপারটি খুব উপভোগ্য হবে।

কিন্তু নিকর্ষ আনন্দ ও মুক্তিকে প্রত্যক্ষে রূপায়িত ক'রে তোলবার জন্য উপযুক্ত বাধ্যবের দরকার হলো। তাই প্রথমে চারটি মূল সত্তাকে এনে ফেলা হলো, যারা জগৎ গড়বার বাস্তব কাজগুলো শুরু ক'রে দেবে। তাদের কারিগরি বাস্তবে অভিব্যক্ত হওয়া চাই, যাতে ভগবানের ভিতরকার অরূপ ও শক্তিগর্ভ জিনিসগুলি বাইরের রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে। সেই চারটি সত্তার নাম যথাক্রমে চেতনা ও জ্যোতি, প্রাণ, প্রেম ও আনন্দ, এবং সত্য।

অস্তিত্ব লাভ করেই এরা দেখলে যে জনে জনে এরা প্রবলতম শক্তি, দুর্ধর্ষ এদের তেজ, যেহেতু মূল গুণগুলি এদের মধ্যে মৌলিক ভাবেই রয়েছে। এরা আরো দেখলে যে এরা একেবারে মুক্ত ও স্বাধীন, কারণ সৃষ্টির কাজের জন্য তেমনি স্বাধীন করেই এদের জন্ম দেওয়া হয়েছে। তাই যখন এরা কাজ শুরু করলে তখন কে যে কোন কাজটা কেমনভাবে করবে তা প্রত্যেকেই নিজের নিজের মতলব অনুযায়ী ঠিক ক'রে নিলে। প্রত্যেকেই স্বাধীন ছিল বলে কেউ কারো মত নিলে না। তারা যে একজন কারো গোলাম বা যন্ত্র মাত্র, এ কথা ভুলে গিয়ে মনে করলে যে সকল বিষয়ে তারাই খোদ কর্তা।

এমনি এদের ভুলবোঝা থেকেই শুরু হলো জগতের যত কিছু গণ্ডগোলের প্রথম সূত্রপাত। স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে তাঁর এই সব অংশবিভূতিদের ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়াতে যেমনি একটা পার্থক্য এসে গেল—ঐ ভুলবোঝাই তার মূল কারণ—অমনি যিনি চেতনা ছিলেন তিনি হয়ে দাঁড়ালেন তার উল্টো অচেতনা, যিনি আলো ছিলেন তিনি হলেন অন্ধকার, প্রেম হলেন অপ্রেম, আনন্দ হলেন বেদনা, প্রাণ হলেন মৃত্যু, সত্য হলেন অসত্য। এইভাবে অদলবদল ঘটিয়ে তাঁরা যথেচ্ছভাবে সৃষ্টির বেহিসেবি কাজ করতে থাকলেন।

তারই ফলে জগৎ এমন হয়েছে, যেমন আমরা একে দেখছি। ধাপে ধাপে, একটির পর একটি ক'রে অনেক কিছুরই সৃষ্টি হলো, তার সব কাহিনী শোনাতে অনেক বেশী

সময় লেগে যাবে। শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ালো তা হলো অন্ধকার নিশ্চেতন, শোকার্ত জড়। কিন্তু স্বয়ং আদ্যাশক্তি, যাঁর থেকে এই চারটি সত্তা সৃষ্টির জন্য জন্ম পেয়েছিল, তিনি যাগা-গোড়া সব কিছুই দেখছিলেন, তিনি এবার ভগবানের দিকে ফিরে প্রার্থনা জানালেন, যা কিছু অপকর্ম হয়ে গেছে তা যেন এবার শুধরে যায়।

তখন আদেশ হলো, প্রকৃত চেতনা প্রবেশ করুক নিশ্চেতনার মধ্যে, প্রকৃত প্রেম বেদনার মধ্যে, প্রকৃত সত্য হোক অসত্যের মধ্যে। তখন আগের চেয়ে আরো বৃহত্তর চেতনা, গভীরতর প্রেম ও পূর্ণতর সত্য গিয়ে প্রবেশ করল জড়ের অন্তর্গূঢ় তিমিরের মধ্যে, সেখানে থেকে তারা আবার আগেকার চেতনা ও প্রেম ও জ্যোতিকে জাগিয়ে তুলবে, বিশ্বকে তার মূল উৎপত্তির ভূমিতে পুনরুদ্ধার ক'রে আনবে।

এই হলো জড়ের মধ্যে চেতনার নিবর্তনের কারণ ও তারই ক্রমিক কাহিনী। এখন তারই পরিণামে অতিমানসের আবির্ভাব হচ্ছে নিশ্চেতনার অন্তস্তল থেকে, কিন্তু কেউই বলতে পারে না যে এই অভিব্যক্তির পরে আরো কোনো অভিব্যক্তি আছে কিংবা নেই, কারণ যিনি সব কিছুর আদি তিনি অফুরন্ত, নতুন নতুন জগৎ সৃষ্টির তাঁর শেষ নেই।*

* Bulletin of physical Education VoL X. No. I থেকে শ্রীগুপ্তি ভট্টাচার্য কর্তৃক অনূদিত

কলিকাতায় শ্রীমার জন্মোৎসব

জয়ন্তী মৈত্র

কলকাতায় এবার মায়ের তিনদিনব্যাপী জন্মোৎসব কাল শেষ হয়ে গেল। এ তিনদিন আনাহারের সময়টুকু ছাড়া প্রায় সারাদিনই ওখানে কাটিয়েছি, এবং প্রতি রাত্রেই বাড়ি ফিরতে এগারোটা সাড়ে এগারোটা হয়ে গিয়েছে। আজ সকাল থেকে সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়াতে ভীষণ খালি খালি ঠেকছে আর মন খারাপ লাগছে।

বহুদিন থেকে এই উৎসবটির জন্যে প্রতীক্ষা করে ছিলাম। সেইজন্যে ২০শে ফেব্রুয়ারী কর্মকর্তারা এসে সেই দিন সন্ধ্যায় রিহার্সাল দেখতে যাবার জন্যে যখন আমাদের বলে গেলেন, তখন মন আনন্দে ভরে উঠলো। আমরা সন্ধ্যাবেলা সেখানে গেলাম; সিংহী পাকের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ও মনোরম বাগানে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। বাগানটি অজস্র ফুলে ভরা। গিয়ে দেখলাম বাগানের একপাশে একটি প্রকাণ্ড ষ্টেজ বাঁধা হয়েছে, এবং একসঙ্গে দুহাজার দর্শকের বসে দেখবার মতো একটি বৃহৎ মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া অবশ্য অনেক কিছুই তখনো অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছিলো। আমার সেদিন যা দেখে বিশেষ ভালো লাগলো, সেটি হচ্ছে মিস্ত্রী মজুর থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকের কর্মে নিষ্ঠা। দেখে মনে হলো যেন সকলে মিলে একটা পুণ্যকাজে সহায়তা করছে। চারিদিকের সেই অসম্পূর্ণ ব্যবস্থার মধ্যেই বিভিন্ন দল এসে তাঁদের অনুষ্ঠানের মহড়া দিয়ে গেলেন। এঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন বিদেশী, এবং এঁরা ২১শে সন্ধ্যাবেলায় যে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে তার প্রস্তুতির জন্যে এসেছিলেন। এইখানেই Indo-Soviet Cultural Association-এর পক্ষ থেকে আসা Madam Vladimirova-র সঙ্গে আলাপ হলো। এই ভদ্রমহিলার ছাত্রছাত্রীরা একটি রুশদেশীয় লোকনৃত্য দেখাবেন। প্রসিদ্ধা দক্ষিণ-ভারতীয়া নর্তকী চন্দ্রলেখাও সেদিন ওখানে ছিলেন; তাঁর সঙ্গেও আলাপ করে খুব ভালো লাগলো। সেদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে সাড়ে নটা পর্য্যন্ত ওখানে থেকে আমরা বাড়ি ফিরলাম। এই প্রস্তুতিতে গিয়েই খানিকটা আন্দাজ করতে পারলাম আসল অনুষ্ঠান কি সুন্দর হবে। সমস্তক্ষণ মনে হচ্ছিল কখন কাল সকাল হবে।

বহুপ্রতীক্ষিত ২১শে ফেব্রুয়ারির সকালবেলা মায়ের পতাকা উত্তোলন, March past, ধ্যান ও প্রসাদ বিতরণ করে উৎসব আরম্ভ করা হলো। সেইদিন সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখি, রঙিন আলো দিয়ে সমস্ত বাগানটি সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। ঢোকবার সময়ে মনে হচ্ছিল যেন কোনো মায়ার রাজ্যে প্রবেশ করেছি। মঞ্চটি শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের ছবি, নানারঙের উৎকৃষ্ট ফুল প্রভৃতি দিয়ে অত্যন্ত সুরুচিসম্মতভাবে সাজানো হয়েছিল, এবং ধূপ-

ধূনো দিয়ে সুরভিত করা হয়েছিলো। এই অনুষ্ঠানে শ্রীদিবাকর সভাপতিত্ব করলেন, মায়ের নিজের কণ্ঠে বাণী রেকর্ডে সকলকে শোনানো হলো, শ্রীঅরবিন্দের "সাবিত্রী" থেকে কিছু অংশ শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র পাঠ করলেন, এবং সবশেষে একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলো। এতে বিভিন্ন বিদেশী প্রতিষ্ঠান—যেমন British Council U.S.I.S. Alliance Française প্রভৃতি—যোগদান করেছিলেন। প্রথমে U.S.I.S. এর তরফ থেকেএকজন মার্কিণী ভদ্রলোক Whitman এর কাব্য থেকে পাঠ করলেন; তারপরে জর্মন রাষ্ট্রদূত দপ্তরের পক্ষ থেকে দুজন জর্মন ভদ্রলোক গ্যেটের Faust থেকে পড়লেন। তারপরে স্থানীয় একটি চীনা স্কুলের ছোটো ছোটো মেয়েরা তাদের নাচ দেখালো। এর পরে মাদাম ভ্লাডিমিরেভার ছাত্রছাত্রীরা একটি সুন্দর রুশ লোকনৃত্য দেখালেন। রং-চঙে রুশ পোশাকপরা ওঁদের এই নাচের ভঙ্গিতে কোন্ দূরবিদেশের মায়া মাখানো ছিলো। ওঁদের সঙ্গে একটি বাঙালি যুবকও বেশ ভালো নাচলেন। আর রুশ সঙ্গীতাচার্য্য সেমানস্কির একজন শিষ্য ও শিষ্যা চমৎকার গাইলেন। তারপর Alliance Française-এর পক্ষ থেকে কয়েকজন বাঙালী মেয়েপুরুষ Molière-এর 'Le Medicin Malgré Lui' নামক নাটকের একটি দৃশ্য অভিনয় করলেন। এঁদের ঝলমলে পোশাক-পরিচ্ছদ ও অনায়াস ফরাসিকথনে এঁরা যে ফরাসি নন, বাঙালি, একথা বোঝা ছিলো কঠিন। ভাষা না বুঝলেও এঁদের অঙ্গভঙ্গি ও মুখের অভিব্যক্তি দেখে দৃশ্যটি খুব উপভোগ করলাম। এরপরে British Council থেকে একজন ভদ্রলোক ও একটি ভদ্রমহিলা Hamlet ও Romeo Juliet, এবং Bernard Shaw-র St. Joan থেকে অংশবিশেষ পাঠ করে শোনালেন। সেদিন মায়ের message রেকর্ডে শোনবার ঠিক আগেই হঠাৎ সমগ্র বালিগঞ্জ-অঞ্চলের বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধ হয়ে আলো নিভে গিয়েছিলো। আলো ফিরে আসতে আধঘন্টাটাক দেরি হলো। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অতক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে সভার সমস্ত কাজ বন্ধ থাকলো বলে কেউ বিচলিত হয়ে ছুটোছুটি হৈ হৈ লাগিয়ে দেননি, পরিবেশের এমনি মাহাত্ম্য যে সবাই ধৈর্য্য ধরে সম্পূর্ণ নীরবে যে যার আসনে বসেছিলেন।

দ্বিতীয়দিন দুপুরবেলা নানারকম খেলাধূলো, মনোতোষ রায় ও তাঁর সম্প্রদায়ের শারীরিক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন, ও ছোটদের একটি অনুষ্ঠান হোলো। ছোটোদের এই অনুষ্ঠানে কল-কাতার শিশু-রংমহলের পরিচালনায় জানপানী রূপকথা অবলম্বনে "জিজো" নামে একটি নৃত্যনাট্য অভিনীত হোলো। এতে আগাগোড়া ছোটোরাই নেচেছে ও অভিনয় করেছে। এই নৃত্যনাট্যে মকলসজ্জা, আলোকসম্পাত, ও অভিনয়—সবই খুব উপভোগ্য হয়েছিলো।

২২শে সন্ধ্যাবেলা এবং ২৩শে সকাল ও সন্ধ্যায় শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের রচনা সম্বন্ধে তিনটি আলোচনা-সভা বসেছিলো। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে অনেক নামকরা পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিলো। এই সভার তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন ডক্টর শিশিরকুমার মৈত্র। সভা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল বজ্রপাত ও বৃষ্টি

আরম্ভ হলো। প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্যে সভার কাজ আধঘণ্টার মতো স্থগিত রাখতে হলো। অধিবেশন আবার শুরু হলে ডক্টর শিশিরকুমার মৈত্র একটি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন, এবং সভায় অনেকেই এটির খুব প্রশংসা করলেন।

সবশেষে তৃতীয়দিন রাত্রে একটি নাচগানের আসর বসেছিল। এই আসরের বিশেষ আকর্ষণ ছিলো চন্দ্রলেখার ভারতনাট্যম্ নাচ। এ ছাড়াও বিখ্যাত সেতারী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝ-রাত্রির রাগে ভাবি মিষ্টি সেতার বাজালেন, আর পঙ্কজ মল্লিক ও মৃদু গুপ্ত কয়েকটি গান করলেন। চন্দ্রলেখার নাচ দেখে সত্যিই অবাক হলাম। নাচের আঙ্গিক ও সূক্ষ্ম কলাকৌশল নিপুণভাবে আয়ত্ত তো করেইছেন, তার সঙ্গে আছে অদ্ভুত grace। একমাত্র উদয়শঙ্কর ও তাঁর সম্প্রদায়ের নাচ ছাড়া এরকম আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করে আগেই ভালো লেগেছিলো, এখন তাঁর নাচ দেখে তেমনি মুগ্ধ হলাম। শুনলাম মায়ের কাজ বলে চন্দ্রলেখা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোনো পারিশ্রমিক না নিয়েই মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে তাঁর নাচ দেখিয়েছেন। সেইদিন রাত্রে নাচগানের আসর আরম্ভ হবার সময়েও বৃষ্টি থামেনি, কিন্তু মায়ের কৃপায় এর জন্যে অনুষ্ঠানে কোনো বাধাবিঘ্ন অথবা বিশৃঙ্খলা হয় নি। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই বহুলোক এসেছিলেন।

এ ছাড়া, আশ্রমবাসীদের তোলা আলোকচিত্রের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আর মায়ের নিজের আঁকা কয়েকটি ছবির আলোকচিত্র ও এই-উপলক্ষে-আনা তাঁর একজোড়া sandal একটি কাঁচের কেসে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিলো।

এই উৎসবের আয়োজনে ত্রুটিবিচ্যুতি অল্পই ছিলো; আর সকল ব্যবস্থার ভিতরে ছিল শুধু কর্মকুশলতা নয়, একটি শ্রদ্ধার মনোভাব। যাঁরা এতে যোগ দিয়েছিলেন, মনে হলো সকলেই খুশি হয়েছেন, এবং উৎসবস্থলে পৌঁছে নিশ্চয়ই আমাদের মতো আরো অনেকের মনে হয়েছে যেন তীর্থদর্শনে এসেছি।

১৫ আগস্ট

১৯৫৮

মায়ের শুভ্র আলো হল ভাগবত চেতনার আলো। ক্রমে তুমি এরই আশ্রয়ে এসে জীবন যাপন করছ—এই বস্তুই তোমাকে মুক্ত করে চলেছে।

শ্রীঅরবিন্দ

মায়ের প্রার্থনা

৩০ ডিসেম্বর, ১৯১৬

ভগবান, হৃদয় আমার কেন মনে হয় এমন স্থির এমন শুষ্ক?

আমি বেঁচে আছি, অনুভব করছি, দেখছি আধারের ভিতরে অন্তরাত্মাও আমার বেঁচে আছে, তোমাকে প্রত্যক্ষ করছে, মেনে চলেছে তোমাকে প্রতি জিনিসের মধ্যে; যা-কিছু মনের মধ্যে তোমাকেই ভালবাসছে—পূর্ণ সজাগ সে এ বিষয়ে আর তার অনুগত হল বাহ্যসত্তা, সুতরাং বাহ্যসত্তাও তেমনি সজ্ঞান। মন জানে তা, কখন ভোলে না। প্রাণ-সত্তাও এখন বিশুদ্ধ, অনুরাগ-বিরাগ তার আর নাই, ক্রমেই সর্বদা ও সর্বত্র তোমার সান্নিধ্যের আনন্দ অনুভব বেড়ে চলেছে। কিন্তু হৃদয় ঘুমিয়ে, একটা অবসাদের সুপ্তি নিয়ে; তার মধ্যে যথেষ্ট কর্মঠতা নাই যাতে অন্তরাত্মার প্রেরণায় সে পূর্ণ সাড়া দিতে পারে। কেন? এতই নির্জীব ছিল কি সে, যে লড়াই করে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, এমন গভীরভাবে আহত হয়েছে যে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে? কিন্তু তবুও ত সে চায় অন্তরের ডাকে সাড়া দিতে—তা সে চায় চির-অবিচল নিষ্ঠা ও উৎসাহ নিয়ে। কিন্তু এ যেন বৃদ্ধের মত—তরুণদের খেলায় সে দেখায় তার সন্তোষ তার সমাদর, কিন্তু নিজে তাতে যোগদান করতে পারে না। তবুও সে আনন্দে নির্ভরে পরিপূর্ণ, প্রকৃতি তাকে মুক্তহস্তে দান করেছে যত অনুরাগ-ঐশ্বর্য সে জন্য কৃতজ্ঞতায় পরিস্নুত সে। সে ত চায় এই সব মহার্ঘ্য দানের প্রতিদানে যাতে অফুরন্ত ধারায় সে ছড়িয়ে দিতে পারে সেই প্রাণদায়ী শক্তিদায়ী সুখকর সান্ত্বনাকর রসধারা, যা হল মানুষী জীবের পক্ষে সত্যকার সঞ্জীবনী সুধা। সে ত আকাঙ্ক্ষা করে, চেষ্টাও করে...কিন্তু যা করতে হবে বলে স্বপ্ন দেখে তার তুলনায় কি তুচ্ছ যা সে করে; যা আশা করে—চিরকাল যা আশা করে এসেছে—তার তুলনায় কি যৎসামান্য যা সে করতে পারে। সে জানে তোমার ডাক কানে পৌঁছিলে তা কখন ব্যর্থ হয় না—আর যে-সব ঐশ্বর্য আভাসে তুমি তাকে দেখিয়েছ, কোন সংশয় নাই সে-সবই একদিন তার অধিগত হবে।

স্রোতের মুখে এই যে বন্ধ দরজা কে তা খুলে দেবে?

হৃদয় আমার ভালবাসে মানুষীভাবে, আর মনে হয় মানুষীভাবেই ভালবাসে তার সামর্থ্য নিষ্ঠা আর শুভ্রতা নিয়ে। তবে তুমি চাও সে যেন ভালবাসে দিব্যভাবে, তোমার শক্তির অসীম ক্রমপ্রসারের মধ্যে—কিন্তু এ বস্তু এখনো তার অনধিগত।

কে খুলে দেবে স্রোতের মুখে এই যে বন্ধ দরজা?

৪ জানুয়ারী, ১৯১৭

ভগবান, দানে দানে তুমি আমায় ভরে দিয়েছ—কিন্তু এই যখন এ-আধার জীবনের কাছে আর-কিছু প্রত্যাশা করে না, কামনা করে না, ঠিক তখনি জীবন কাছে এনে ধরেছে যত তার অমূল্য সম্পদ, যা-কিছু নানুষমাত্রেরই কাছে লোভনীয়। ব্যক্তিগত প্রত্যেক ক্ষেত্রই তোমার দানে ভরে গিয়েছে—মনের ক্ষেত্র, অন্তরাত্মার ক্ষেত্র, এমন কি স্থূলবস্তুর ও ক্ষেত্র পর্য্যন্ত। তুমি আমায় প্রাচুর্য্যের মধ্যে এনে ধরেছ, সে প্রাচুর্য্য দৈন্যের মতনই সমান স্বাভাবিক, তাতে আমায় যে বেশি আনন্দ এনে দেয় তা নয়; কারণ দৈন্যেরই মধ্যে প্রায় দেখি আধ্যাত্মিক জীবন হয়ে উঠেছে বেশি তীব্র, বেশি সচেতন। তবে এই প্রাচুর্য্যও রয়েছে দেখছি স্পষ্ট—আমার ব্যক্তিগত সত্তা তোমার এই সব দানে যে ভরে উঠেছে সে-জন্য তোমার কাছে প্রণত, কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ভাষা নাই তার।

দয়া তোমার অতুলন, করুণা তোমার অফুরন্ত।

৫ জানুয়ারী, ১৯১৭

তোমার যে দিব্য ফুলের তোড়াটি, তার সব ফুল এক সঙ্গে বেঁধে ধরে রাখে এক সূত্র—প্রেম ছাড়া তা আর কিছু নয়। তবে সে কাজ হল নেপথ্যে, অনাড়ম্বর অনাদৃত—মূলতঃ তা নির্ব্যক্তিক, সুতরাং এই নির্ব্যক্তিকতারই মধ্যে তার পূর্ণ সার্থকতা।

আমি ক্রমেই হয়ে উঠছি এই সূত্র, এই বন্ধন-গ্রন্থি, তোমার চেতনার বিক্ষিপ্ত খণ্ড সব সে একত্রিত করে রেখেছে, তাদের সুব্যবস্থিত করে তুলছে যাতে তারা তোমার যে চেতনা যুগপৎ একক ও বহুল তাকে সুষ্ঠুতরভাবে পুনর্গঠিত করতে পারে; এতেই আমার পক্ষে সুস্পষ্ট দেখা সম্ভব হয়েছে বিশ্বশক্তিরাজির লীলায় প্রেম কি বস্তু, তার স্থান কি, ব্রত কি—নিজে সে একটা শেষ লক্ষ্য নয়, সে হল তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সক্রিয় সে, সর্ব্বত্র সে, সকলের অন্তরে সে; তবে যে জিনিসকে সে এক করে ধরে আছে, তাই তাকে আবার ঢেকে রেখেছে এবং ফলে নিজেই তার অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছে।

ভগবান, তোমার মাধুর্য্য আমার অন্তরে প্রবেশ করেছে, আমার সমস্ত সত্তা তুমি আনন্দে ভরে দিয়েছ।

আর এই আনন্দের মধ্যে আমার এক প্রার্থনা উঠল তোমাকে চেয়ে, তা যেন পৌঁছে যায় তোমার কাছে।

৬ জানুয়ারী, ১৯১৭

আমার সত্তা তুমি অবর্ণনীয় শান্তি, অতুলনীয় শ্রান্তি দিয়ে পূর্ণ করেছ—ব্যক্তিগত কোন চিন্তা বা ইচ্ছা না রেখে, নিজেকে আমি ছেড়ে দিয়েছি তোমার আনন্ত্যের ছন্দের দোলায়।

৮ জানুয়ারী, ১৯১৭

আমার হৃদয়ের মধ্যে, আমার মস্তিষ্কের মধ্যে তুমি এনে দিয়েছ নীরবতা, কিন্তু এই নীরবতার গভীরে থেকে কোন কণ্ঠ ত ওঠে নাই। শান্তি একমাত্র অতিথি, মধুর মঙ্গলময় অতিথি হয়ে বিরাজ করে।

১০ জানুয়ারী, ১৯১৭

তুমি কি আমায় এই শিক্ষা দিতে চাও যে যা-কিছু আমার চেষ্টা আমার নিজেকে লক্ষ্য করে তা হবে ব্যর্থ নিরর্থক? শুধু সেই কর্মই হবে সহজ ও সরল যার উদ্দেশ্য তোমার করুণা-বিকিরণ। সঙ্কল্প যখন নিযুক্ত বহির্মুখী কর্মে তখন তা হয়ে ওঠে দেখি শক্তিমান ও ফলপ্রসূ, কিন্তু যখনি অন্তর্মুখী কর্মে নিযুক্ত হতে চেষ্টা করে তখন হয়ে পড়ে নির্বীর্য ও নিষ্ফল।... তাই ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য যা-কিছু কর্ম গ্রহণ করি তত বেশি তা নিষ্ফল হয়ে চলে, ক্রমে বিরল হয়ে ওঠে। অন্যপক্ষে, বাহিরের কর্ম সেই অনুপাতে ফলশালী হয়, অন্তরের কর্ম যত হয় নিষ্ফল। এই রকমেই, ভগবান, যন্ত্রটি যেমন, তেমনিভাবেই তুমি তাকে গ্রহণ করেছ; তাকে যদি পাণিত হয়ে উঠতে হয়, তবে তা সে হবে কর্ম করতে করতে।

১৪ জানুয়ারী, ১৯১৭

"অসুখীরা সুখী হোক, দুষ্টেরা শিষ্ট হোক, রোগীরা সুস্থ হোক।" এই মন্ত্রে রূপ গ্রহণ করল আমার যে আশ্রুহা বর্তমান আধারের ভিতর দিয়ে চায় তোমার দিব্য প্রেমের প্রকাশ। আমি চেয়েছি, সন্তান যেমন করে চায় পিতার কাছে আর নিশ্চিত জানে যে সে চাওয়া তার পূর্ণ হবে। আমি চেয়েছি, নিশ্চিত ছিলাম বলেই এমন সহজ স্বাভাবিক তা মনে হয়েছিল। অন্তরে আমি বেশ অনুভব করেছি, কেমন করে তা সম্ভব। একটা অজ্ঞানময় দ্বন্দ্বের মধ্যে, অনিচ্ছায় যা সহ্য করে চলতে হয় তার মধ্যে, সর্বদা কষ্ট করে শ্রম করে চলার চেয়ে আনন্দ থেকে আনন্দে, সুন্দর থেকে সুন্দরে ক্রমে উঠে চলা কি স্বাভাবিক নয়, ফলপ্রদও নয়? তোমার দিব্য প্রেমের স্পর্শ দিয়ে তুমি যদি হৃদয়কে স্বচ্ছন্দে বিকশিত হতে দাও, তবে এ রূপান্তর সহজ ও আপনা থেকেই ঘটে।

ভগবান, তুমি কি তা করবে না, তোমার করুণার নিদর্শন হিসাবে?

শিশুর পূর্ণ নির্ভর নিয়ে আজ এই সন্ধ্যায় আমার হৃদয় তোমার কাছে মিনতি জানায়।

১৯ জানুয়ারী, ১৯১৭

নিমেষ সব চলে যায় নিষ্ফলা স্বপ্নের মত...

২৩ জানুয়ারী, ১৯১৭

আমার সত্তাকে এমন পূর্ণ এমন তীব্র প্রেম দিয়ে, সুষমা দিয়ে ভরে তুলেছ যে সে-সব অন্যত্র সঞ্চারিত না হওয়া অসম্ভবই মনে হয় আমার। এ যেন একটা জলন্ত অগ্নিকুণ্ড—সেখান থেকে চেতনার স্ফুলিঙ্গ দীপ্ত কণা সব দূরে নিক্ষিপ্ত করেছে, এরা আবার হৃদয়ের গোপন অন্তরে ঠিক অনুরূপ সব আগুন জ্বালিয়ে দিতে চলেছে, তোমার দিব্য প্রেমের আগুন, ভগবান, সেই যে প্রেম মানুষী জীবকে তোমার দিকে অনিবার্য্যভাবে প্রচালিত করে, আকর্ষণ করে। হে আমার মধুময় ভগবান, এ যেন আমার আনন্দ-বিভোল চেতনার দর্পন মাত্র না হয়, তা হয় যেন এমন বস্তু যা ঘটায় জীবের বস্তুর সত্যকার রূপান্তর।

এই যে প্রেম, এই যে সুষমা, এই যে আনন্দ আমার হৃদয়কে পরিপ্লাবিত করে দিয়েছে, এমন করে যে তাদের বেগ সে আর ধারণ করতে পারছে না—ঠিক তেমনি করেই তারা যেন পরিপ্লাবিত করে দেয় তাদের চেতনা যাদের আমি দেখেছি, যাদের চিন্তা আমার মনে উঠেছে, যাদের চিন্তা কখন করি নাই, যাদের কখন দেখি নাই তাদেরও...সকলে যেন জেগে ওঠে, পায় তোমার অসীম আনন্দের চেতনা।

হে আমার মধুময় ভগবান, তাদের হৃদয় ভরে দাও আনন্দে, প্রেমে আর সুষমায়।

২৫ জানুয়ারী, ১৯১৭

হে জ্যোতির্ম্ময় প্রেম, আমার সব সত্তাকে পূর্ণ করেছ তুমি, তাকে উৎসবের ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করেছ—তোমাকে গ্রহণ করা হল কি, তোমাকে দান করা হল কি? কে বলবে তা? কারণ তুমি নিজেই তোমাকে গ্রহণ কর, নিজেই তুমি তোমাকে দান কর—তুমি অপ্রমেয় দাতা ও গ্রহীতা যুগপৎ, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে, প্রত্যেক সত্তার মধ্যে।

ভগবতী জননী

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

মানুষী দুর্বলতায় আচ্ছন্ন আমরা ভগবতী জননীকে দেখি শুধু জননী রূপে, ভুলে যাই যে তিনি আবার ভগবতী। তাঁর এই অপরূপ পরিচয়ের প্রথম অংশই সহজে আমরা পূর্ণ হিসাবে গ্রহণ করি, অপর অংশটিও যে সমান তাৎপর্যপূর্ণ তা লক্ষ্য হয় না। সন্তানের উপর মানুষী মায়ের যেমন স্নেহ-মমতা, তাঁর কাছ থেকেও আমরা তেমনই স্নেহ-মমতা প্রত্যাশা করি। আমরা তাঁকে সেই মানুষী ভালোবাসা, মানুষের অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভালোবাসা—তার মধ্যে লোভ আর ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনা, আধিপত্যের বাসনা সর্বত্র, মা হলেন যেন আমাদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার নিমিত্ত মাত্র।

মা অবশ্যই মা, তবে ভগবতী মা। তিনি চান তাঁর কাছে আমরা যাই মানুষীভাবে নয়, দিব্যভাবে। এই দিব্যভাবেই আমরা উঠে যাই আমাদের সত্তার উত্তুঙ্গ শিখরে, পৌঁছি গভীরতম গভীরে, তাঁকে পাই পরিপূর্ণভাবে নিঃশেষে, তাঁর করুণার অমৃতধারায় অবগাহন করে উঠি। মানুষী ভাব মানবীয় বোধ অনুভবের ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতার মধ্যে কেবল আমাদের বেঁধে রাখে। অত্যধিক আদরে নষ্ট সন্তানের ধারা হল এই মানুষী ধারা। এক্ষেত্রে অন্তরের নিভৃততম তলায় এক বিন্দু সত্যকার ভালোবাসা থাকলেও তা রয়েছে পুঞ্জীভূত অজ্ঞান আর রাশীকৃত পঙ্কিল ক্লেদের মধ্যে ডুবে। এই ধূলি-জঞ্জাল আমাদের মলিন করে, আমাদের প্রেমাস্পদকেও স্পর্শ করে।

তবুও, ভগবতী হয়েই তিনি জননী। ভগবতী বলে সুদূরের নিস্পৃহ কেউ নন, বিশ্বাতীত ব্রহ্মের মতো নির্বন্ধ উদাসীন নন। বস্তুত, ভগবতী জননীর মাতৃস্নেহ মানুষী মাতার স্নেহকে বহুগুণে ছাড়িয়ে যায়। এই মানুষী মা সেই আদি জগতে দিব্য জননীর একটা অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি বা প্রতিচ্ছায়া মাত্র, কখনো কখনো একটা বিকৃতিই।

বিশ্বাতীত হয়েও ভগবতী জননী নেমে এসেছেন এই আমাদের মানুষী আধারে, আমাদেরই মতো হয়েছেন, আত্মাস্বরূপ হয়ে আমাদেরই অন্তরে রয়েছেন, সঙ্গে থেকে হয়েছেন সাথী দিশারিণী। আমরা যখন অনুগত হতে পেরেছি তখন তিনি হাত ধরে নিয়ে চলেছেন আমাদের, দেখিয়েছেন কি করে আমাদের ক্ষুদ্র মানুষত্বকে পার হয়ে যেতে হয়, আর দেখিয়েছেন আমাদের ভালোবাসা যদি যথেষ্টভাবে জাগে তাঁর ভালোবাসার স্পর্শে তবে—সেই তাঁর প্রেমের দৈবশক্তিতে কি করে আমরা আমাদের আপন দিব্য সত্তা ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ হয়ে উঠি।

আমরা মায়ের প্রকৃত সন্তান হতে পারি যদি স্মরণে রাখি তাঁর এই দ্বিবিধ সত্য, তাঁর প্রেমের দুই বাহু—যা দিয়ে তিনি আমাদের রেখেছেন ঘিরে, করুণাভরে।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

"দেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার নবী এবং মানব-প্রেমিক"—সত্যই শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন এ সবই, এই কথাগুলি দিয়েই শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ হয়ে তাঁর আইনবিদ অনুগামী বন্ধুটি দাঁড়িয়েছিলেন, বলেছেন তিনি, ইংরেজের বিচারশালার সামনে নয়, ইতিহাসের বিচারকক্ষের সম্মুখে। শ্রীঅরবিন্দ এই তিনটি গুণের জীবন্ত মূর্তি অবশ্য, তবে আজ আর একটি বিশেষণ যোগ করলে তাঁর বর্ণনা সম্পূর্ণ হয়। তিনি হলেন দিব্য-জীবনের স্রষ্টা। বাস্তবিক পক্ষে এইটি অন্তরালে থেকে তাঁর মধ্যে সর্বদাই সক্রিয় ছিল, এটিই তাঁর অপর কর্মধারাকে দিয়েছে তাদের যাকিছু অর্থ ও তাৎপর্য, যাকিছু পরিপূর্ণ সার্থকতা। তাঁর কাজ ছিল মানুষের বিবর্তন, ক্রমোন্নতির ধারার—তা ছিল তাঁর জীবন-সাধনা। মানব-বিবর্তনের সোপানগুলি তিনি বলেছেন এই রকম :

"পরিবার, দেশ, মানবজাতি, এই তিন ক্রম হল একাকীত্ব থেকে একতাবদ্ধ সমগ্রত্বের দিকে বিশ্বের ত্রিপদক্ষেপ। প্রথমটি সিদ্ধ হয়েছে, দ্বিতীয়টির পূর্ণ সাফল্যের জন্য এখনো প্রয়াস করে চলেছি আমরা, তৃতীয়টি লাভের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা আমাদের এবং তার সফলতার গোড়াপত্তনও শুরু হয়ে গিয়েছে।"

তবে রহস্যের রহস্য রয়েছে বিশ্বের চতুর্থপাদে—মানবত্ব থেকে দেবত্বে উত্তীর্ণ হওয়ায়। বিবর্তনের লক্ষ্যই তাই—সকল সমস্যার সমাধান এরই মধ্যে। পরিবার, দেশ কিম্বা মোটের উপর মানবজাতির মধ্যে সর্বত্রই রয়েছে একটা দ্বন্দ্ব, একটা গতি-পরাঙ্মুখতা, একটা হতাশা ও ভগ্নোদ্যম; এগিয়ে যাবার প্রয়াসটিও যেন দূরে সরিয়ে দেয় শুভ ও শান্তিকে, আরো গিয়ে পড়ে সংঘর্ষের সংকটের মধ্যে। অবশ্য, অন্য রকমটি আশা করাই অসঙ্গত। মানুষ যদি তার নিভৃততর বৃত্তি ও সত্তায় সত্যই চায় পূর্ণাঙ্গ পূর্ণতা তবে তাকে পেতে হবে তার পরমার্থ পরমকে, পেতে হবে তাকে যা তার মধ্যে গভীরতর ও মহত্তর। নিজত্বের গণ্ডী পার হয়ে ছাড়িয়ে যেতে পারলেই আত্মসিদ্ধি সম্ভব। পরিবার, দেশ, মানবজাতি—সকলেরই আজ এক নূতন সংজ্ঞা নূতন অর্থ প্রয়োজন। শ্রীঅরবিন্দের কথায়, 'দেবত্ব'ই হল সেই অর্থ।

তবে জানা দরকার দেবতারও আবার রকম-ভেদ আছে। এক দেবতা হলেন যুগপৎ এই বিশ্বসৃষ্টিকে আলিঙ্গন করে আশ্রয় করে এবং তাকে ছাড়িয়ে তার ঊর্ধ্বে। তিনিই সর্বব্যাপী সত্য, সর্ববিসারী চেতনা, পরিবর্তনশীল সর্বভূতান্তরস্থ অপরিবর্তনীয় শাশ্বত অব্যয়।

জগতের প্রগতি-লীলা-প্রয়াসে অসম্পৃক্ত তিনি। তিনি নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত। এই দেবতা যেন সব নীরবে বহন করে চলেন সহ্য করে চলেন। আর এক দেবতা যিনি তিনি সব গড়ে তোলেন—নিজেও সেই সঙ্গে গড়ে ওঠেন; অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে গড়েন, আবার সম্মুখে গড়ে ওঠেন নিজে। এই সক্রিয় দেবতাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন 'অতিমানস ঈশ্বর' অথবা মূর্ত ভগবতী জননী।

বিবর্তনের অনিবার্য ধারায় মানুষ তার মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করে যাবেই। তার অর্থ নয় সে নিজেই অপ্রয়োজনীয় বলে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, প্রাগৈতিহাসিক কালের অতিকায় জীবজন্তুর মতো। তার অর্থ পার্থিব সৃষ্টির পুরোধা হয়ে থেকেও তার ঘটবে এক আমূল পরিবর্তন, রূপান্তরিত সে হয়ে উঠবে ভাগবত জীব।

মানুষ আজ পর্যন্ত মনোময় পুরুষ—তার মন, তার যুক্তিবুদ্ধিই তাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং এরই মাধ্যমে আবার সে নিয়ন্ত্রণ করে এই জগৎ। কিন্তু মনই তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ কিম্বা পরম বৃত্তি নয়, চেতনার শেষ ধাপও নয়। মনের ওপারে আছে অন্য সবর্ণ চেতনার স্তরাবলী—উষ্ণীষের মতো বেরিয়ে—একটির উপর আর একটি, যেমন বলেছে ঋগ্বেদ। মানুষ সেখানে পৌঁছিতে পারে, বসবাস করতে পারে, তাদের নামিয়ে আনতে পারে এই মর্ত্য-জীবনাধারে, তাদেরই স্বরূপে একে গড়ে তুলতে পারে। এই স্তরাবলীর শীর্ষে যা তাকে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন ঋতচিৎ বা অতিমানস। এই জ্যোতির্ময়ী পরাশক্তি—জ্যোতিরুত্তরম্—তার দিকে চলেছে সৃষ্টি, তা-ই অলক্ষ্যে থেকে সৃষ্টিকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে। সুষীম সংসিদ্ধির তা নাভিকেন্দ্র।

অল্প শক্তি নিয়ে, নিম্নস্তরের দেবতাদের সাহায্য নিয়ে মানুষ সচেষ্ট তার জীবন ও পরিবেশ পুনর্গঠনে। পূর্ণ সাফল্যও তাই তার অলভ্য থেকে গিয়েছে। কার্যত দেখা গিয়েছে প্রত্যেক সাফল্যের উন্নতির যুগের পর এসেছে একটা ব্যর্থতার অধঃপতনের যুগ, যেন সুবর্ণ-যুগের পর লৌহ-যুগ। তাকিয়ে দেখলে সত্যই মনে হয় মানুষ যেন আজ বন্দী হয়ে রয়েছে লৌহপিঞ্জরে। তার সামর্থ্য, তার আকাশচুম্বী সম্ভাবনা, তার প্রয়োজনের তুলনায় এই পৃথিবী একান্তই স্বল্পপরিসর—চাঁদের দেশে গিয়ে উঠবার তাই তার পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা তার জীবন-সংকটের একটা সাংকেতিক প্রতিচ্ছবি মাত্র। মানুষের অন্তরাত্মা তার চরম সংকটে এসে পৌঁছেছে—সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক, নৈতিক সকল সমস্যার মনে হয় আর উদ্ধার নেই। উদ্ধারের সকল দ্বার ও রাস্তা বাহির থেকে রুদ্ধ। তাহলে উপায় কী? রাস্তা ও উপায় তাহলে অন্তরের দিকে ফেরা, আত্মমুখী হওয়া—সেদিক দিয়েই মুক্তি ও সিদ্ধির উদার পথ। সেই পথ উত্তরণের ও অতিক্রমণের পথ। অন্য সব রাস্তা পতনের পথ—তারা চলে মহাবিনষ্টির দিকে।

এই হল সময়, কাল পরিপূর্ণ এখন। এ অঙ্গুহাত দিলে আর চলবে না যে এ-পথে চলা সাধারণের সামর্থ্যের বাইরে। বললে চলবে না, সাধারণ মানুষের এইভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার, অ-মানুষী কিছু করবার, না আছে যোগ্যতা, না জ্ঞানবুদ্ধি, না প্রবৃত্তি। কারণ,

আমি বলেছি, মানুষকে যদি আলো উদ্ধার পেতে হয় তবে এই হল একমাত্র পথ, দ্বিতীয় পথ আর নেই। তারপর, সাধারণ মানুষেরই কতখানি আমরা জানি—তার যোগ্যতা তার মতিগতির কতখানি সন্ধান রাখি? স্থূলের পার্থিব বিষয়ের স্তরে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই দেখি কী বীরত্বের কাজ সে করে যায় অবলীলাক্রমে, এক এক সময়ে কী কষ্ট কী তপস্যা তারা বরণ করে নেয়, কারণ তা-ই সে-সময়ে তাদের কর্তব্য বলে। জড় আধারের শত সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও মানুষের অন্তরাত্মা অনেক বেশি শক্তিমান, আবার সর্বশক্তিমান হল ভগবৎ-করুণা।

তার অর্থ অবশ্য নয় যে গোটা মানবজাতিই একসঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে উঠে যাবে নূতন জীবনে। অবিলম্বে পরম সিদ্ধি তো প্রত্যেকের কাছেই আর আশা করা যায় না। আর শুরুতে, তার প্রয়োজনই বা কি। যুগে যুগে নূতন সৃষ্টির ভিত্তি স্থাপনা করে এসেছে কয়েক-জন পরোগামী, অগ্রদূত হিসাবে একদল বিশিষ্ট লোক। প্রথমে একটা তুষারপিণ্ড, তারপর সে যত গড়িয়ে চলে পথে তত সঞ্চয় করে করে বিশালকায় হয়ে ওঠে। আজকের একটা ছোট দলই কালকের বৃহৎ জনসমষ্টি। বিবর্তনেতিহাসের প্রত্যেক সন্ধিক্ষণেই এই রকম ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটেছে, প্রকৃতিই যেন তাঁদের পাঠিয়েছেন কিম্বা উপর থেকে নেমে এসে তাঁরা ধারণ করেছেন এই নরদেহ। বিশেষ করে প্রকৃতি যখন অলস মন্থরগতি ছেড়ে উল্লম্ফনে এগিয়ে যেতে চান তখন এই সত্য আরো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

বস্তুত, যা হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে হতে চলেছে তা প্রকৃতিরই সিদ্ধি ও সার্থকতা পরা প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে অপরা প্রকৃতির সিদ্ধি। রহস্যের এই বোধ হয় মূলকেন্দ্র। আজ পর্যন্ত, মোটের উপর বলা চলে, এই ধারণা চলে আসছিল যে অধ্যাত্ম-জীবন অর্থ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে চলা, প্রকৃতির স্রোতের প্রতিকূলে কণ্টকের উজানে যাওয়া। প্রকৃতি সেখানে ঘৃণার বস্তু, সন্দেহের বস্তু, আত্মার শত্রু বলে বর্জিত। কিন্তু সম্পূর্ণ দিক-পরিবর্তন হয়েছে আজ। দেহ আজ আত্মারই অপর দিক হিসাবে, দৃশ্য আকার রূপে প্রতিভাত—পার্থিবের মধ্যে তার প্রকাশের আধার এই জড়দেহ। প্রাচীনের জড়-অজড় আত্মা-অনাত্মার বিরোধ এবার বিলুপ্ত হল, জড়দেহও এখন অনুভব করছে প্রাচীনেরা তার যে অজ্ঞানতালিপ্ত রূপ ও প্রকৃতি দিয়েছিলেন তা অতঃপর অচল। যে-সব জড়কণা দিয়ে তৈরী এই স্থূলদেহ, তা আজ জানা গিয়েছে, একান্ত জড় বস্তুপিণ্ড নয়, তা এক শক্তির—জ্যোতির্ময় শক্তির—স্ফুলিঙ্গ। উপরের আধ্যাত্মিক আলো পৃথিবীর উপর এই স্থূল দেহকেই তার শ্রেষ্ঠ আবাস ও আধার বলে বরণ করেছে।

প্রকৃতি যে সহযোগিতা করতে উদ্যত আত্মার সঙ্গে—এ তারই ইঙ্গিত। একটা নূতন জিনিস, চিৎশক্তি হতে সঞ্জাত একটা সর্বক্ষম জ্যোতি ক্রমে সমস্ত পার্থিব পরিমণ্ডল ছেয়ে ফেলছে। মা বলছেন, এইটিই হবে নতুন সৃষ্টির বনিয়াদ বা মূল উপাদান। অধ্যাত্ম জ্ঞান, অবোধ দৃষ্টি, জ্যোতির্মণ্ডিত শক্তির উপর এক নূতন জগৎ সৃষ্টি হবেই—কারণ, মানুষ আর তার অজ্ঞানতার পঙ্কিলে ডুবে থাকতে চায় না, এক অলৌকিক প্রেরণা তাকে ঘিরে ফেলছে।

নূতন জগৎ সৃষ্টি হবে নূতন ভিত্তির উপর। পুরাতন জগৎ ছিল বহিরঙ্গ ধরে, বাহিরের সত্তা উপাদান নিয়ে—প্রকৃতির ভাণ্ডারে সে-উপাদান অপর্যাপ্ত। এ সব উপাদানের অন্য পরিচয় হল দেহের বহুধা দাবি, মনের আপন রুচি দ্বারা সমর্থিত ও চালিত প্রাণের বুভুক্ষা—তাদের সকলের প্রভু আবার অহং, ব্যক্তির পৃথক একান্ত অস্তিত্ব। নূতন জগৎ শুরু হবে অন্তরাত্মা থেকে, সেই অন্তরস্থ জ্যোতির্ময় ভাগবত সত্তা থেকে, যাকে আশ্রয় করে সর্বভূতের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে সে, ভিতর থেকে বাহিরে শতদলের মতো বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। এ যেন সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা হল নিম্নে নয় ঊর্ধ্বে—উপনিষদুক্ত বৃক্ষ যেমন ঊর্ধ্ব-মূল অবাকশাখ। এই নূতন সংগঠনে ব্যক্তি শুধু দেহ-মন-প্রাণের আবাস এবং তাদেরই দ্বারা সীমিত দেহী হয়ে থাকবে না। ব্যক্তি হবে প্রথমত এবং প্রধানত একটা চেতনা, চিৎশক্তির একটা বিন্দু বা কেন্দ্র—তার ক্রিয়া তার অস্তিত্বই এরকম অপর সব কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগে ও ঐক্যের মধ্যে, যেহেতু একটা বিরাট অখণ্ড ঐক্যের মধ্যেই সমস্ত কিছু বিধৃত। সেই নিরঙ্কুশ চেতনার ছন্দ ও সারবস্তুই গড়ে তোলে এই দেহ-মন-প্রাণ। আজকের ব্যক্তি-মানুষের যেসি যে কঠিন অহং-রূপ, যে স্বার্থপরতা, যে পশুত্ব তার প্রায় অনিবার্য পরিচয়, তা নূতন মানুষের অন্তরাত্মার দীপ্তির সামনে দূর হয়ে যাবে।

ব্যক্তির সার্থকতা ও সিদ্ধি তার অন্তরাত্মার ভিতর দিয়ে—এই অন্তরাত্মা রয়েছে সকলের উপরে, দেহ-মন-প্রাণ তারই যন্ত্র ও আত্মপ্রকাশের উপায়। তবে এ-পর্যন্ত, বিবর্তনে ক্রমোন্নতি এবং ক্রমস্ফূর্তির প্রয়োজনে এই তিনটিই যত না সহায়ক যন্ত্র হয়েছে তার চেয়ে বেশি হয়েছে বাধা। নূতন চেতনায় ব্যক্তি যখন তার আত্মার স্বমহিমায় আসীন, পায় তার দেবত্ব, তখনই সম্ভব ও অনিবার্য তার এই নিম্নবৃত্তির আমূল পরিবর্তন ও রূপান্তর। আত্মায় আত্মলোকে প্রতিষ্ঠ হওয়ার অর্থ অকুণ্ঠ নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা, সুসঙ্গতি, শুচিতা, জ্ঞান, শক্তি ও অমৃতত্ব।

ব্যক্তি যেমন এ ধারায় গড়ে উঠবে, সমাজও তেমনি পরিবর্তিত রূপান্তরিত হবে। যে সুসঙ্গতি ও পরিপূর্ণতা ফুটে ওঠে ব্যক্তির মধ্যে, সমষ্টির মধ্যেও তা প্রতিফলিত হবে। সংগ্রাম-সংক্ষুব্ধ, প্রতিযোগিতা-তৎপর সমাজের পরিবর্তে দেখব এক আশ্পৃহা নিয়ে এক লক্ষ্যের দিকে সমবেত প্রয়াসের ছবি। প্রত্যেক ব্যক্তি সেখানে জেনেছে তাকে একই দেহের একটি অঙ্গ হিসাবে, নিজের কাজটি পূর্ণজ্ঞানে নির্ভুলভাবে সুসম্পন্ন করে চলে, সেই উত্তম জ্যোতিকেই নানাভাবে প্রকাশ করে।

আজ যে মৈত্রীবদ্ধ রাষ্ট্রসংঘ গঠন দুরূহ ও প্রায় অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, নানা দেশ বিরুদ্ধ প্রবণতার স্রোতে সংকটের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, চলেছে প্রায় সমূহ সর্বনাশের দিকে—তারও আসবে এক আমূল পরিবর্তন। দেশ যেমন, দেশসত্তাও তেমনি সত্য, তা আবার এক ভাগবত সত্তাই হয়ে ওঠে যখন সে আপন আত্মায় স্বপ্রতিষ্ঠ। ব্যক্তির আত্মার মতো

সমষ্টিরও আছে আত্মা। একটা গোষ্ঠী পায় যে এক সমবেত জীবন তার সম্পূর্তি ও সমৃদ্ধির মূলে এই গোষ্ঠীর আত্মা, সমবেত জীবনের অধীশ্বর। এই গোষ্ঠীও প্রসারিত বৃহদায়তন হয়ে চলেছে। বাস্তবিক ক্ষেত্রে আজ দেখছি দেশ তার সীমা ছাড়িয়ে ফেলছে, মিলিত-রাজ্য (কমনওয়েল্থ্) বা সংযুক্তরাজ্যের (ফেডারেশন) চলন হয়েছে। এমন কি, বিশ্বযুক্তরাষ্ট্রের কথাও মানুষ ভাবতে আরম্ভ করেছে এর কিছু কার্যত সূত্রপাতও দেখা দিয়েছে, দেশ অপেক্ষা বৃহত্তর সুসংবদ্ধ গোষ্ঠী-সমষ্টি গড়ে উঠছে। অদূর ভবিষ্যতে তা অত্যন্ত প্রতিদিনের জিনিসের মতোই হয়ে উঠবে। এই সব জন-সমবায় বা গোষ্ঠী নিয়ে চলে সর্বমানব-ঐক্যের দিকে, বিশ্বমানবত্বের দিকে। আর বিশ্বমানবত্বের পরের ধাপই অতিমানবত্ব, মানবত্বের অধিক কিছু—সেই অভিনব জনসংঘের গঠনধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক, পৃথক এক চেতনার উপর তার ভিত্তি বলে।

মানব-গোষ্ঠীর আদি রূপ হল পরিবার, তা নির্দিষ্ট একটা রূপ নিয়েছে; তবে উর্ধ্বের অতিমানস-চেতনায় তারও হতে পারে সংস্কার ও পরিবর্তন। এযাবৎ রক্তের সম্বন্ধই ছিল তার মিলনের একমাত্র হেতু, এখন তার হেতু হতে পারে অন্তরাত্মার সাদৃশ্য বা নৈকট্য, চেতনার একধর্মিতা, জীবন-কর্মক্ষেত্র সহযোগী ও সহকর্মীর বন্ধুত্ব। তার অর্থ এক দারুণ বিপ্লব, প্রকৃতির বিপর্যয় একটা—আগে যেমন বলেছি, মূল যাবে উর্ধ্বে, শাখা যাবে নিচের দিকে।

এই রকম বিপুল পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে—এবং তা অপরিহার্য—যদি মানুষকে তার সহস্র ব্যাধির কবল থেকে মুক্তি পেতে হয়। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও বিশ্বগত সত্তার মধ্যে সক্রিয় ভাগবত দেহের পূর্ণ স্বাস্থ্য আসতে পারে তখনই যখন মানুষ বের হয়ে আসতে পেরেছে মনের আবরণ ভেদ করে, স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে অতিমানস পদবীতে।

বীরের উপযুক্ত এই দুরভিযান, জয়ের শোভাযাত্রায় যারা পুরোভাগে আসবে তাদেরই জন্য। তবে এর চরম সাফল্য অল্পবিস্তর সকলের ভোগে আসবে, যারা একে অস্বীকার করেছিল তারাও একদিন দেবে সম্মতি ও অবাধ আনুগত্য।

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

প্রশ্ন : ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ তারিখের কথা —

উত্তর শোনো বলি, নিম্নতর পশুদের জগতে ওদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করবার একটা সুযোগ কিছুদিন পূর্বে আমার ঘটেছিল। তাতেই নিশ্চিত জেনেছি যে নিম্নতর পশুরা আমাদের সম্বন্ধে কিছুই বোঝে না , তাদের মধ্যে যে চেতনা রয়েছে তার গঠনই এমন যে তার দ্বারা আমাদের কিছুই তাদের কাছে বোধগম্য হয় না, তারা তাই আমাদের কার্য-কলাপ দেখেও কিছু বুঝতে পারে না। অবশ্য এমন কয়েক রকম গৃহপালিত পশুদের সম্বন্ধে জানি, যেমন কুকুর বেড়াল, বিশেষ ক'রে বেড়ালরা যেন কতকটা যোগের প্রণালীতে আমাদের সঙ্গে মিলে যেতে চেষ্টা করে। যদিও আমরা সাধারণত কখন কেমন আচরণ করছি তা দেখে ওরা কিছুই বুঝতে পারে না, আমরা যে কি ধরনের প্রাণী তারও কোনো আন্দাজ পায় না, সুতরাং আমাদের সম্বন্ধে তাদের চেতনাতে প্রহেলিকাই থেকে যায়। ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে শুধু তাদের চেতনার সামান্য কিছু অংশই আমাদের সঙ্গে একটা যোগসূত্র রাখতে পারে। ঠিক এমনি ব্যাপারই আমাদের বেলাতেও, যখন আমরা উপরকার অতিমানস জগতের সম্বন্ধে বোঝাপড়ার চেষ্টা করি। পশুদের জগতের সঙ্গে মানুষের জগতের যতখানি তফাৎ, মানুষের জগতের সঙ্গে অতিমানস জগতের ততখানিই তফাৎ। আমাদের চেতনাতে যখন ঐ জগতের সঙ্গে পূর্বোক্ত ধরনের একটা যোগসূত্র তৈরি হবে, কেবল তখনই আমরা সে জগৎকে তবু খানিকটা দেখতে এবং জানতে পারবো ; কিন্তু তাও সম্পূর্ণ দেখা নয়, আমাদের সত্তার যেটুকু অংশ রূপান্তরিত হবে মাত্র সেইটুকুই দেখতে পাবে, নতুবা আমাদের জগৎ পশুদের কাছে যেমন অবোধ্য, অতিমানস জগৎও আমাদের কাছে তেমনি অবোধ্য থেকে যাবে।

এই কথারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিলাম আমার ঐ ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখের বিশেষ অনুভূতির মধ্যে। ইতিপূর্বে অতিমানসের সঙ্গে আমার যে সংযোগ ছিল তা ব্যক্তিগত ও আত্মকেন্দ্রিক, কিন্তু ঐ ৩রা ফেব্রুয়ারি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম সকলকে জড়িয়ে, সকলের মধ্যে, ঠিক যেমনভাবে আগেকার দিনে প্যারিস শহরের রাস্তায় সকলের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি, অর্থাৎ যে জগৎ কারো আত্মগত বিষয়কে গ্রাহ্যমাত্র না ক'রে তার আপন ধারায় চলেছে। সেখানে গিয়ে পড়াতে যে অনুভূতি এলো তাতে যেন সেখানকার ও এখানকার দুটি জগতের মধ্যে সেতু বেঁধে দেওয়া হলো। সেই অনুভূতির কথাই তখন আমি বর্ণনা ক'রে তোমাদের বলেছিলাম :

অতিমানস জগতের অস্তিত্ব চিরন্তনের, আর আমিও চিরন্তন কাল ধরেই অতিমানস দেহ নিয়ে সেখানে অবস্থান করছি। আজও তার প্রমাণ পেলাম বেলা ২টা থেকে ৩টার মধ্যে, যখন আমার এই পার্থিব চেতনা নিয়েই আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মোটের উপর এখন আমি এই কথা বুঝতে পারছি যে ঐ জগতের সঙ্গে এখানকার এই বস্তুজগতের নিত্যকার মিল বজায় রাখার পক্ষে দরকার হচ্ছে এক মধ্যবর্তী সেতু, যার এ পর্যন্ত অভাব ছিল। কিন্তু তা এবার তৈরি হচ্ছে, ব্যক্তিচেতনার দিক দিয়েও এবং বিষয়মুখী জগতের দিক দিয়েও, দুই ভাবেই। যখন আমি তোমাদের কাছে নতুন জগৎসৃষ্টির কথা বলি তখন এই মধ্যবর্তী সেতু গড়ে ওঠার কথাই বলি। তাই যখন আমি এদিকের এই স্থূল চেতনার জগতে থাকি, আর দেখতে পাই যে ওদিকের অতিমানস জ্যোতি ও শক্তিময় সত্তা এর জড়দেহের মধ্যে সেতু রচনা করতে এগিয়ে আসছে, তখন আমিও সে কাজে অংশগ্রহণ করি।

সেই কাজেরই প্রতীক স্বরূপ আমি দেখলাম যে আমি রয়েছি এক বিরাট জাহাজের উপর। জাহাজটি যেন এক শহরের মতো, তার ভিতরকার সকল কাজই বেশ সুব্যবস্থিত। সেখানকার পুরোপুরি সুব্যবস্থা দেখেই মনে হলো যে কিছুকাল ধরেই সেই ব্যবস্থায় সেখানকার কাজগুলি চলে আসছে। যারা অতিমানস জীবনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তারাই ওখানে বাস ক'রে তার জন্য যথোচিত শিক্ষা পাচ্ছে। সেই জাহাজের মধ্যে যারা রয়েছে তারা সকলেই ইতিমধ্যে অতিমানসের দিক দিয়ে অল্পবিস্তর রূপান্তর প্রাপ্ত হয়েছে, কারণ ওখানকার সকল কিছুই অতিমানসের উপাদানে গড়া, সে জিনিস জড়ও নয় বা প্রাণময়ও নয় বা মনোময়ও নয় বা সূক্ষ্ম দেহেরও নয়। তাকে বলা যায় প্রকৃত অতিমানস বস্তু—স্থূল জগতের খুবই কাছে আসা জিনিস, আর একটু সরে এলেই প্রকাশ পেতে পারে। সেখানকার যা আলো তা লালে-সোনালিতে মেশামেশি, ফলত তার থেকে কমলা রঙের এক জ্যোতি বেরোচ্ছে। সব কিছুই ঐ রঙের—আলোও তাই আর মানুষগুলিও তাই—যদিও তার মধ্যে গাঢ়তার তারতম্য আছে, তাতেই পরস্পরকে পৃথক করে চেনা যায়। আরো দেখা গেল যে ঔজ্জ্বল্যের ইতরবিশেষ থাকলেও কারো কিছুমাত্র ছায়া নেই। সেখানকার সমস্ত পরিবেশটাই সুশৃঙ্খল, শান্তিময়, আনন্দময়; কাজগুলি সমস্তই হয়ে যাচ্ছে নিয়মে ও নীরবে। কিন্তু ওরই মধ্যে রয়েছে শিক্ষা দেবার নানারূপ ব্যবস্থা, বিভিন্ন বিভাগ থেকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যাতে জাহাজের সকলেই সব দিক থেকে ক্রমশ প্রস্তুত হয়ে ওঠে।

সেই বৃহৎ জাহাজ সবেমাত্র তখন অতিমানসের জগতের তীরে এসে ভিড়েছে। এইবার জাহাজ থেকে প্রথম এক দল লোককে নামিয়ে দেওয়া হবে, যারা অতিমানসের জগতে প্রবেশ ক'রে সেখানকার বাসিন্দা হবার উপযুক্ত হয়েছে। তার জন্য সমস্তই প্রস্তুত। তীরে একটা জায়গা নির্দিষ্ট ক'রে রাখা হয়েছে যেখানে ওদের নামানো হবে, সে জায়গাটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সে জায়গাতে ঘাটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি; তারা কিন্তু মানব নয়, কোনোকালেই তারা মানুষ ছিল না। অতিমানস জগতের স্থায়ী বাসিন্দাও

তারা নয় ; আরো উর্ধ্বলোক থেকে তাদের পাঠানো হয়েছে এ বিষয়ে তদারক করবার জন্য। জাহাজে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাজগুলি সম্পন্ন করবার ভার ছিল আমারই উপর। আমিই সবাইকে এর জন্য প্রস্তুত ক'রে তুলছিলাম। আমিই তাই নামবার সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে থেকে একটির পর একটি দলকে বেছে তীরে নামাচ্ছিলাম। নীচে দাঁড়িয়ে সেই দীর্ঘকায় ব্যক্তিরা প্রতি জনকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগল, যাদের উপযুক্ত বলে মনে হল তাদের নামিয়ে নিলে, আর যারা তখনও তেমন উপযুক্ত হয়নি, আরো কিছু শিক্ষা পাওয়া যাদের দরকার, তাদের আবার ফেরত পাঠিয়ে দিলে। আমি উপরে দাঁড়িয়ে সবই দেখতে পাচ্ছিলাম, আমার চেতনার এই পার্থিব অংশটা ঐ ব্যাপার দেখবার জন্য খুবই উৎসুক ছিল, তাই প্রত্যেকটি লোককে আমি চিনে চিনে দেখে নিচ্ছিলাম যে কাকে কাকে উপযুক্ত বলে গ্রহণ করা হচ্ছে আর কাকে কাকে কাঁচা রয়েছে বলে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

এই সকল যখন লক্ষ্য করছি তখন কিছু পরে হঠাৎ বোধ করতে লাগলাম যেন আমাকে কিছু নীচের দিকে টানছে, আমার স্থূল দেহটাকে ঝাঁকানি দিয়ে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। চেতনার মধ্যে তাতে বাধা দিয়ে আমি বলে উঠলাম, "থাক থাক, এখন নয়, আমি আরো একটু দেখে নিতে চাই"। ব্যাপারটি দেখবার জন্য তখন আমার খুবই আগ্রহ। কিন্তু ঐ সময়ে এখানকার ঘড়িতে সশব্দে চং চং ক'রে তিনটে বেজে গেল, আর তখনকার সেই অনুভূতির অবস্থা আচম্‌কা ভেঙে গেল। আমার এই স্থূল দেহের মধ্যে আবার আমি হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লাম। ঐরূপ একটা ধাক্কা পেয়ে জড়ের রাজ্যে ফিরে এলাম বটে কিন্তু আকস্মিক পরিবর্তন আসতে পূর্ব অনুভূতির সমস্ত স্মৃতিটা অক্ষুণ্ণ রয়ে গেল। তখন একটুও নড়াচড়া না ক'রে স্থির হয়ে থেকে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটিকে মনে মনে আবৃত্তি ক'রে নিলাম।

সেই জাহাজের কোনো-কিছুই এই পৃথিবীর মতো নয়। ওখানেও এক রকমের পোষাক আছে, তা এখানকার মতো কাপড়ের বোনা নয়। কাপড়ের মতো দেখালেও তা বাহ্য বস্তুর আবরণ নয়, বস্তুত তা প্রত্যেকেরই আপন আপন দেহের অংশ, দেহবস্তু থেকেই তা তৈরি এবং দেহবস্তু থেকেই বেরিয়ে এসে অমনি আবরণের আকার নিয়েছে। আর আশ্চর্য তার নমনীয়তা ; বদল করবার দরকার হলে বাইরে থেকে কোনো কিছুই করতে হয় না, ভিতর থেকে কেবল চেতনার ক্রিয়াতেই যেমন চাইবে তেমনি বদলে যাবে, যেমন ইচ্ছা করবে তেমনি আকার নেবে। প্রাণও সেখানে তার নিজেকে নিজে ইচ্ছামতো গড়ে নেয়। সমস্ত-কিছুর মধ্যে রয়েছে একই উপাদান ; যেখানে যেমন দরকার সেই অনুসারে কেবল তার স্পন্দনের প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে, তাতেই আগাগোড়া চেহারা পরিবর্তিত হচ্ছে।

আরো শিক্ষা পাওয়া দরকার বলে যাদের ফেরত পাঠানো হচ্ছিল তাদের সকলের গায়ের রঙ সব জায়গাতে সমান নয় ; তাদের গায়ে যেন মাঝে মাঝে অস্বচ্ছ ও ধূসর রকমের অল্পবিস্তর ছোপ লেগে রয়েছে, যেন পৃথিবীর মাটির মলিন দাগ স্থানে স্থানে লেগে আছে ;

সে দাগ অত্যন্ত ঘোলাটে, তার ভিতর দিয়ে আলো প্রবেশ করেনি, তাই সেখানটায় কোনো রূপান্তর ঘটেনি। কিন্তু সব জায়গাতে নয়, মাত্র স্থানে স্থানে এমনি।

তীরে দীর্ঘকায় ব্যক্তি যারা ছিল তাদের গায়ের রঙ কিন্তু অমন ধরনের গাঢ় কমলা নয়, তার চেয়ে অনেক ফিকে আর স্বচ্ছ। স্বচ্ছ বলে তাদের দেহের একটি অংশ ছাড়া বাকি সব অংশের বাহ্য রেখাটুকু মাত্রই দেখা যায়। মস্ত লম্বা তাদের দেহ, দেখলে মনে হয় ভিতরে হাড়ের কাঠামো নেই, তাই তারা যখন যেমন খুশি আকৃতি নিতে পারে। কেবল কোমর থেকে নীচের দিকটায় কিছু ঘনত্ব আছে। তাদের গায়ের রঙে কিন্তু লালের আভা ছিল; সোনালির অনকটাই বেশী, আর সাদারও একটু আমেজ আসে। যেখানে সাদার জ্যোতি সেখানটা স্বচ্ছ, একেবারে স্বচ্ছ না হলেও ঘনত্ব খুবই কম, কমলা রঙের চেয়ে অনেক ফিকে।

যখন আমার এই স্থূল জগতে ফেরার তাগিদ আসছিল আর আমি 'না, না' বলে তার প্রতিবাদ করছিলাম, তখন তার মধ্যেই নিজের ওপর চোখ বুলিয়ে চট্ ক'রে একবার দেখে নিচ্ছিলাম যে অতিমানসের জগতে আমার নিজের চেহারাটা কেমন। দেখলাম যে ঐ দীর্ঘকায় ব্যক্তিদের চেহারার ধরন আর জাহাজের লোকদের চেহারার ধরন দুইই আমার মধ্যে মিশে আছে। উপরের দিকটা, বিশেষ ক'রে মাথাটা অস্বচ্ছ, তার মাঝের দিকে সাদা আর কিনারার দিকে কমলা রঙ। আর পায়ের দিকটায় যতই নীচে দেখা যায় ততই তা জাহাজের লোকগুলির মতো, পুরোপুরি কমলা রঙের; আর উপরের দিকে যতই যাওয়া যায় ততই তা স্বচ্ছ ও সাদা, লালের ভাব সেখানে কম। মাথার অস্বচ্ছতার মাঝখানে রয়েছে এক সমুজ্জ্বল সূর্য; তার থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে তীব্র ইচ্ছারশ্মি।

জাহাজে যারা ছিল তাদের সকলকেই চিনলাম। তারা কতক বা এই আশ্রমের লোক, কতক বা বাইরের অন্যান্য স্থানের, কিন্তু সকলেই আমার চেনা। তাদের প্রত্যেককেই আমি লক্ষ্য করলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে এও বুঝলাম যে এখানে যখন ফিরবো তখন কাউকেই আমার স্মরণ থাকবে না, সুতরাং কারো নাম বলার দরকার হবে না। আর তা না বলাই ভালো। তিন চারজনের মুখ খুব স্পষ্ট করেই নজরে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো এখানে তাদের চোখের দিকে চেয়ে আমি কি বোধ করতাম তাদের চোখে চাইলেই আমি দেখতাম অপূর্ব আনন্দের লক্ষণ। তারা বেশির ভাগ লোকই পরিণত বয়সের; অল্পবয়সী খুব কমই ছিল, যারা বা ছিল তারা ১৪ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে, দশ বছরের নীচে কেউই নয় (যদিও বেশি খুঁটিয়ে দেখার সময় পাইনি), আবার বেশি বৃদ্ধ বয়সের মানুষও দুই একজন ছাড়া ছিল না। যাদের তীরে নামানো হচ্ছিল তারা অধিকাংশই মধ্যবয়সী, শুধু কয়েকজন ছাড়া। এই অনুভূতির আগের অনুভূতিতেও অনেকবার দেখেছি যে কয়েকজন ব্যক্তিকে এক আলাদা জায়গায় নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা হচ্ছে তারা অতিমানস লাভের উপযুক্ত হয়েছে কিনা; আশ্চর্যের সঙ্গে তা আমি লক্ষ্যও করেছি আর কাউকে সে কথা বলেও থাকবো। কিন্তু এবার স্পষ্টই দেখলাম যে জাহাজ থেকে তীরে যাদের নামানো হচ্ছে তারা সবাই মধ্যবয়সী,

খুব শিশুও নয় খুব বৃদ্ধও নয়, শুধু কয়েকজন ছাড়া ; আর আমি তাই প্রত্যাশাও করেছিলাম। তখনই আমি ঠিক ক'রে ফেললাম যে কাউকে কিছু বলা হবে না, কারো নাম বলতে আমি চাই না। আর শেষ পর্যন্ত যখন দেখাই হলো না তখন পরোপুরি বৃত্তান্তটি বলা আমার পক্ষে সম্ভবও নয় ; সমস্ত ছবিটা সম্পূর্ণই হতে পারেনি। তাছাড়া কাউকে বলবো আর কাউকে বাদ দেবো, এও ঠিক নয়।

মোটের উপর এই পর্যন্ত বলতে পারি যে উপযুক্ততার বিচার করা হচ্ছিল প্রত্যেকের আভ্যন্তরীণ গঠনের উপাদানগুলি দেখে, অর্থাৎ তা অতিমানস জগতের জিনিস কিনা তাই দেখে, কারণ একবার দেখবামাত্রই সে জিনিস চেনা যায়। এখানে নৈতিক বা মনস্তাত্ত্বিক মান ধরে বিচার করবার প্রশ্নই নয়। যে উপাদানে তারা গড়া তা হয়তো কোনো আভ্যন্তরীণ প্রণালীতে অতিমানসের উপযোগী হয়ে দাঁড়াবে, সে পক্ষে কোনো বাধা ঘটবে না। অন্তত-পক্ষে স্পষ্টই বোঝা গেল যে তা এক স্বতন্ত্র মূল্যের জিনিস।

এ জগতে যখন ফিরে এলাম তখন ঐ সব অনুভূতির কথা স্মরণ রাখতে রাখতে এও জানলাম যে ঐ অতিমানস জগৎ চিরস্থায়ী, ওখানে আমার উপস্থিতিও চিরস্থায়ী,—কেবল বাকি রয়েছে এখানের সঙ্গে ওখানের চেতনায় ও উপাদানে একটা যোগাযোগ স্থাপন করা, আর সেই কাজই এখন করা হচ্ছে। যেদিন আমার মনে এই ভাবটি জেগেছিল যে সবস্তুই একটা আপেক্ষিক ব্যাপার (সারাদিনই আমার মনে ঐ ভাবটি ছিল), অর্থাৎ এ জগতের সঙ্গে ঐ জগতের যেমন সম্বন্ধ দাঁড়াবে সেই অনুযায়ী সব-কিছুর মূল্য নিরূপিত হতে থাকবে। এ ভাবের মধ্যে আমার মনের তরফের বিচার বিতর্ক কিছুই ছিল না, ভিতর থেকে আপনা হতেই এই আশ্চর্য জ্ঞানটি জেগে উঠেছিল যে আমরা যাকে ভালো কিংবা মন্দ বলে সাব্যস্ত করি তা কিন্তু বাস্তবিকই ঠিক বিচার হয় না। স্পষ্টই বুঝলাম যে সব-কিছু নির্ভর করছে সম্বন্ধের সম্ভাব্যতার উপর, অর্থাৎ অতিমানস জগতের সঙ্গে কেমন সম্বন্ধ দাঁড়াচ্ছে বা কেমন যোগ রয়েছে তারই উপর। কতই উল্টো জিনিস প্রত্যক্ষ করলাম, সাধারণ বিচারে যাকে যেমন ভাবা হয় তার একেবারে উল্টো। সামান্য একটি ব্যাপারের কথা মনে পড়ছে যাকে সাধা-রণত আমরা খুবই মন্দ মনে করে থাকি ; আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে সেখানকার বিচারে তা আদৌ মন্দ নয়, বরং খুব ভালোই। এমনি আরো অনেক ব্যাপার আছে যাকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই বিবেচনা করি, কিন্তু ওখানে দেখলাম যে বাস্তবিক তা অতি তুচ্ছ ; তার ফল একদিক দিয়েই হোক বা অন্যদিক দিয়েই হোক, কিছুমাত্র তাতে যায় আসে না।

আসল কথা আমরা যাকে দিব্য কিংবা অদিব্য বলে বাছাই ক'রে থাকি তা সম্পূর্ণ ভুল কাজই করা হয়। কতকগুলি জিনিস দেখে আমার খুব হাসি পেয়ে গেল...। তাকেই আমরা অদিব্য বলি যা কৃত্রিম, যার ভিত্তিতে কোনো জীবন্ত সত্য নেই—আর এখানকার বাঁচাকে ঐ জগতের তুলনায় প্রকৃত বাঁচা বলেই মনে হয় না—তথাপি দুই জগতের সম্পর্ক ধরেই সেখানে বিচার ক'রে দেখা চাই যে কিসের ভিতর দিয়ে সে সম্পর্ক সহজ হয়ে আসছে

অথবা কিসে তা আরো জটিল হয়ে উঠছে। যাতে আমাদের ভগবানের কাছাকাছি নিয়ে যায় বা যাতে আমাদের দূরে সরিয়ে দেয়, সেই হিসাব ধরেই বিচারটা হবে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। ওখানেও তাই দেখলাম যে জাহাজ থেকে নামানো লোকদের মধ্যে কোন কারণে কাকে প্রস্তুত বলে গ্রহণ করা হচ্ছে আর কাকে বা প্রস্তুত নয় বলে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার বিচার আমাদের নৈতিক বুদ্ধির বিচার থেকে বিস্তর তফাৎ। দেখেশুনে আমার মনে হলো যে এখানকার আমাদের বিচার-রীতি কতই উপহাস্য।

ঐ অনুভূতি লাভ করার পর কিছুদিন বাদে যখন আবার তোমাদের কাছে কিছু বলার সুযোগ হলো, তখন আমি যা বললাম তা ঐ ওরা ফেব্রুয়ারির অনুভূতির দরুনই আবার চেতনাতে যা কিছু ধারণা হয়েছিল তারই কতকগুলি কথা। সেই কথাগুলি আবার এখানে বলি :

প্রত্যেকেরই নিজের নিজের চেতনার গণ্ডীর মধ্যে একটি ক'রে শাসক জুটে যায়, শ্রীঅরবিন্দ যার নাম দিয়েছেন 'সেন্‌শর' (Censors) এরা হলো বিরুদ্ধ শক্তির একরকম স্থায়ী প্রতিনিধিস্বরূপ। এদের কাজ কেবল ভিতর থেকে ছিদ্রান্বেষণ করা, আমাদের প্রত্যেকটি কাজের, প্রত্যেকটি চিন্তার, প্রত্যেকটি চেতনার ক্রিয়ার মধ্যে দোষ খুঁজে বের করা ; এরা তোমার সামান্য কাজেরও গুহ্য কারণটিকে সামনে এনে হাজির করবে, তোমার উঁচুদরের বিশুদ্ধ কাজের মধ্যেও যেটুকু নিম্নতর স্পন্দন লুকিয়ে আছে তাকে চেনে বের করবে।

সেখানে কোনো নৈতিক পদ্ধতির বিচার নেই। এরা কেউ নীতিবাদের উকিল নয়, যদিও এরা নীতিবাদের প্রয়োগ খুব ভালো করেই জানে। কিন্তু তা নয়, দুর্বল রকমের চেতনা দেখলেই এরা অমনি কানের কাছে অনবরত টিক্‌টিক্ করতে শুরু ক'রে দেয় : "তোমার বাপু ওটা করা ঠিক হয়নি, ওটা কোনোমতেই তোমার পক্ষে উচিত ছিল না, ওর বদলে এই করলে ভাল হতো, এই বললে ভাল করতে, তা না ক'রে সবস্তই গণ্ডগোল ক'রে ফেললে, যে মারাত্মক ভুলটা করলে তা আর শোধরাবার নয়।" এমন কি কারো কারো চেতনাকে এরা একেবারে জুড়ে বসে : তখন যতই সেই বিরুদ্ধ চিন্তাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দাও, ঠিক দু'মিনিট পরেই আবার সেটি এসে হাজির হবে ; আবার তাকে তাড়িয়ে দাও, তবু আবারও সে ফিরে আসবে।

এই সেন্‌শর ভদ্রলোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই আমি এদের আহ্বান জানিয়ে বলি, এসো এসো কারণ এরা ভিতরকার অতি সূক্ষ্মতম কপটতাকেও খুঁজে দেখিয়ে দেয়, তোমাকে এরা ঐকান্তিক হতে বাধ্য করে। এরা চালাক কম নয়। আমাদের বুদ্ধিকে এরা অনেক-টাই ছাপিয়ে যায় ; সব-কিছু খবরই এরা রাখে, অতি আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে তোমার সামান্য-তম যুক্তিকে, চিন্তাকে ও ক্রিয়াকে তোমার নিজেরই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারে। কোনো-কিছুই এদের এড়ায় না। কিন্তু এরা যে আসলে বিরুদ্ধভাবাপন্ন তা একটা জিনিস থেকে

ধরা পড়ে যায়, সেটাই এদের সবচেয়ে প্রথম কথা ও প্রধান কথা, যে এরা আগাগোড়া নিরাশাবাদী। কেবল পরাজয়ের খবরই এরা শোনাবে। তোমার সকল কিছুকে সব সময় মসীবর্ণে চিত্রিত ক'রে দেখাবে, এমনকি তোমার আসল উদ্দেশ্যকেও বিকৃত ক'রে দেখাতে থাকবে। তবে এক হিসাবে এরা বাস্তবিকই ঐকান্তিকতা আনবার যন্ত্রের মতো কাজ করে। কিন্তু একটা জিনিসকে এরা ইচ্ছা করেই ভুলে যায়, অর্থাৎ ভগবৎ-কৃপার ব্যাপারটা, সে কথা এরা একেবারে বাদ দিয়েই রাখে, যেন ভগবানের কৃপা বলে কোনো কিছুই নেই। তাই এরা প্রার্থনার কথাটাও ভুলে যায়; যে প্রার্থনা তোমার সত্তার গভীর অন্তস্তল থেকে স্বতঃ-স্ফূর্ত হয়ে উঠবে তীব্র আকূতি ও আবেদনে, যার ফলে কৃপা আপনি নেমে এসে তোমার সকল সকল-কিছুকে ওলটপালট ক'রে দেবে, তার কথা এরা মানতেই চায় না।

এদের কাজ হলো, যতবার যখনই তুমি কিছু উন্নতি করলে, নীচের স্তর থেকে একটু উপরের স্তরে উঠবে, তখন ততবারই তোমার বিগত জীবনের ক্রিয়াকলাপের যত কিছু চিত্র সামনে এনে হাজির করবে; সে একটা পরীক্ষা, হয়তো কয়েক মাস বা কয়েকদিন বা অন্তত কয়েক মুহূর্ত তোমাকে সেই পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে হবে, যদিও তা সেই উচ্চস্তরেই থেকে। তখন তাকে "জানি জানি, আমার ও সব জানা আছে" বলে ধমক চাপা দিয়ে, যাতে মোটে আর সেদিকে চাইতেই না হয় এইভাবে এড়িয়ে গেলে চলবে না। মুখ তুলে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই, আপন চেতনাকে আলোর প্লাবনে ভরে রাখা চাই, তখন একটুও যেন কেঁপে উঠতে না হয়, দেহের একটি কোষও যেন বিচলিত না হয়; নিঃশব্দে তখন শুধু স্থির হয়ে থাকবে, তাহ'লে এই ধরনের আক্রমণ আপনা হতে কোথায় মিলিয়ে যাবে।

কিন্তু ভালো আর মন্দের সম্বন্ধে আমাদের ধারণাগুলো যতই উপহাস্য হোক, কি ভগবানের কাছাকাছি নিয়ে যায় আর কি তার থেকে দূরে সরিয়ে দেয় সে সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা যা আছে তা তেমনি হাস্যকর।

মোটকথা ঐ ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখের অনুভূতি থেকে আমি অনেকখানি দিব্যদৃষ্টি পেয়ে গেছি, আমার অনেক ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে নিয়ে এসেছি। অতীতের জীবনের অনেক কথা, অনেক কাজ ও অনেক পর্ব যা আমার কাছে এতকাল অর্থবিহীন ছিল, তার সকল অর্থই এখন পরিষ্কার হয়ে গেল।

আমার ঐ অনুভূতি চলেছিল পুরো এক ঘন্টা কাল ধরে—ঐরূপ অবস্থাতে এক ঘন্টা বড়ো কম সময় নয়—ততক্ষণ সব সময়টাতেই আমি ছিলাম মহা আনন্দে, কতকটা মাতোয়ারা অবস্থাতেও বলা চলে। দুই ধরনের চেতনার মধ্যে এতটাই পার্থক্য যে একটির মধ্যে যতক্ষণ রয়েছি ততক্ষণ অন্যটিকে মনে হবে স্বপ্ন দেখার মতো অবাস্তব। এখানকার চেতনাতে যখন ফিরে এলাম তখন প্রথমেই আমার মনে হলো যে এখানকার জীবন কতই অকিঞ্চিৎকর; এখানকার সকল ধারণাই কত ভুল, তুচ্ছ, উপহাস্য, পরিহাস্য...দেখ, আমরা কাউকে কাউকে

পাগল বলে থাকি, কিন্তু অতিমানসের দিক থেকে দেখলে তাদের সেই পাগলামি হয়তো অনেকখানি প্রজ্ঞারই লক্ষণ, তারা যে সব আচরণ করে তা হয়তো সত্যেরই কাছাকাছি হওয়াতে। অবশ্য মস্তিষ্কের বিকৃতির জন্য যারা পাগল হয়েছে তাদের কথা আমি বলছি না, আমি বলছি তাদেরই সম্বন্ধে যাদের আচরণগুলি দুর্বোধ্য মনে হয়, যারা দীপ্তিমন্ত পাগল,—হয়তো এরা এখানকার গণ্ডীগুলোকে তাড়াতাড়ি ডিঙিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু সকল অংশ দিয়ে তা পারেনি।

অতিমানস চেতনার মধ্যে গিয়ে আমাদের জগৎকে দেখলে একটা বিপরীত ভাব মনে প্রবল হয়ে ওঠে, মনে হয় এখানকার সমস্তই কৃত্রিম—তাই এ জগৎকে তখন ভারি অদ্ভুত ঠেকে। এখানকার চেতনাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উঠে গেলে পার্থক্যটা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ; তাই এখানে যা-কিছু ব্যাপার ঘটছে, কেবল ভিতরকার গভীরতর জিনিসগুলি ছাড়া, সমস্তকেই আবার নিতান্ত কৃত্রিম বলে বোধ হতে লাগল।

এখানে আমাদের দেহকে ঢাকা দেবার জন্য বস্ত্র সংগ্রহ করতে হয়, সেই বস্ত্রে পোষাক ও জামা সেলাই করতে হয়, সময়মত সেগুলি গায়ে পরে' থাকতে হয়। তেমনি আবার নিজেদের পুষ্টির জন্য বাইরের থেকে নানারকম খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, দেহের মধ্যে তাকে ঢোকাতে হয়। সম্পূর্ণ জীবনটাই কত কৃত্রিম।

কিন্তু যে জীবন সত্যজ্যোতির্ময় স্বতঃস্ফূর্ত ও একাগ্র, যেমন অতিমানসের রাজ্যে, তাতে সব-কিছুই আপনা থেকে উপ্‌চে উঠতে থাকে, কারণ তার ভিতরে রয়েছে সচেতন সজাগ ইচ্ছাশক্তির তেজ। সে ইচ্ছা সরাসরি কাজ করে বাস্তবের উপর এবং বাস্তবকেও তা মেনে নিতেই হয় ; কাজেই সে ইচ্ছা যখন যা হওয়াতে চায় তখন তাই হয়ে যেতে পারে। তোমার মধ্যে যদি সেই শক্তি ও জ্ঞান এসে থাকে তাহ'লে তুমি যখন যা চাইবে তাই পেয়ে যাবে, আর যদি তা না এসে থাকে তাহ'লে কোনোরকম কৃত্রিম উপায়েই তোমার তা মিলবে না।

যেমন মনে করো, অতিমানসের জগতে যদি তুমি পোষাক পরতে চাও, তাহ'লে তোমার নিজেরই দেহবস্ত্র থেকে পোষাক তৈরি হয়ে দেহকে আচ্ছাদন করবে। যদি এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে চাও তাহলে কোনো যানবাহনের বা কৃত্রিম উপায়ের দরকার হবে না, কেবল তোমার ইচ্ছা করাই তার পক্ষে যথেষ্ট হবে। আমার ঐ অনুভূতিতে যে জাহাজের কথা বলেছি তাকে চালাতে কোনো এঞ্জিন প্রভৃতির দরকার হয়নি, কেবল ইচ্ছার দ্বারাই যেমন দরকার তেমনিভাবে সমস্ত কাজ হচ্ছিল। যে বন্দরে ভিড়বার দরকার হলো তা আপনা থেকেই দেখা দিল। সেখানে যাদের যাদের নামিয়ে দিতে চাইলাম তারা নিজের থেকেই সে কথা জানতে পারলে, আমায় কাউকে কিছু বলতে হলো না, তারা সারি বেঁধে আপনা থেকেই এগিয়ে এলো। সব-কিছু কাজই হতে থাকল নিঃশব্দে, বুঝিয়ে বলবার জন্য কোনো বাক্যব্যয় করতে হলো না। কিন্তু জাহাজের সেই নীরব নিঃশব্দ

ভাবটি এমন নয় যে এখানকার মতো তাকে কৃত্রিম বলে মনে হবে। এখানে নিঃশব্দ থাকা মানেই জোর করে মুখ বুজে থাকা ; নিঃশব্দ হওয়া মানেই সশব্দ হওয়ার বিপরীত ক্রিয়া। কিন্তু সেখানে তা নয়, নিঃশব্দতা সেখানে স্পন্দনধর্মী, জীবন্ত, বোধোদ্দীপক।

এখানকার সম্বন্ধে যা খুব অদ্ভুত তা এই যে এখানে নানারকম কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য নিতে বাধ্যই হতে হয়। সেই সব কৃত্রিম উপায়ে যে যত বেশী দক্ষ হবে সে অতি অপদার্থ ব্যক্তি হলেও তত বেশী ক্ষমতার অধিকারী হবে। কিন্তু অতিমানসের জগতে চেতনারই দাম, সত্য সম্বন্ধে যার যত বেশী চেতনা তারই তত বেশী ক্ষমতা। আর সে ক্ষমতা মানে প্রকৃত শক্তি। একটা পোষাক পর্যন্ত দরকার হলে তা নিজে গড়ে নেবার ঐ শক্তিটা থাকা চাই, নইলে তোমাকে বস্ত্রহীন থাকতে হবে। তার অভাব পূরণ করার অন্য কোনো কৃত্রিম ব্যবস্থা নেই।

এখানকার জগতে খোলাখুলি বলতে পারাই সত্যের প্রমাণ বলে ধরা হবে, এখন লাখের মধ্যে একবারও হয় না। সকল বিষয়েই অপরিবর্তনীয় মূঢ়তা। হয়তো দৈবাৎ তুমি যেখানে জন্ম নিয়ে যে পরিস্থিতির মধ্যে এসে পড়েছ, সেই অনুসারেই খুব উচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, কিংবা অল্পবিস্তর সুখসমৃদ্ধির জীবন লাভ করেছ, কিন্তু তোমার সত্তার বিবর্তন ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের সঙ্গে তার মিল নেই, কেবল ঘটনাচক্রেই তুমি অমন পরিস্থিতির মধ্যে স্থান পেয়েছ। এমনি ভাবে সাধারণ জীবনের কোনো অবস্থাই সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। ভিতরের সঙ্গে বাইরের অবস্থার মিল থেকেই যাচ্ছে, বাইরে যেমন দেখাচ্ছে তার থেকে ভিতরের সত্য আদৌ প্রকাশ পাচ্ছে না।

একজন লোক যার কোনোই দাম নেই সে হয়তো খুব উঁচু জায়গাতে উঠে বসেছে, আর একজন লোক যার অদ্ভুত সৃষ্টিশক্তি রয়েছে সে খুব নীচে পড়ে থেকে কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটাচ্ছে, অথচ এ জগৎ যদি সৎ এবং সরল হতো তাহ'লে সে হত একজন কাজের লোক হতো।

এই কৃত্রিমতা, এই বক্রতা, সত্যের এই অপলাপ, এইগুলোই আমার মনকে খুব আঘাত দিয়েছিল, তাই আমি নিজের মনেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এই মিথ্যার জগতে সত্যের দাম কেমন ক'রে মিলতে পারে। এখন আমি জেনেছি যে আমাদের এখানকার সমস্ত দাম-বিচারই গোলমেলে, আমাদের সব-কিছু মূল্যনিরূপণের পদ্ধতি থেকে অতিমানস জগতের পদ্ধতি একেবারে স্বতন্ত্র।

এখানে যখন নেমে আসি—নেমে আসা বলছি একটা কথার কথা, কারণ বাস্তবিক তা নীচেও নয় উপরেও নয়, ভিতরেও নয় বাইরেও নয়, শুধু এক জায়গা থেকে অন্য এক জায়গা,—তখন খানিক সময় লাগল নিজেকে সামলে নিতে। তখন যেন কাউকে বলেও ফেললাম : "আবার ফিরে এলাম আমাদের সেই মানুষী মূঢ়তায়।" কিন্তু সেজন্য বিরক্ত বা দুঃখিত হওয়ার বদলে এমন একটা হাস্যকর মনোভাব আমাকে পেয়ে বসল, যে কয়েকদিন

ঘরে এখানকার যা-কিছু দেখি তাতেই আমার হাসি আসতে থাকল, যে হাসির কোনো মানে হয় না, কেবল নিজের কাছে ছাড়া, কারণ শুধু আমার কাছেই তা হাস্যকর ঠেকছে।

কিছুদিন আগে আমি যখন তোমাদের নতুনের অভিযানে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছিলাম, তখন নিজে কিন্তু আমি জানতাম না যে ঠিক সময়ে ঠিক কথাই বলেছি, যারা এখন বাস্তবিক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হবে তারা অনেক নতুন জিনিস আবিষ্কার করবে।

বাইরের থেকে যা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে কোনো নাটকীয়তা নেই। এ সকল দৃশ্যমান বাহ্য ব্যাপার আমার কাছে কেবলই মনে হচ্ছে সাবানের ফেনার মতো, বিশেষ ক'রে ঐ ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখের পর থেকে।

বহু লোক আমার কাছে আসে দারুণ হতাশা নিয়ে, অশ্রুমুখর হয়ে, তারা শোনায় তাদের নিদারুণ নৈতিক কষ্টভোগের কথা। আমি তখন শুধু এই কাজটি করি, আমার চেতনার মধ্যে যেখানে তোমাদের জন্য স্থান রাখা আছে সেখানকার ঘড়ির কাঁটাটি একটুখানি ঘুরিয়ে দিই, আর তাতেই তারা ঘরে ফিরে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পেয়ে যায়। সেটি কম্পাসের কাঁটার মতো; আমার চেতনাতে তাকে ধরে একটু নেড়ে দিলেই ওদিকের গণ্ডগোল শুধরে যাবে। অবশ্য তার পরেও সে ভাব আবার ফিরে আসে, কিন্তু গতানুগতিক ভাবে। সাবানের ফেনা ছাড়া কিছু নয়।

অমন কষ্টযন্ত্রণায় আমিও ভুগেছি, কিন্তু আমার মধ্যে বরাবরই এমন একটা অংশ ছিল যা ওর থেকে সরে আলাদা হয়ে থাকতে জানতো।

জগতে এখনো আমার কাছে যেটা অসহনীয় মনে হয় তা দেহের ভরফের বিপর্যয়, দৈহিক পীড়া, শ্রীহীনতা, প্রতি সত্তারই মধ্যে যে সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে তাকে প্রকাশের অক্ষমতা। কিন্তু এগুলিকেও একদিন জয় করা সম্ভব হবে। ওগুলির বেলাতেও অমনি কাঁটা নেড়ে দেবার শক্তি আসবে। শুধু চেতনাতে আরো বেশী উপরে ওঠা চাই; জড়ের মধ্যে নেবে যতই কাজ করতে চাও ততই তোমার চেতনাকে উপরে তুলতে হবে। তার জন্য আরো সময় লাগবে। শ্রীঅরবিন্দ যখন বলেছিলেন কয়েক শতাব্দীর কথা তখন তিনি তা ঠিকই বলেছিলেন।

*

প্রশ্ন: বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন শিক্ষাগুলি সম্বন্ধে—

উত্তর: বৌদ্ধ শিক্ষাতে কখনো এমন কথা বলেনি যে জীবনকে উৎকৃষ্টতর করতে হলে, চিন্তাকে উন্নত করতে হলে অনেক কষ্টসহ্য বা ত্যাগের দরকার; বরং তাতে এমন আনন্দাবস্থা লাভের কথা বলেছে যাতে মানুষের দুঃখকষ্ট ঘুচেই যায়। বুদ্ধের আমলে আধ্যাত্মিক জীবন ছিল আনন্দেরই জীবন, সুখশান্তিময় অবস্থা, তাতে পৃথিবীর সব-কিছু বিপত্তি

ভোগ করা থেকে তুমি নিষ্কৃতি পেয়ে গেলে, কষ্ট বা দুর্ভাবনা কিছুই রইল না, আপন শান্তি তৃপ্তি নিয়ে বেশ আরামেই রইলে।

বর্তমানের বস্তুতান্ত্রিকতার যুগেই বরং আধ্যাত্মিক জীবনে যেতে চাইলে তার জন্য অনেক রকমের বেগ পেতে হয়, অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয় ও অনেক ত্যাগস্বীকার করতে হয়, জীবনের তথাকথিত সুখ এবং আরামগুলিকে অনেক ব্যথাবেদনার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতে হয়।

স্থূল জগতের এই সব যত বস্তু আঁকড়াবার দিকে ঝোঁক, দেহের সুখ, দেহের ভোগ চাওয়া, কেবলই স্থূল সম্পদের অধিকারী হতে চাওয়া, এরই এত বাড়াবাড়ি হয়েছে এখনকার মানব-সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিকতার দিকে অত্যন্ত বেশী ঝোঁক হবার ফলে। প্রাচীন কালে এ মনোভাব ছিল কল্পনাতীত। তখন ছিল নিবৃত্তিমার্গ, নিজেকে যথাসম্ভব গুটিয়ে রাখা, বস্তুর বিষয়ে লিপ্ত না হয়ে আধ্যাত্মিক আনন্দের সন্ধানে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দেওয়া, এতেই ছিল প্রকৃত সুখ।

সেই দিক থেকে বিচার করলে মানুষ এখন কোনোই উন্নতি করতে পারেনি। বস্তু-সর্বস্ব সভ্যতার ক্রোড়ে জন্ম নিয়ে মানুষের অবচেতনার মধ্যে গোড়া থেকে এই কথাটাই মারাত্মক রকমে বদ্ধমূল হয়ে থাকছে যে, কেবল স্থূল বস্তুই প্রকৃতপক্ষে বাস্তব, তা ছাড়া আর যা-কিছু ঐ ধরনের স্থূল নয় সে অবাস্তব জিনিস চাইতে গেলে তার জন্য চূড়ান্ত আত্মত্যাগ বরণ করতে হবে, যাকে বলা চলে অমানুষিক সাধনা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আবার সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সারাক্ষণের মধ্যে নিজের দেহের আরাম ও সুখসুবিধার দিকে না চেয়ে, আমোদ এবং স্ফূর্তি এবং মেলামেশার কাজগুলি কোনোকিছুই না ক'রে চুপচাপ থেকেই সময়টা কাটিয়ে দিলাম, এখনকার যুগে এ এক অত্যাশ্চর্য মনোভাবের পরিচয়। তোমরা হয়তো এতটা লক্ষ্য করোনা, কিন্তু বর্তমান সভ্যতা পুরোপুরি দাঁড়িয়ে আছে এই মনোভাবের ভিত্তিতে: "হাত দিয়ে যা ধরা যায়, চোখ দিয়ে যা দেখা যায়, তাকেই মানবো নিশ্চিত সত্য বলে; নিজের মুখে যা খাবো তাকেই খেলাম বলে মানবো; তা ছাড়া আর যা-কিছুর কথাই বলো—তা গ্রেফ ফাঁকি কি না তারই বা প্রমাণ কি? তাই বাস্তব ছেড়ে অবাস্তবকে, কায়া ছেড়ে ছায়াকে মানতে আমরা রাজি নই। আর তাতে লাভই বা কি আছে? অলীক স্বপ্ন নিয়ে দিন কাটানো! পকেটে নগদ জিনিসটাই থাকা সব চেয়ে দরকার, যা দস্তরমত হাতে ঠেকবে, নিঃসন্দেহে আমি জানবো যে এতটা বাস্তব বস্তু রয়েছে আমার দখলে।"

সর্বত্রই এই সিদ্ধান্ত, সব-কিছুরই তলে তলে এই চিন্তা। বাইরের ভদ্র চেহারার উপর একটু আঁচড় কেটে দেখ, ভিতরের চেতনাতে এই জিনিসই স্পষ্ট দেখতে পাবে, আর থেকে থেকে নিজের অন্তরের মধ্যে এই গুঞ্জনই শুনবে "হুঁসিয়ার হও, সংসারে তুমি বোকা বনে যেন ঠকে যেও না"। অবস্থা খুবই শোচনীয়।

এদিকে শোনা যায় যে বিবর্তন চলেছে এগিয়ে, ইস্ক্রুপের প্যাঁচের মতো ঘুরে ঘুরে উপর দিকে উঠছে ; এক দিক দিয়ে সে কথা ঠিকই, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আধুনিক শহরগুলিতে বাস ক'রে আগেকার গুহাবাসী মানুষদের চেয়ে অনেক বেশী নিশ্চিন্ত আরাম পাওয়া যাচ্ছে ; কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসে এ কথাও জানা যায় যে তখনকার লোকেরা প্রায়ই বলতে পারতো আগের থেকে অনেক কিছু অবগতির কথা, ভবিষ্যৎ দৃষ্টির কথা, অনেক দূরে কি ঘটছে তা দেখতে পাবার কথা, সূক্ষ্মতর ব্যাপারের সঙ্গে স্থূল জীবনের যোগাযোগের কথা,—তখনকার সরল মানুষদের কাছে এগুলি খুবই বাস্তব বলে বিবেচিত হতো। অর্থাৎ স্থূলের দিকে এত বেশী না ঝুঁকে তারা সূক্ষ্মের দিকটা নিয়েও চর্চা করতো।

এখনকার দিনের এই সব আরামদায়ক সুন্দর সুন্দর শহরে বাস ক'রে যখন ঐ ধরনের সূক্ষ্ম বিষয়ের কথা শোনো, তখন তাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য ক'রে তোমরা বলো "ও সব যত অলীক উদ্ভট স্বপ্ন, কল্পনার কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

বস্তুত কেউ যদি আপন আভ্যন্তরীণ অনুভূতির অনুশীলন করে ও তার কথা বলে, তাহ'লে লোকে তার দিকে বাঁকা চোখে চেয়ে বলাবলি করবে, লোকটার মাথার ঠিক আছে তো। কেউ যদি অর্থ সঞ্চয়ের দিকে মন না দেয়, কিংবা নিজের সুখসুবিধা বা আরাম না খোঁজে, কিংবা উচ্চপদ লাভের বা নাম কেনবার চেষ্টা না করে, ওদিক দিয়ে যার কোনো উৎসাহই নেই, লোকে তাকে বোকা বা বিকৃতমস্তিষ্ক বলে সন্দেহ করবে।

এই ভাবটাই এখনকার আবহাওয়াতে সব চেয়ে বেশী, এমন কি সকলের নিঃশ্বাস-বায়ুতে এই জিনিসটাই ভরে রয়েছে, সকলের চিন্তাধারা এই দিক দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে, তাই পরস্পরের মধ্যে এই জিনিস দেখতে পেয়ে সকলেই তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়। এ যে কতখানি মারাত্মক তা কেউ ভেবেই দেখে না।

নিজেদের সম্বন্ধে আরো একটু গভীরভাবে সচেতন হওয়া, আপাতদৃষ্ট জীবনের অন্তরালে যে বৃহত্তর জীবন রয়েছে তার সংস্পর্শে আসা, এ যে একটা কত বড়ো লাভ তা তোমাদের মনেই হয় না। ভালো ভালো সুস্বাদু খাদ্য ইচ্ছামত পেট ভরে খেতে পেলে, নানা বিলাসের উপকরণে পাশের টেবিলটি সাজিয়ে রেখে তার সামনে সুদৃশ্য একটি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম ক'রে বসে রইলে, এই হলো তোমাদের কাছে সব চেয়ে ভালোরকম বাস্তবের প্রমাণ, আর এমনি আলস্যবিলাসের অবস্থাই তোমাদের কাছে সব চেয়ে উপভোগ্য। তার পর, যে দিনটি তোমাদের কাটলো তার হিসাব কষে যদি দেখ যে ঐ দিনে নগদ কিছু লাভ হয়েছে, মনের সুখ বা দেহের তৃপ্তি কিছু মিলে গেছে, তাহ'লে বলবে যে ঐ দিনটা বেশ ভালোই কেটেছে ; আর যদি সেদিন জীবনের সম্বন্ধে কোনো ভালোরকম শিক্ষা পেয়ে থাকো, নাকের উপর একটা ধাক্কা খেয়ে যদি জানতে পেরে থাকো যে এখনও কতখানি তুমি নির্বোধ আছো, তাহ'লে সেটা ভগবানের কৃপা বলে তুমি কৃতজ্ঞ হবে না, বরং বলবে "এমন ক'রে বেঁচে থাকাটা মোটেই সুখের নয়"।

প্রাচীন গ্রন্থাদি যখন পড়ে দেখি তখন আমার মনে এই ধারণাই আসে যে, ভিতরের দিক থেকে অর্থাৎ জীবনের মূল দিক থেকে আগের চেয়ে এখন আমরা আরো পিছিয়েই পড়েছি ; বুদ্ধি খাটিয়ে কতকগুলি যন্ত্রের উদ্ভাবনা ক'রে আমরা নিজেদের দেহের পরিশ্রম কমিয়ে এনে আলস্যকে প্রশ্রয় দিয়েছি, কলকারখানা ও যন্ত্রপাতির সৃষ্টি ক'রে জীবনধারণের যেসবগুলিকে যথাসম্ভব কমিয়ে এনেছি, আর আভ্যন্তরীণ জীবনের সত্যকে একেবারেই ছেঁটে বাদ দিয়েছি। সেই আভ্যন্তরীণ বোধটাই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। জীবন সম্বন্ধে গভীর বোধের দিকটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হলে, অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু ভাবতে হলে, কোন লক্ষ্যের দিকে আমাদের গতি, বিশ্বময় জীবনধারা কোন অভিমুখে এগিয়ে চলেছে, এই সব দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হলে তার জন্য এখন আমাদের বিস্তর কষ্টপ্রয়াস করতে হবে। আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে এক ধাপ মাত্র পা বাড়ানো, তাতেই কি কম কষ্ট ! আর এমনিতে ঐ দিকটার কথা তোমাদের মনেই আসে না, বাইরের জীবনে ঘা খেয়ে যখন কোনো ঘটনা-বিপর্যয় আসে তখনই শুধু মনে পড়ে।

মেষপালকদের যে-কালে মাঠ ছেড়ে স্কুলে ঢুকতে হতো না, পালের ভেড়াগুলিকে মাঠে চরতে ছেড়ে দিয়ে অবসরকালে তারা আকাশের দিকে চাইত, রাত্রের নিস্তব্ধ আকাশে তারা-গুলির দিকে চেয়ে চেয়ে তারা সন্ধান করতো যে জগতে এর পরে কি হতে পারে, প্রকৃতির অন্তরাল থেকে যে রহস্য উঁকি মারছে তার সঙ্গে কতকটা তারা জানাজানি ক'রে নিতো, সরল অনাড়ম্বর জীবনধারার মধ্যে যে গভীরতর সৌন্দর্য ও শান্তিটুকু রয়েছে তার আস্বাদ তারা অনায়াসেই পেতো ; কিন্তু সেকাল থেকে আমরা চলে এসেছি অনেকখানি তফাতে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে একটাকে ধরতে গেলেই অন্যটাকে তখন ছাড়তে হয়। আভ্যন্তরীণ জীবন নিয়ে এত কথা বলছি বলে মনে করো না যে আধুনিক আবিষ্কারগুলির আমি বিরোধী, তা একেবারেই নয় ; কেবল এই কথাই বলছি যে ঐ সব আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়া আমাদের কতখানি কৃত্রিম ও নির্বোধ করে এনেছে, প্রকৃত সৌন্দর্যবোধ জিনিসটা কতখানি আমরা হারিয়েছি, অনাবশ্যক প্রয়োজনীয়ের তালিকার গুরুভারে কতটাই নিজেদের ভারাক্রান্ত করেছি।

কিন্তু বোধ করি এবার সময় এসেছে ; জড়ের সম্বন্ধে যে-জ্ঞান আমরা সঞ্চয় করেছি তা সঙ্গে নিয়ে আবার সেই ইক্ষুপের বাঁক ভেঙে উপরে ওঠার পালা ; এবার আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকটা আরো দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো, জড়প্রকৃতির যে সব গুপ্ত খবর আমরা জেনে নিয়েছি তার দৌলতে এবার দুই প্রান্তকে এক ক'রে মিলিয়ে আনতে পারবো, আর পরমাণুর কেন্দ্রতে যে পূর্ণ তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে তাকে এবার পুনরাবিষ্কার করতে পারবো।

প্রশ্ন অনন্ত যাত্রাপথে ভগবান—

উত্তর অবশ্যই তোমরা বলতে পারো যে সবই রয়েছে চিরন্তন কাল ধরে, সুতরাং সব কিছুই হয়েছে এককালীন—যুগপৎ ; কিন্তু এই চিরন্তন ও এককালীন সকল অস্তিত্বকে নিয়ে এমন এক চেতনাময়ের রাজ্য, যিনি তাঁর এলাকার মধ্যে সর্বদাই যাত্রা ক'রে ঘুরে বেড়াতে আনোদ পান ; তাঁর এই আনন্দের যাত্রা প্রায় অন্তহীন, অন্ততপক্ষে অনির্দিষ্ট ; তাই তিনি নিজেরই রাজ্যের মধ্যে নিত্য নতুন আবিষ্কার করতে থাকেন, যে-সব জিনিস আগের থেকে আছে তাকেই আবার আবিষ্কার করেন, যেন তা বহুকাল যাবৎ থাকলেও ইতিপূর্বে সেদিকে মোটে চেয়ে দেখেননি। আর যে শূন্যপথে তাঁর এই আবিষ্কার-যাত্রা তাও মুক্ত অবারিত, সেই রেখাবিহীন পথের কোনো নির্দেশ নেই, আগের থেকে তার কিছু ঠিকানা নেই, যখন যেদিকে খুশি হচ্ছে সেই দিকে নতুন নতুন পথ ক'রে তিনি চলছেন ; তাঁর রাজ্য যদিও চিরন্তনের, নতুন কিছু নয়, তবু তাঁর যাত্রাটি সেখানে এমন রাস্তা ধরে যাতে আগে চলা হয়নি, সুতরাং কত রকমের যোগাযোগ ঘটবার সম্ভাবনা সেখানে নিত্যই খুলে যাচ্ছে। এতে তাঁর নিজেকেও নিজে আবিষ্কার করা হচ্ছে, কারণ তাঁর এই রাজ্য হলেন স্বয়ং তিনি, তাই নিজেকে আবিষ্কারও সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে ; মন যেমন ক'রে আগের থেকে মতলব এঁচে নিয়ে কাজ করে তেমনভাবে নয়, সম্পূর্ণ মুক্তভাবে মুহূর্তে মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার ; এই হলো তাঁর আপন সত্তার মধ্যে আপনার চিরন্তনের যাত্রারীতি।

যদিও সবই আগের থেকে নিরূপিত হয়ে আছে, সকল জিনিসই রয়েছে চিরন্তন কাল হতে, তবু তাঁর এই যাত্রার পথটি সম্পূর্ণ মুক্ত এবং অজানা, তাই কোনটার পর কি আসছে তার কোনো কিছুই আগের থেকে জানা নেই। তাই এককালীন সৃষ্ট বহু বহু জগতের অস্তিত্ব যদিও পাশাপাশি রয়েছে, তবু তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো জানাজানি নেই, ক্রমে ক্রমে যেটি যখন আবিষ্কৃত হচ্ছে সেটিকেই তখন এক নতুন সৃষ্টি বলে মনে হচ্ছে।

এই মন নিয়ে যদি দেখ তাহ'লে অনায়াসেই বুঝবে যে অপূর্ণতা সংকীর্ণতা ও অজ্ঞানতায় ভরা আমাদের এই স্থূল জগৎটি ছাড়াও আরো অনেক জগৎ রয়েছে তাদের আপন নতুন ধরনে, তাদের প্রকৃতি আমাদের জগৎ থেকে এতই তফাৎ যে আমাদের কাছে অনস্তিত্বেরই সমান, কারণ তাদের চেতনার সঙ্গে আমাদের চেতনার সম্পর্কমাত্র নেই। কিন্তু যখন শাশ্বতের যাত্রাপথের গতি এ জগৎ থেকে অন্য জগতে এগিয়ে যাবে তখন সেই যাত্রাযাতের পরস্পরের চেতনায় একটা যোগ এসে যাবে, পরস্পরের মধ্যে সংস্পর্শ ঘটবার রাস্তা খুলে যাবে।

বর্তমানে সেই জিনিসটাই হচ্ছে। তাই এখন আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারছি যে অতিমানসের জগৎ আগের থেকেই বর্তমান, কিন্তু এখন সময় এসেছে চেতনার সেই দিকে এগিয়ে যাবার, এখন ক্রমে ক্রমে সেই জগতের সঙ্গে এই জগতের যোগসূত্র স্থাপিত হবে,

পরস্পরের মধ্যে একটা নতুন সম্বন্ধ দাঁড়াবে, আর অনেক-কিছুই সম্ভব হবে, কারণ তাঁর যাত্রার রাস্তা এখন এই নতুন দিক দিয়ে।

বিশ্বরহস্যের নানারকম ব্যাখ্যা আছে, তার মধ্যে এও একটি ব্যাখ্যা। যারা দার্শনিক নয় তাদের পক্ষে এ ব্যাখ্যা বুঝতে পারা সহজ হতে পারে। অন্ততপক্ষে আমার নিজের তো এ ব্যাখ্যা বেশ মনে ধরে।

প্রকৃতপক্ষে নিয়তি বা পূর্বনির্দিষ্ট এবং মুক্তক্রিয়ার মধ্যে কিছু বিরোধ নেই। যিনি সর্বরাজ্যের রাজা তিনি যাত্রায় বেরিয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর পথ বেছে নিচ্ছেন; পা বাড়িয়ে যে পথ খুসি সেই পথই ধরছেন। অভিব্যক্ত জগৎ তাই এমন এমন জিনিস দেখতে পায় যা আগে দেখা যায়নি, এমন পরিবর্তন এসে পড়ে, যার আগে কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, তিনি যখন যেমন পথ নিচ্ছেন তখন তেমনি নতুন কিছু ঘটে যাচ্ছে। সকল সম্ভাবনাই সম্পূর্ণ খোলা রয়েছে। অথচ সব-কিছুই নিরূপিত হয়ে আছে আগের থেকে, নিয়তির চক্রে সব-কিছুই নিরূপিত—অর্থাৎ যা রয়েছে চিরন্তন অস্তিত্ব নিয়ে তাই অপ্রত্যাশিত রকমে আবিকৃত হচ্ছে। সেই আবিকারের দিক থেকেই মুক্তক্রিয়ার পথ রয়েছে খোলা।

বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ তোমার খেয়াল হলো যে আজ এ পথে না চলে ঐ পথে চলা যাক, সুতরাং রাস্তাটি হলো নতুন, কিন্তু যে-সব জিনিসের দিকে চলেছ সেগুলি আগের থেকেই যথাস্থানে হাজির আছে; জিনিসগুলি সবই পূর্বনিরূপিত, কেবল তোমার নতুন পথের আবিকারটি ছাড়া।

এখানে বক্তব্য এই যে বস্তুত যে চেতনা ভগবৎ-চেতনার সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে তাই কেবল পূর্ণ মুক্তি অনুভব করতে পারবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার সে অবস্থা আসেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি বোধ করতে থাকবে যে এক উচ্চতর ইচ্ছার নিয়মের তুমি অধীন রয়েছ, সেই ইচ্ছার সঙ্গে একাত্ম হতে পারলেই তুমি হবে পুরোপুরি মুক্ত।

এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ বারবার বলেছেন "ভগবানের সঙ্গে মিলে গেলেই তখন আসবে পূর্ণ মুক্তি।"

*

প্রশ্ন কখনো কখনো এমন হয় যেন হঠাৎ কতকগুলো চিন্তা কিংবা ভাব মাথার মধ্যে এসে ঢুকলো। সেগুলি আসে কোথা থেকে, আর কেমন করেই বা তা মাথার মধ্যে কাজ শুরু ক'রে দেয়?

উত্তর আসে কোথা থেকে? বাইরে যে মনোময় পরিমণ্ডল রয়েছে সেখান থেকে। কেমন ক'রে আসে? সাধারণ পথে চলতে চলতে হঠাৎ যেমন ক'রে কোনো এক পথিকের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়ে যায় তেমনি ক'রে ওর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়ে যায়। অধিকাংশ

ক্ষেত্রে তাই হয়। ভাবগুলি যেখানে ভেসে বেড়াচ্ছে সেই পথে যখন তুমি গিয়ে পড়লে, তখন তার মধ্যে একটি কিংবা ওটির সঙ্গে তোমার চোখাচোখি হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে তোমার মাথার মধ্যে ঢুকে পড়ল। অবশ্য যারা ধ্যান করতে বা মনকে কেন্দ্রীভূত করতে শিখেছে, তাদের চিন্তার ধারা অন্যরকম; তাদের কাছে কোনো একটা বুদ্ধির সমস্যা বাস্তবের রূপ নিয়েছে, কাজেই মনের একাগ্রতার সাহায্যে তারই সম্পর্কিত ভাবগুলিকে তারা একত্রে জড়ো করতে থাকে, সেগুলি গুছিয়ে নিলে তার দ্বারা সমস্যাটির সমাধানের পক্ষে বা নির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব নেবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য হয়। কিন্তু এর জন্য চাই একাগ্রতা অভ্যাস করা আর একটা দার্শনিক মনোভাব থাকা; তাতে ভাবগুলি জীবন্ত হয়ে উঠবে আর সেগুলিকে মনের ছকে সাজিয়ে নিয়ে দাবাখেলার মতো তুমি খেলতে পারবে। তাদের নিয়ে এদিকে ওদিকে চালাচালি করছ, যেমন খুশি তেমনিভাবে বারে বারে নতুন ক'রে সাজাচ্ছ, তারা তখন তোমার বাধ্য; যদিও প্রত্যেকটিরই আপন আপন স্বাধীন সত্তা আছে, আবার পরস্পরের মধ্যে যোগও আছে, তারা আপন আপন আভ্যন্তরীণ নিয়ম বজায় রাখে, কিন্তু সেগুলিকে সুব্যবস্থিত ক'রে সাজিয়ে নিয়ে তার থেকে তুমি একটা সংলগ্ন রকমের মীমাংসায় আসতে পারো। তবে ওর জন্য তোমাকে রীতিমত অভ্যাস করতে হবে ধ্যান, ধারণা, যুক্তিবিচার, বিশ্লেষণ, সুশৃঙ্খল ও ক্রমানুসারী মানসিক ক্রিয়া। নতুবা যখন যেটা আসছে তাকে নিয়েই যদি জড়াতে থাকো তাহ'লে ভাবের ভিড়ের মধ্যে ঘুরতে থাকাই তোমার সার হবে; এদিক ওদিক থেকে বহু রাস্তা রয়েছে, বহু লোক সব রাস্তা দিয়েই আনাগোনা করছে, আর চৌমাথার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তুমি যাকে দেখছ তাকেই নিজের মধ্যে অভ্যর্থনা করছ—যদিও তাদের কোনোটির সঙ্গে কোনোটির সম্বন্ধের যোগসূত্র নেই; এমন ক'রে যে যে ভাব তোমার মাথার মধ্যে যখন খুশি এসে ঢুকছে তার সবগুলিকে যদি লিখে রাখো, তাহ'লে তা এক খাপছাড়া পাগলামির প্রলাপের মতো শোনাবে।

একবার তোমাদের বলেছিলাম এক মজার খেলার কথা, আচ্ছা তোমার পাশের বন্ধুটিকে এই কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো "এই মুহূর্তে তুমি কোন কথা ভাবছিলে বলতো?" দেখবে যে খুব কম সময়েই তার স্পষ্ট জবাব পাবে, "আমি অমুক কথাটা ভাবছিলাম।" যদি এমন জবাব শোনো তাহ'লে জানবে যে লোকটি চিন্তাশীল, চিন্তার উপর তার দখল আছে। নইলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই জবাব শুনবে: "কি যে ভাবছিলাম তা ঠিক করে বলতে পারি না"।

শারীরিক ব্যায়ামচর্চা যারা নিয়মিত ক'রে থাকে তারা প্রত্যেকেই জানে যে কোন ক্রিয়াটির জন্য কোন পেশীকে চালনা করতে হবে, সব চেয়ে কম শক্তি খরচ ক'রে সেগুলির চালনার দ্বারা কেমন ক'রে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট সাফল্য আনতে পারা যাবে। চিন্তার বেলাতেও ঠিক সেই কথা। যদি নিয়মিতভাবে চিন্তার চালনা শিখতে থাকো, তাহ'লে এমন এক সময় আসবে যখন পুরো আত্মনিবিষ্ট হয়ে তুমি নির্দিষ্ট কোনো যুক্তিমূলক ভাবকে অবাধে অনুসরণ করতে পারবে, পর্দার উপর ফেলা সিনেমার ছবির মতো। একটি ভাব থেকে আর

একটি ভাবকে ধরে সুনিয়ন্ত্রিত বিচারের সাহায্যে, ক্ষণেকের মধ্যেই প্রত্যেকটি যুক্তির আগা-গোড়া দেখে নিয়ে একটা শেষ সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। এটি যদি একবার অভ্যস্ত ক'রে নিতে পারো, তাহ'লে ব্যায়ামের বেলাতে যেমন আপনা থেকেই জানা হয়ে যায় কোন ক্রিয়ার জন্য কোন পেশীর চালনা দরকার, তেমনিভাবে চিন্তার ক্রিয়াও আপনা হতে সুনির্দিষ্ট হতে থাকবে। নইলে চিন্তার কাজ ও বুদ্ধির কাজ চিরদিন অনির্দিষ্ট ও ভাসা-ভাসা রকমেরই থেকে যাবে, হঠাৎ কোনো ভাব মাথার মধ্যে এলো, কেন এলো তা জানা নেই, পরক্ষণেই তার উল্টো রকমের অন্য একটি ভাব এসে হাজির হলো, তাই বা এলো কেন তাও জানা নেই। আর সেগুলিকে নিয়ে যখন ভালো ক'রে বুঝতে চেষ্টা করবে এটার সঙ্গে ওটার কি সম্পর্ক তখন তাই নিয়ে ভাবতে বসলেই তোমার মাথা ধরে উঠবে, তখন মনে হতে থাকবে যে ঘোর অরণ্যে পথ হারিয়ে দিশাহারার মতো হয়ে পড়েছ।

মনকে চিন্তাশীল করতে রীতিমত শিক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের দরকার। তাই নিয়ে নিয়মিত অভ্যাস না করলে তুমি মেঘের উপরেই ভাসতে থাকলে; অধিকাংশ লোকের বেলাতে তাই হয়, তারা সব রকমের বিপরীত ভাবকে একসঙ্গে মাথার মধ্যে জড়ো করে, তাতে তাদের বেশ আরামই।

মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা না করলে অন্ততপক্ষে এই ক্ষতি হয় যে নিজের চিন্তার উপর নিজের কোনোই দখল থাকে না। তা ছাড়া, কখন কোন প্রশ্ন নিয়ে ভাবছো তা বিচার ক'রে দেখার সুযোগ পাবার আগেই প্রায় হয়তো কাজে নেমে পড়তে হয়; কিংবা কাজে না নামলেও নানারকম মানসিক আবেগ উদ্বেগ তোমাকে পেয়ে বসে। হঠাৎ তখন খেয়াল হয় যে সেই সব জিনিসকে আসতে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি, অথচ সেই সব চিন্তাকে কেমন ক'রে বশে আনা যায় তারও কোনো উপায় তুমি খুঁজে পাও না।

মন্দ চিন্তাগুলো আসে কেন? মনের উপর দখল না থাকাতেই কি?

উত্তর ওর অনেক কারণ থাকতে পারে, আর থাকেও তাই। স্বভাব যদি মন্দ হয়, তাতেও তা হয়। যাদের নিজেদের মনোভাব খারাপ, চিন্তাও তাদের খারাপ হবে। কিংবা আবার এমনও হতে পারে: বাইরের থেকে যে-কোন ভাবের ইঙ্গিত আসছে, তারা সেটা মনের মধ্যে গ্রহণ করছে: সেই ভাবটি এসে ক্রমশ একটা বিপরীত ভাবকে গড়ে তুলছে, তখন মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব বেধে যাচ্ছে, কারণ নিজের মনের উপর তাদের দখল নেই। সেই সকল মন্দ প্রভাব যখন চেতনার উপর দিকে ভেসে ওঠে তখন তা অবাঞ্ছনীয় হলেও তাকে তারা তাড়াতে পারে না, মনের ঘরের মধ্যেই তা স্থান ক'রে নেয়, কারণ দরজা তাদের খোলা।

সবরকম জিনিসের মধ্যেই তোমাকে নামতে হচ্ছে, ভালো, মন্দ, মাঝামাঝি, আলো, অন্ধকার, সবই আছে, কিন্তু সেখানে তোমার চেতনার দরকার ছাঁকুনির মতো কাজ করা। যেটা নেওয়া অনুচিত সেটা নেবে না, যা ভাবতে চাও না তা মোটে ভাববে না, বিশেষ ক'রে তোমার বিনা অনুমোদনে কোনো চিন্তাকেই বাস্তবে ও কাজে পরিণত হতে দেবে না।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের পার্থিব অস্তিত্বের আসল উদ্দেশ্যই তাই। প্রত্যেক মানুষই এক একটি যন্ত্রস্বরূপ, তার কর্মক্ষেত্রের পরিধির মধ্যে যে স্পন্দনগুলি আসছে তাকে সাবলে চলাই তার কাজ, ওর মধ্যে যেগুলি ভগবৎ-ইচ্ছার অনুকূলে সেগুলিকে নিয়ে নেবে আর বাকিগুলিকে প্রত্যাখ্যান করবে। কিন্তু হাজারের মধ্যে একজনও এমন করে না। হয়তো অল্পবিস্তর অমন কিছু চেতনভাবেই করতে হয় ঘটনাচক্রের ও পরিস্থিতির চাপে পড়ে, কিন্তু এমনি স্বেচ্ছায় তা করতে খুব কম লোকেই পারে। অবশ্য কেউ কেউ তা ক'রে থাকে। কিন্তু কেবল স্বেচ্ছায় সে কাজ করলেই চলবে না, সঠিক রাস্তায় ও পুরোপুরি চেতনার সঙ্গে তা করা চাই, যা আরো কম লোকে করে।

চিন্তাকে সংযত করার কথা? কেই বা তা করতে পারে? কেবল গোড়া থেকেই যে নিজেকে সেইভাবে তৈরি ক'রে এসেছে, বাল্যকাল থেকেই ঐ চেষ্টা বরাবর ক'রে এসেছে সেই শুধু পারে।

এরও আবার অনেকগুলি স্তর রয়েছে, চিন্তার উপর নিজের দখলের সম্পূর্ণ অভাব থেকে শুরু ক'রে ক্রমশ উপরের দিকে। বেশীর ভাগ লোকই চিন্তার অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়, কোনমতেই তাকে তাড়াতে পারে না, সেই এক চিন্তাই তাদের পেয়ে বসে, তার বিরুদ্ধে চেতনার দরজা চেপে বন্ধ ক'রে দেবার শক্তি তাদের নেই। চিন্তাকে তারা চালায় না, চিন্তাই তাদের চালায়, এমন কি তাদের উপর প্রভুত্ব করে, শাসন করে। নিত্যই নানা লোকের মুখে তাই নালিশ শোনা যায় "বাপ্‌রে, ঐ বিশ্রী চিন্তাটাই কেবল ঘুরে ফিরে আসছে, কিছুতেই একে হটাতে পারছি না।" তা ছাড়া আরো কত মন্দ ইচ্ছা এসে উঁকি মারে, তার থেকে উৎকণ্ঠা জন্মায়, ভয় আসে—যে চিন্তায় মনে ভয় আসে তা খুবই যন্ত্রণাদায়ক; যতবারই তাকে ঠেলে সরিয়ে দেবে ততবারই তা রবারের মতো তোমার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে আসবে। চিন্তাকে দমন করতে কে পেরেছে! অনেক বছর ধরে চেষ্টা করলে তা হতে পারে; এ জিনিসটি অভ্যাস করতে পারার এতই দাম।

ঐরকম স্তরের পরেই হলো এই অবস্থাটি, যখন চিন্তার উপর পুরো দখল তোমার আসেনি, কিন্তু এক ধাপ উপরে ওঠা হয়েছে, অর্থাৎ তখন মাথার মধ্যে কোনো চিন্তার কাজ শুরু হওয়া মাত্র তুমি তাকে হটিয়ে দিতে পারো, যেন তার তরঙ্গকে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলে, আর মনের উপরতলটি নিস্তরঙ্গ মসৃণ হয়ে গেল। চিন্তাটা থেমে গেল। যেন খাতার লেখা পাতাটা উল্টে দিয়ে এলো একটা সাদা পাতা—আগাগোড়া দাগশূন্য সাদা—একেবারে শ্বেত শুভ্র।

এ চেষ্টা নিজেও ক'রে দেখতে পারো, খুব ভালো লাগবে।

তার পর, তোমার মাথার মধ্যে ঠিক যে স্থানটিতে ছোটো একটি চিন্তাবিন্দু ঢুকে নাচানাচি শুরু করেছে, সেই স্থানটিকে লক্ষ্য করতে পারো। সে স্থান থেকে তাকে তুলে ফেলা যায়। শ্রীঅরবিন্দকে তাই করতে দেখেছিলাম একজনের মাথার ভিতর থেকে। সে লোকটি তাঁর কাছে নালিশ জানাতে এসেছিল যে তার মাথার মধ্যে একটা অবাঞ্ছনীয় চিন্তাভাব এসে তাকে উৎপীড়িত করছে। আমি দেখলাম শ্রীঅরবিন্দের হাতটি যেন উঠে এলো, একটি ছোটো কালো বিন্দুকে দুটি আঙুল দিয়ে ধরে তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, যেমন ক'রে তোমরা একটা পোকা ধরে ফেলে দাও,—ব্যস্, তখন সব কিছুই থেমে গেল...তখন সমস্তই শান্ত, স্থির, আলোকময় হয়ে উঠল।

আরো একবার দেখেছি, একজন এসে বললে তার কোথায় যেন দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে: "ওঃ, অসহ্য কষ্ট, ঠিক এইখানটায়!" শ্রীঅরবিন্দ একটিও কথা না বলে শুধু তার দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু আমি দেখলাম, একটা হাতের মতো উঠে এলো, সূক্ষ্মদেহের হাত, এই ব্যথার জায়গাতে যে বিন্দুর মতো জিনিসটি নড়ছে সেটিকে ধরে তিনি বের ক'রে দিলেন...তখনই সব কষ্ট থেমে গেল। লোকটি আরামে বলে উঠল "আঃ, এখন সব সেরে গেছে।"

*

প্রশ্ন: বুদ্ধির মীমাংসা সম্বন্ধে—

উত্তর: একটা জায়গা আছে যেখান থেকে বুদ্ধির তর্কগুলির আমদানি হয়, সে জায়গাতে তোমরা খুব কমই যাও, নিত্য যাতায়াত নেই। সে এক বিশিষ্ট ধরনের আলাদা জায়গা, কাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, যা বলবে তা কাজে ফলবে না। যে-কোনো একটি ভাবকে ধরে তাকে অকাট্য যুক্তিতর্কের দ্বারা সমর্থন ক'রে কেবল বুদ্ধির জোরে প্রমাণ ক'রে দেখানো যে তা একেবারে খাঁটি সত্য, এই তার কাজ। আমি জানি যে তা খুবই সম্ভব।

কিন্তু এটা বিশেষ করেই জেনে রাখা উচিত যে কাজে করা আর কল্পনাতে করা মানুষের মধ্যে দুই আলাদা বিভাগের তৎপরতা, দুই জিনিসকে একসঙ্গে চেতনাতে স্থান দিতে পারা খুবই কঠিন; যার মন খুব বেশী কল্পনাপ্রবণ তার পক্ষে কাজের লোক হওয়া, কিংবা যে কাজের লোক তার পক্ষে বুদ্ধির তরফ থেকে কল্পনাপ্রবণ হওয়া খুব কমই দেখা যায়।

যদি তুমি কাজের মানুষ হও আর কাজের দিকেই তোমার ঝোঁক থাকে, তাহ'লে তোমার এই কথাই মনে হবে যে এই সব কল্পনা ও বুদ্ধির বিচার তর্ক হলো যত অকেজো ও কুঁড়ে মানুষদের কারবার—আমি নিজে অবশ্য এ কথার উপর জোর দিচ্ছি না, কারণ যাদের কাজ প্রধানত বুদ্ধির তরফ থেকেই তারা এ কথা মানবে না। কিন্তু তর্ক করা প্রভৃতিকে একরকমের কসরৎ বলেই আমার মনে হয়, মনের উৎকর্ষের পক্ষে খুবই ভালো, তবে বিশেষ কিছু কাজের

নয়। কিন্তু মনে করো যারা শুধু মনের দিকের কাজ নিয়েই থাকে, তাদের কাছে যদি দৈহিক ব্যায়াম সম্বন্ধে মতামত জানতে চাও, তারা বলবে ওটা নিতান্ত বাজে জিনিস, ওতে কোনো লাভ হয় না। "কসরৎ করবার ফল কি? কেবল দেহের পেশীগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা। যেমন করে দেহের মাংসপেশীর অনুশীলন করছ তেমনি ক'রে মনের পেশীর অনুশীলন করোনা কেন?" দুই তরফের যুক্তিরই সমান মূল্য।

আমার কাছে এ প্রশ্নের মীমাংসা কিন্তু অন্যরকম। আমি বলি কেবল সত্যকে অনুসরণ করো, সকল দিক থেকে। যখনই নিশ্চয় করে বুঝবে যে কোনো জীবন্ত ও বাস্তব সত্য এই বিষয়গত বিশ্বে প্রকাশ হতে চাইছে, তখনই তোমার একমাত্র কাজ হবে তার সংস্পর্শে নিজেকে নিয়ে যাওয়া, যথাসাধ্য তার সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা করা, নিজেকে তার প্রকাশের এক যন্ত্ররূপে পরিণত করা, তাকে আরো জীবন্ত ও আরো বাস্তব করতে সচেষ্ট হওয়া, যাতে তার অভিব্যক্তি আরো সহজে পূর্ণতর হতে পারে। সকল তত্ত্ব, সকল ভাব, সকল পথই ভালো, কিন্তু তার ভিতরকার সত্যটিকে প্রকাশ করবার শক্তি অনুসারে; একাজে যতই তুমি অগ্রসর হবে, যেতে যেতে জগতের অজ্ঞানতার সীমাটি পেরোলেই দেখবে যে সত্যকে প্রকাশের জন্য মোটের উপর তার অভিব্যক্তির সমগ্রতা ও সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতাই সেখানে দরকার, তার থেকে কোনো-কিছুকেই বাদ দেবার নেই, তার মধ্যে বেশী জরুরী আর কম জরুরী বলে কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে দরকার হচ্ছে সকল দিক থেকে একটা সংগতি; সত্যের প্রত্যেক দিকটাই তার স্বস্থানে থেকে পরস্পরের মধ্যে যোগ রাখবে; তবেই সমস্ত মিলিয়ে দাঁড়াবে একটা সংগতিপূর্ণ পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি।

দৃষ্টিভঙ্গী এই স্তরেই থাকা চাই, যদি এর চেয়ে নীচের স্তর থেকে দেখতে চাও, তাহ'লে কোনো-কিছুকেই সঠিকভাবে বুঝবে না, প্রত্যেক দিকের তর্কই হবে সমান সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, কোনো দিকেরই আসল মর্মটি ধরতে পারবে না।

প্রতিটি জিনিসকেই তার স্বস্থানে থাকতে দাও, অন্যান্য সব জিনিসের সঙ্গেই তার সংগতি থাকুক, তবেই তার মর্মের মধ্যে ঢুকবে এবং তাকে বুঝবে।

এ কথা জেনো যে সামান্য একটি কাজ, তা যতই তুচ্ছ হোক, যদি তা সত্যের সমর্থক হয়, তার দান হাজার অকাট্য যুক্তিতর্কের চেয়ে অনেক বেশী।

সত্যদ্যুতির একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গ যদি তোমার চেতনার মধ্যে জ্বলে ওঠে, তাহ'লে অন্ধকার ঘোচাবার পক্ষে তাতেই অনেক বেশী কাজ হবে; সেই দ্যুতি কেমন ধরনের জিনিস ও তার দ্বারা কতখানি কি হতে পারে, তাই নিয়ে যতই কেন উৎকৃষ্ট রকমের গবেষণা ও বিচার করতে বসো, তাতে তেমন ফল কিছু মিলবে না।

*

প্রশ্ন: ভিতরের উপলব্ধিই কি বাইরের উপলব্ধিরও চাবিকাঠি?

উত্তর : বিরুদ্ধ শক্তিরা তো এই খুঁৎটাকেই ধরে। আমাকে ঘিরে যারা সকলে রয়েছে, বিরুদ্ধ শক্তিরা যখন তাদের উপর আক্রমণ চালিয়েও শ্রীঅরবিন্দের কাজকে পণ্ড করতে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আমার বিরোধী ক'রে তুলতে পারে না, তখন তারা সকলের কাছে এই যুক্তিটাই এনে হাজির করে : "ভিতরের উপলব্ধি তোমাদের যাই হোক না কেন, তা নিয়ে তোমরা ঐ আশ্রমের গণ্ডীর মধ্যেই রইলে, কিন্তু বাইরের রাজ্যে তোমাদের কোনো ঠাঁই নেই, জীবনটা তোমাদের বৃথাই নষ্ট হলো। ঐ ভিতরের অনুভূতির সঙ্গে বাইরের প্রকাশমান বাস্তবের উপলব্ধির কোনোদিনই মিল হবে না, ওর মাঝখানে যে বাসধান থেকে যাচ্ছে তা কিছুতেই ভরবে না।"

এই হলো বিরুদ্ধ শক্তিদের এক নম্বরের যুক্তি। এ আমার বিলক্ষণ জানা আছে, লক্ষ লক্ষ বছর আমি ঐ এক কথাই শুনে আসছি, আর বারেবারেই আমি ওর মিথ্যার মুখোস খুলে দিচ্ছি। ও কথা মিথ্যা। আগাগোড়া মিথ্যা, নিছক মিথ্যা। যা-কিছু ব্যাপারই আত্মা ও বাস্তব পৃথিবীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চেষ্টা করুক, কিংবা দিব্য উপলব্ধি থেকে অনুভূতিকে পৃথক দেখাতে চেষ্টা করুক, তারই উপর বিরুদ্ধ শক্তিরা খুব জোর দেয়। কিন্তু ও কথাগুলি সত্য নয়, ওর উল্টো কথাই সত্য। ভিতরের উপলব্ধি থেকেই বাইরের উপলব্ধির কবাট খুলবে। নিজের ভিতরকার সত্যকে আগে যতক্ষণ পর্যন্ত আয়ত্ত করতে না পারছো ততক্ষণ পর্যন্ত জগতের সত্যকে কেমন ক'রে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে?

* *

প্রশ্ন : পূর্ণ সমর্পণ সম্বন্ধে—

উত্তর : ভগবানের কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণের তিনটি ধারা

(১) সম্পূর্ণ দীনতার সঙ্গে সমস্ত অহমিকা দূর ক'রে পায়ে লুটিয়ে পড়া।

(২) আপন সত্তাটিকে তাঁর সামনে মেলে ধরা। বন্ধ কেতাবের পাতাগুলো যেমন ক'রে ফাঁক ক'রে খুলে ধরো, তেমনি ক'রে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ তাঁর কাছে খুলে মেলে ধরো, দেহের মধ্যে যত কেন্দ্র আছে তার সকল ক্রিয়াকে সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দাও, যেন কিছুমাত্র আড়ালে লুকিয়ে না থাকে।

(৩) তাঁর বক্ষে আশ্রয় নেওয়া, পূর্ণ বিশ্বাসে ও প্রেমে তাঁর মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকা।

ওর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করতে থাকার তিনটি মন্ত্র আছে, প্রয়োজন বুঝে তার একটিকে অথবা তিনটিকেই কাজে লাগানো যায় :

(১) আমার ইচ্ছা কিছু না প্রভু, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

(২) তুমি যেমন চাও প্রভু, তুমি যেমন চাও।

(৩) আমি শুধু তোমারই, চিরকালের জন্য, সর্বক্ষণের জন্য তোমারই।

এই জিনিসটা যদি বরাবর ঠিকভাবে ক'রে যেতে পারো, তখন লাভের মধ্যে এই ফল হবে যে তাঁর সঙ্গে তোমার পূর্ণ একাত্মতা এসে পড়বে, তখন অহং ভাবটি খসে গিয়ে এক স্বর্গীয় আনন্দে তুমি ভরে উঠবে।

* *

যেমন অবস্থাতে আছো তাই নিয়ে যদি তৃপ্ত না হও, তাহ'লে ভগবানের সাহায্য নিয়ে একেবারে পাল্টে যাও। আর নিজেকে বদলাবার যদি সাহস না থাকে তাহ'লে নিয়তির কাছে মাথা নুইয়ে থাকো।

কিন্তু নিজের অবস্থা নিয়ে ক্রমাগত নালিশ করতে থাকবে, আর নিজে বদ্‌লে যেতেও চাইবে না, এতে সময়ও নষ্ট আর শক্তিও নষ্ট।

সমস্ত বিপত্তি দূর হয়ে যেতে পারে, শুধু যদি নিজের কামনা বাসনা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে অহংকেন্দ্রিক দৃষ্টিটা ছাড়তে পারো।*

অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওতে ৮০তম জন্মদিনে মায়ের বাণী

জীবনের যে বছরগুলি বিনা কাজে বৃথায় কাটে সেই বছরগুলোই তোমাকে বয়সে বুড়ো ক'রে দেয়।

যে বছরটি বৃথায় কাটালে, সে বছরে একই অবস্থায় স্থাণু হয়ে থাকলে, উন্নতির দিক দিয়ে কিছু হলো না, চেতনার দিকটা কিছুমাত্র বাড়লো না, পরিণতির দিকে এক পাও এগুলে না।

তোমার নিজের চেয়ে আরো অনেক বেশী বড়ো এবং আরো অনেক বেশী উঁচু যে জিনিসটি রয়েছে তারই উপলব্ধি পাবার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করো, দেখবে সেই কাজে নিযুক্ত থেকে জীবনের যত বছরই কেটে যাক তবু তার গুরুভার একটুও বোধ হয় না।*

* অনুবাদক—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য।

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

[প্রথম পাদ—দিব্যকর্মযোগ]

৫

যজ্ঞভাবনার উদয়ন (ক)

প্রজ্ঞার কর্ম—চৈত্যপুরুষ

সমস্ত জীবনটাই একটা সাধনা। কিসের সাধনা? না আত্মাহুতির। আত্মাহুতিরই নাম যজ্ঞ। এই যজ্ঞের ভোক্তা সেই যজ্ঞেশ্বর, যাঁর কথা আগের অধ্যায়ে বলেছি।

কর্মযোগ জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ—সবারই মূলে রয়েছে যজ্ঞভাবনা। যজ্ঞভাবনা হল অন্তর্যাগ, যার অনুষ্ঠানে এক মুহূর্ত ফাঁক থাকে না। বহির্যাগ ছিল তারই প্রতিরূপ।

বহির্যাগে যজ্ঞবেদিতে আগুন জ্বালানো হত। সেই আগুনে দেবতার উদ্দেশে হোমদ্রব্য আহুতি দেওয়া হত। হোমদ্রব্যগুলিকে মনে করা হত যজমানেরই প্রতিনিধি। সুতরাং হবির আহুতি ছিল বস্তুত যজমানেরই আত্মাহুতি। আগুনের ছোঁয়ায় হোমদ্রব্য আগুন হয়ে উঠত। তার শিখা দ্যুলোকের দিকে উদ্যত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেত। মনে করা হত, মর্ত্য যজমান এমনি করে দ্যুলোকের দেবতার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করে অমৃত হয়ে গেল।

বহির্যাগের তাৎপর্য সুস্পষ্ট। এই হৃদয়ই যজ্ঞবেদি। তাতে জ্বলছে অভীপ্সার আগুন। সে-আগুনও এসেছে দ্যুলোক হতে। সাধনশাস্ত্রের ভাষায় তাকে বলি দেবতার প্রসাদ বা শক্তিপাত। কোন-এক শুভলগ্নে তাঁর প্রেমের আগুন আমাকে স্পর্শ করল। আমি চমকে উঠলাম—দেবতা আমায় চান। 'হ্রবিণোদাঃ পিপীষতি'—আমার শিরায়-শিরায় আগুনের স্রোত বইয়ে দিলেন যিনি, তিনি আজ পিপাসিত। আমার সব দিয়ে তাঁর পিপাসা মেটাতে হবে যে। শুরু হল উৎসর্গের তপস্যা। যা তাঁকে দিই, তা-ই আগুন হয়ে ওঠে। জড় চিন্ময় হয়। চেতনা ছড়িয়ে পড়ে ভূলোকে অন্তরিক্ষে দ্যুলোকে। বৃহতের সাযুজ্যে অগ্নিপিপাসার তর্পণ হয়। তারপর সপ্তসিন্ধুর মুক্তধারা নেমে আসে জীবনের নাড়ীতে-নাড়ীতে। সাযুজ্য ভাগার সাধর্ম্যের বীর্য। তাইতে যজ্ঞভাবনার চরম উদয়ন, পরম সার্থকতা। সন্ধ্যাভাষায় তার উল্লাস ছড়ানো আছে বেদের মাঝে।

প্রশ্ন জাগে, এমনি করে যে-জীবনে আগুন জ্বলল, তাকে কি আর এই প্রাকৃত-জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যাবে? জবাবে কেউ বলেন বিচ্ছেদের কথা, কেউ-বা ফাঁকির কথা। কেউ বলেন, আগুন জ্বলুক অন্তরে, কিন্তু বাইরের জীবন যেমন চলছে তেমনি চলুক। তবে অধ্যাত্মজীবনের সঙ্গে প্রাকৃত-জীবন যে মিশ খায় না, এবিষয়ে সবাই একমত। আধুনিক বেদান্তে সিদ্ধান্তটাকে দার্শনিক রূপ দেওয়া হয়েছে জ্ঞান-কর্মের অসমুচ্চয়বাদে: জ্ঞান আর কর্ম আলো আর আঁধারের মত, দুটির একসঙ্গে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। সমুচ্চয়বাদীরা কিন্তু এতদূর যান না। তাঁরা বলেন অর্চনা বা উপাসনার আকারে কর্ম থাকবে বই কি, কিন্তু এছাড়া আর-সব কর্মকে জানতে হবে হেয়। এক গীতাই বলছেন, কোনও কর্মই হেয় নয়, স্বধর্ম অনুযায়ী সব কর্মই করে যেতে হবে; আর স্বকর্ম দিয়ে যে তাঁর অর্চনা, তাইতে মানুষের সিদ্ধি। পূর্ণযোগের সিদ্ধান্ত অবশ্য গীতার সিদ্ধান্তেরই অনুকূল। অধিকন্তু পূর্ণযোগী ভাবছেন চেতনার রূপান্তরের সঙ্গে-সঙ্গে কর্মের রীতিরও রূপান্তরের কথা। অজ্ঞানীর বুদ্ধিভেদ না জন্মিয়ে তার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে বিজ্ঞানীকে এখনও বহুদিন পর্যন্ত কাজ করে যেতে হলেও একদিন যে দিব্যভাবনার প্রেরণায় কর্মের রীতিও আগাগোড়া পালটে যাবে—এ-নিশ্চয়তাকে স্বীকার না করে তিনি পারেন না।

চিন্ময়-ভাবনার দ্বারা কর্মরীতির সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটানোর পক্ষে আমাদের সংস্কারের বাধাও কম নয়। অনেকসময় ধর্মাচরণকেই আমরা মনে করি আধ্যাত্মিকতা। এটা যে ভুল, তা বলাই বাহুল্য। সাধনার প্রথম অবস্থায় লোকধর্মের অনুবর্তন কিছুদিন পর্যন্ত প্রয়োজন হতে পারে; কিন্তু সে যদি বোঝা হয়ে সাধকের ঘাড়ে চেপে থাকে, তাহলেই বিপদ। যথার্থ আধ্যাত্মিকতায় চেতনার মুক্তি ঘটে; কোনও বিধি-নিষেধ দিয়ে তাকে সঙ্কুচিত করা চলে না। এইজন্য নীতির শাসনও আধ্যাত্মিকতার বেলায় শেষপর্যন্ত অচল। ধর্ম হ'ক, নীতি হ'ক—সবই মানুষের মনগড়া। মনের শাসন কখনও দিব্য প্রশাসন হতে পারে না। তাই বাঁধাধরা কোনও ধর্ম বা নীতির অনুশাসন মেনে চলা অধ্যাত্ম-চেতার পক্ষে শেষপর্যন্ত অসম্ভব। তাবলে তিনি অধার্মিক বা অনীতিপরায়ণ নন। তাঁর ধর্ম এবং নীতির উৎস বিশ্বান্তর্যামীর অপরোক্ষ প্রশাসন—হৃদিস্থিত হৃষীকেশ তাঁকে দিয়ে যা করান, তিনি তা-ই করেন। তিনি তাঁরই দাস, মানুষের মানস-সংস্কারের দাস নন।

আবার ভাববিহ্বল প্রমত্ততাও সত্যকার অধ্যাত্মসাধনার অনুকূল নয়—যদিও আমাদের দেশে এটাকে অধ্যাত্মজীবনে একটা খুব বড় স্থান দেওয়া হয়। অধ্যাত্মজীবন প্রশান্ত প্রসন্ন সুস্থ এবং স্বপ্রতিষ্ঠ। বিধি-নিষেধের কড়াকড় দিয়ে আত্মনিগ্রহ অথবা ভাবাবেশের মাতলামি দিয়ে সূক্ষ্ম আত্মতর্পণ—কোনটাতেই তার সত্যকার পরিচয় নয়।

জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে বাইরের শাসনে নয় বা অবিশুদ্ধ চিত্তের প্রয়োচনাতেও নয়। সে চলবে অন্তর্যামীর প্রশাসন মেনে। তিনি হাল ধরলে তবে তরী স্বচ্ছন্দে কূলে ভিড়বে। কিন্তু তার জন্যও প্রস্তুতি চাই। 'আমি হাল ছাড়লে পরে তুমি হাল ধরবে জানি।'

বাইরের 'আমি'টাই আমার শত্রু। সে-ই তো আমাকে তাঁর কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে। মনের সংস্কার প্রাণের বাসনা দেহের দাবি জড়নির্ভরতা—এইগুলি চেতনাকে বারবার বাইরে টেনে আনছে। ফলে অশান্তি আর ঝামেলা বেড়েই চলছে দিনের পর দিন। অথচ মনে করছি, আমি বেশ আছি। এরই নাম অবিদ্যা। অবিদ্যার তলায় চাপা পড়েছে আমার চৈত্যসত্তা—যে আমার সত্যকার আমি। চৈত্যসত্তার সঙ্গে তাঁর যোগ নিত্য এবং অব্যবহিত। এই চৈত্যসত্তাকে নির্মুক্ত এবং সক্রিয় না করতে পারলে অধ্যাত্মসাধনা সত্য এবং সহজ হয় না—বদ্ধ সংস্কার এবং মূঢ় অহমিকার আবর্তে তা কেবল পাক খেয়ে মরে।

চৈত্যসত্তাকে জাগাবার উপায় হল অন্তর্মুখীনতা, বৃহতের নিত্যজাগ্রত অনুভব এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ। চারদিকে আলো আর আকাশের অবাধ বিস্তার, তার মাঝে কুঁড়ি সহজ আনন্দে ফুল হয়ে ফুটছে—এই হল চৈত্যসত্তার উন্মেষের ছবি। এই অনুভবটিকে জীবনে অনায়াস করতে হবে। তার জন্য প্রথমে চাই আধারশুদ্ধির জন্য একটা ব্যাকুলতা। তাঁর আনন্দ আর ভালবাসার জ্যোছনা অবিশ্রান্ত ঝরে পড়ছে আমার 'পরে, আমার সব কালোকে আলো করে তুলছে—এমনিতর একটা নীরন্ধ্র অনুভবকে বহন করা চাই। আর চাই নিজের চারদিকে একটা আলোর দেয়াল গড়ে তোলা—সাধনশাস্ত্রে যাকে বলে বিবিক্তসেবিত্ব বা আপনাতে আপনি থাকা। চারাগাছ লাগিয়ে তার চারদিকে বেড়া দিতে হয়, নইলে ছাগলে-গরুতে তাকে মুড়িয়ে খাবে বা উপড়ে ফেলবে। তারপর বড় হলে তার গোড়ায় হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না। আত্মস্থ হওয়ার পর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তখন সবই তিনি—অন্তরে তিনি, বাইরেও তিনি। জীবন তাঁরই নিঃশ্বাসের ছন্দে হিল্লোলিত।

আকাশে বাতাসে মাটিতে যে-আলো আছে আনন্দ আছে রস আছে, তা-ই ফুটছে ফুল হয়ে। আমার জীবনেও তেমনি তাঁরই প্রকাশ। প্রকাশ আমার বুদ্ধিতে, আমার হৃদয়ে, আমার সঙ্কল্পে। বুদ্ধির ভাবনা হৃদয়ের ভাব আর সঙ্কল্পের ক্রিয়া—এই নিয়ে আমার জীবন। তার সবটাতেই তাঁর দিব্যকর্মের অভিব্যক্তি। আমার মাঝে তা-ই প্রজ্ঞার কর্ম, প্রেমের কর্ম আর প্রাণের কর্ম। এই হল কর্মযোগের ত্রিপুটী। এখন একটি-একটি করে তাদের রীতি-প্রকৃতি বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

* * *

প্রথম ধরা যাক প্রজ্ঞার কর্ম, যাকে বলতে পারি বিদ্যার সাধনা। শাস্ত্রে দুরকম বিদ্যার কথা আছে—এক পরা-বিদ্যা যা দিয়ে অক্ষরতত্ত্বকে জানা যায়, আর এক অপরা-বিদ্যা যা দিয়ে ক্ষরতত্ত্বের অনুশীলন করা চলে। বোধির রাজ্য থেকে নেমে পরা-বিদ্যা মানুষের মনের রাজ্যে এসে নিয়েছে দর্শন আর ধর্মের রূপ। সেখানে দর্শন ক্রমে পরিণত হয়েছে লোকোত্তর তত্ত্ব নিয়ে নানা কূটকচালে, বাস্তব জীবন বা অপরোক্ষ অনুভবের সঙ্গে যার কোনও নাড়ীর যোগ নাই; আর ধর্ম তার দিব্য প্রেরণা এবং আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হয়ে নেমে

এসেছে সাম্প্রদায়িকতা গোঁড়ামি আচারসর্বস্বতা আর নৃশংস পরমতাসহিষ্ণুতায়।...এদিকে অপরা-বিদ্যার কারবার হল লোকোত্তর নিয়ে নয়, লৌকিককে নিয়ে। সে চায় বিজ্ঞানের সহায়ে প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্ত করতে, শিল্পে আর কলায় রসচেতনাকে মুক্তি দিতে, ঐহিক জীবনকে জানতে বুঝতে এবং সমৃদ্ধ করতে। বর্তমানে এইদিকেই মানুষের ঝোঁক পড়েছে এবং তার ফলে লোকোত্তর আর লৌকিক পুরুষার্থের সম্পর্কে বিত্রচ্ছন্দের জায়গায় দেখা দিয়েছে অবিচ্ছন্দ।

বলা বাহুল্য, পূর্ণযোগের সাধক লোকোত্তর আর লৌকিকে কোনও বিরোধ দেখেন না। দুয়ের মাঝে তিনি দেখেন একই চিৎশক্তির প্রকাশ। তার লক্ষ্য জড়ের বন্ধন হতে চেতনার মুক্তি। সে-মুক্তি যেমন আসে প্রকৃতির বশীকারে, তেমনি প্রকৃতির উত্তরণে। জীবনে পুরুষের কৈবল্যও সত্য, আবার প্রকৃতির বিভূতিও সত্য। জীবন যেমন অন্তরে-বাইরে প্রমুক্ত হবে, তেমনি আবার ঋদ্ধও হবে। যিনি যজ্ঞেশ্বর, তিনি যেমন বিশ্বোত্তীর্ণ তেমনি আবার বিশ্বাত্মকও। তিনি একাধারে আকাশের অবর্ণ শূন্যতা, আবার পুরুষর্ণা পৃথিবীর ঐশ্বর্যও। তাঁর সার্থনালাভেই জীবনযজ্ঞের পরম সার্থকতা। সুতরাং পূর্ণযোগী যেমন লোকোত্তরের আহ্বানে সাড়া দেন, তেমনি লৌকিককেও তিনি উপেক্ষা করেন না। পৃথিবীর সকল চাওয়াকে আলোর চাওয়াতে রূপান্তরিত করাতেই তিনি খুঁজে পান জীবনের সর্বাঙ্গীণ চরিতার্থতা।

তাইতে লৌকিক বিজ্ঞানের সাধনাকে তিনি কেবল ব্যক্তির বা জাতির অহমিকার আপ্যায়নের উপায়রূপেই দেখেন না, অথবা শিল্প এবং কলার চর্চাকে কেবল আকৃতি এবং প্রাণবাসনার তর্পণের সাধক বলে মনে করেন না। তিনি চান এক লোকোত্তর প্রজ্ঞা এবং আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এরা সর্বতোভদ্র হ'ক, প্রকাশ ও প্রবৃত্তির যে-বাসনা জীবনের মর্মমূলে তা সার্থক হ'ক চেতনার উত্তরায়ণে।

পূর্ণযোগী লৌকিক প্রবৃত্তিকে প্রত্যাখ্যান করেন না। কিন্তু তাবলে তিনি তার দাসও নন। তিনি জানেন, লৌকিকের অভিযান চলেছে লোকোত্তরের দিকেই। দর্শনে ধর্মে বিজ্ঞানে শিল্পে কলায় বা জীবনায়নে যতটুকু সিদ্ধি আজ মানুষের আয়ত্ত হয়েছে, তা-ই যে পর্যাপ্ত তা কেউ বলবে না। এগুলির মাঝে এখনও অন্যোন্যবিরোধ আছে, অপূর্ণতা আছে, এক সর্বব্যাপ্ত অনন্ত চেতনার সুঘন প্রকাশ এখনও এদের মধ্যে ঘটেনি। লোকোত্তরের ভাবনায় ভাবিত করে এদের রূপান্তর ঘটানোই তাঁর কাম্য। তাই এদের তিনি স্বীকার করেন বটে, কিন্তু এদের লোকায়ত ভাবনাকে মূলের মত অনুবর্তন করেন না।

* * *

পরা-বিদ্যা এবং অপরা-বিদ্যার মাঝে তাহলে মৌলিক কোনও বিরোধ নাই, কেননা দুটিই এক পরমা প্রজ্ঞারই প্রকাশ। তবুও একটিকে আমরা পরা বলি যেহেতু তার দৃষ্টি লোকোত্তরের দিকে, আরেকটিকে বলি অপরা যেহেতু তার দৃষ্টি লৌকিকের দিকে। কিন্তু

লৌকিকও যদি লোকোত্তরের সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, তাহলে তাকে আর যোগবিষ্ণু বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। আসলে সবই নির্ভর করছে, আমাদের চেতনা কোন্ ভূমিতে রয়েছে তার 'পরে। অপরা-বিদ্যার সাধনাও যদি চেতনাকে ঊর্ধ্বমুখী করে, সে যদি ভূমার সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাহলে তাকেও স্বচ্ছন্দে যোগাঙ্গ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এদেশে দেখি, শুধু পরা-বিদ্যার নয়—অপরা-বিদ্যার প্রবর্তকদেরও আখ্যা হল 'ঋষি'। অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যাকেই যোগজ প্রজ্ঞার বিভূতি বলে গণ্য করা এদেশের প্রাচীন রীতি। বলা বাহুল্য, এই দর্শনই সম্যক্-দর্শন। শুধু মানস চেতনার সহায়ে যে-বিদ্যারই অনুশীলন করি না কেন তার মধ্যে খাদ থেকে যাবেই। কিন্তু মানসোত্তর চেতনার স্পর্শে সেই বিদ্যারই স্বরূপ আবিষ্কারের ফলে সার্থক রূপান্তর ঘটে। অবিদ্যাগ্রস্ত চিত্তের দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প কলার এক রূপ; আবার ঊর্ধ্বচেতনার স্পর্শে এগুলিরই দেখা দিতে পারে আরেক রূপ।

বিদ্যার সাধনায় তাহলে চেতনার উৎকর্ষণটাই হল বড় কথা। বিষয়বস্তু যা-ই হ'ক না কেন, কোন্ চেতনা দিয়ে আমরা তাকে গ্রহণ করতে যাচ্ছি, সেইটাই দেখতে হবে সবার আগে। প্রাচীন কালে চেতনার উৎকর্ষসাধনকে শিক্ষার অঙ্গরূপে একটা মুখ্য স্থান দেওয়া হত। যে-কোনও বিদ্যার অনুশীলনের জন্য সংযম এবং তপস্যার দ্বারা আধারের প্রস্তুতি ছিল অপরিহার্য। এর প্রয়োজন আজও ফুরিয়ে যায়নি। চেতনা বিশুদ্ধ থাকলেই বিদ্যাকে শুদ্ধভাবে গ্রহণ করা যায় এবং তার সিদ্ধিও মঙ্গলা এবং সর্বার্থক হয়। তখন পরা এবং অপরা বিদ্যার মাঝে কোনও কৃত্রিম বিভাগের সৃষ্টি করার প্রয়োজন হয় না। তখন দেখি, 'বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ।'

চেতনার উৎকর্ষসাধন এবং বিদ্যার অনুশীলন সমান্তরালে চলবে। কিন্তু প্রধানত চেতনাই যখন সাধনার নিয়ামক, তখন তার উৎকর্ষসাধনার দিকে কখনও-কখনও হয়তো বেশী জোর দিতে হবে। তার জন্য সাধককে সাময়িকভাবে বিদ্যার অনুশীলন হতে নিবৃত্ত হওয়াও হয়তো দরকার হতে পারে। অনুশীলনে মন-বুদ্ধিই মার্জিত হয়, কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টির স্বচ্ছতা তাতে আসে না। তার জন্য দরকার ওহাহিত হওয়া। নিবৃত্তি সেক্ষেত্রে প্রবৃত্তির উচ্ছেদক নয়, উদ্দীপক। প্রয়োজনমত নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেবার অভ্যাস করতে পারলে দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়, কর্মের মাঝে অলখ হতে শুভশক্তির যোগান আসে।

এমনি করে মানসসাধনায় মানসোত্তর অধ্যাত্মশক্তিকেই করতে হবে দিশারী। কে এটি কিভাবে করবে তার কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নাই, কেননা মানুষের সংস্কার এবং অধিকার বিচিত্র। তবে এবিষয়ে দু-একটি সার্বভৌম সাধনসঙ্কেত যে দেওয়া যায় না, তা নয়। সঙ্কেতগুলি এই।

প্রথমত চাই বৃহতের একটা সুস্পষ্ট বোধ। দেহ-প্রাণ-মনের মাঝে যে-তরঙ্গগুলি উঠছে, এখন আমরা তাদের নিয়েই জড়িয়ে আছি। অনুভব করতে হবে, এগুলি আকাশের মত বিপুল এবং স্বচ্ছ এক চৈতন্যসমুদ্রেরই তরঙ্গ। মনের একটা দিকে যদি প্রাকৃত-বৃত্তির

কাজ চলতে থাকে তো তার আরেকটা দিক সবসময় এই বৃহৎকে ছুঁয়ে থাকবে। মাছ যেমন সমুদ্রের মাঝে ডুবে থেকে চলছে-ফিরছে, আমরাও তেমনি বাইরে-ভিতরে অনন্তের মাঝেই চলছি-ফিরছি। এই বৃহতের আবেশ যতই নিরন্তর হবে, ততই সে যেন মনেরও গভীরে সত্তার নেকতত্ত্বে আরেকটা চৈতন্যকে জাগিয়ে তুলবে যাকে উপনিষদের ভাষায় অনুভব হবে 'সত্যান্ন প্রাণাধারান মন-আনন্দ' বলে। এইটিই আমাদের মাঝে গুহাহিত চৈত্যপুরুষ। এই চৈত্যপুরুষের সঙ্গে বৃহতের একটা সহজ এবং অপরোক্ষ যোগ আছে। সে-যোগের বোধ যতই নিবিড় হবে, ততই দেখব কর্মের প্রেরণা আসছে উপরভাসা সংস্কারাচ্ছন্ন চেতনা হতে নয়—আসছে চিৎসত্তার একটা গভীরতর উৎস হতে। দেহ-প্রাণ-মন তখন হয়ে যায় এক নিপুণ যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রের মত। আমি তখন কাজ করি না—কেউ ভিতরে থেকে আমায় কাজ করায়, আমি ভাবি না—কেউ আমায় ভাবায়। তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে পারে। এখন মনের মাঝে হাজার ভাবনা কিলবিল করছে; তখন একেকসময় সেগুলি ছায়ার মত কোথায় মিলিয়ে যাবে, মনটা যেন শিশুমনের মত ফাঁকা হয়ে পড়বে। আর সেই ফাঁকা মনে কোথা হতে কে যেন আলোঝলমল ভাবনার রাশ ঠেলে দেবে। প্রাকৃত-ভূমিতে আমরা একে বলি প্রতিভা, যা ভাবনার দৈবী সম্পদ। এমনি করে চৈত্যসত্তার যোগে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দিব্যমননের জ্যোতির্বৈপুল্যকে এই মনে নামিয়ে আনাতেই হল মানসসাধনার চরিতার্থতা।

এই সিদ্ধির দুটি লক্ষণ। প্রথমত, মনের পটভূমিকায় বৃহতের বোধ ক্রমেই নিবিড় হবে। অথচ সে-বোধ যে মানসক্রিয়াকে সবসময় স্তম্ভিত করে রাখবে, তা নয়। এ যেন মনের মালঞ্চে আলোর প্রসাদ নেমে আসবে উপর থেকে, আর তাইতে তার ফুল ফোটানোর আর বিরাম থাকবে না। তখন যা ফুটবে, সবই আলোর ফুল। তারপর, মনশ্চেতনার এই রূপান্তর আধারে প্রতিষ্ঠিত করবে সেই দিব্য মনস্বানকে। মননের মস্তা তখন আর আমি নই—তিনিই। আমার আমিকে আর তখন মনের ত্রিসীমায় কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে যদি থাকে তো থাকবে এক বিশুদ্ধ সংস্কারহীন নির্মুক্ত অস্তিত্বের বোধরূপে, যে-বোধ তাঁরই সর্বগত বোধের বিচ্ছুরণ।

কিন্তু এও রূপান্তরের ভূমিকা মাত্র। বৃহতের বোধ যত গভীর হবে, ততই তাঁর দিব্যমননের চিন্ময় বৃত্তিগুলি আধারে উন্মেষিত হবে। তখন প্রাকৃত-মননের ধারায় ঘটবে সম্পূর্ণ বিপর্যয়। এই চিদ্‌বৃত্তিগুলি নিয়ে ইতিপূর্বে দিব্যজীবন-প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। এগুলির নাম হল উত্তরমানস, প্রভাসমানস, বোধিমানস এবং অধিমানস—যারা ধাপে-ধাপে উঠে গেছে অতিমানসের দিকে। এই বৃত্তিগুলির উন্মেষের সাধারণ লক্ষণ: বস্তু-জগতের গভীরে তখন ফুটে ওঠে একটা চিন্ময় ভাবের জগৎ। সে-জগতে ভাবই বস্তু—যে-ভাবের একটুখানি আবছায়া বুদ্ধির দৌলতে আমরা প্রাকৃত-ভূমিতেও পাই। কিন্তু মানসোত্তর জগতে ভাব আবছা নয়, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের মতই স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ। এই তীক্ষ্ণতার

হেতু রয়েছে তাদাত্ম্যবোধে—বিষয়ী এবং বিষয়ের একাত্মতায়। ভাবকে জানতে গিয়ে আমি আমাকেই জানছি এবং বস্তুকে দেখছি তারই প্রতিবিম্বরূপে। প্রতিবিম্ব ক্রমে বিম্বের দিকে এগিয়ে যায়। অবশেষে নিজের মাঝে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলে যখন, তখন ফোটে অতিমানসের সৌরসংবিৎ। সেই সৌরচ্ছটাই আবার মনের মানসেও দিব্যভাবনার ফুল হয়ে ফুটতে থাকে।

এই হল প্রজ্ঞার কর্মের স্বরূপ। একে জ্ঞানযজ্ঞও বলতে পারি। সে-যজ্ঞের যজমান হল মন। এ-সাধনার লক্ষ্য মনোবৃত্তির নিরোধের দ্বারা অমনীভাবে পৌঁছন নয়—যদিও মানস-অবিদ্যার মূলকে ওপড়াতে তারও সাহায্য নেওয়া দরকার হয়। এর আসল লক্ষ্য হল, মনের গভীরে অতিমানস শক্তির স্ফুরণ এবং সেই শক্তিকে প্রাকৃত-মননের পরিচিত সমস্ত বৃত্তির মাঝে বইয়ে দিয়ে তাদের দিব্য রূপান্তর ঘটানো।

* * *

যেমন প্রজ্ঞার কর্ম আছে, তেমনি আছে প্রেমের কর্ম। প্রজ্ঞা আর প্রেম শিব-শক্তির মত চেতনায় যুগনদ্ধ হয়ে আছে। প্রজ্ঞা আনে চেতনার মুক্তি, আর প্রেম তার মাঝে আনে রসসান্দ্রতা। প্রাকৃত-ভূমিতে প্রজ্ঞার আশ্রয় বুদ্ধি, আর প্রেমের আশ্রয় হৃদয়।

হৃদয়কে মানুষ ডরায়, কেননা তার আবেগ আর উচ্ছ্বাস অনেকসময় বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে দেয়। কিন্তু তাবলে হৃদয়ের দাবিকে জীবন থেকে ছেঁটে ফেলাও তো চলে না। প্রাকৃত-জগতে বিকার সবারই ঘটে—যেমন হৃদয়ের ঘটে, তেমনি বুদ্ধিরও ঘটে। কিন্তু হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে পারলে তার স্পর্শ বুদ্ধির মাঝে সঞ্জীবনী বিদ্যুতের সঞ্চার করে। বৈদিক ঋষি বলেন, তাঁকে মন দিয়ে পাওয়া যায়, মনীষা দিয়েও পাওয়া যায়—কিন্তু পাওয়া সম্পূর্ণ হয়, যখন হৃদয় দিয়ে পাই।

সাধনায় যেমন বুদ্ধির শুদ্ধিতে প্রজ্ঞার স্ফুরণ হয়, তেমনি হৃদয়ের শুদ্ধিতে স্ফুরণ হয় প্রেমের। অশুদ্ধ হৃদয় প্রাণবাসনায় বিকৃত, আত্মরতির মোহে আচ্ছন্ন। অথচ এই হৃদয়েরই গভীরে রয়েছে চৈত্যসত্তার আনন্দকণ। অপরা-প্রকৃতির বিকার তাতে নাই, আছে তাঁরই পরা-প্রকৃতির উল্লাস। আমার একটা আমি অহঙ্কারী, বুভুক্ষু—সে হল কাম-পুরুষ; আবার আমারই আরেকটা আমি বৃহতের কাছে সমর্পণের মাধুরীতে প্রসন্ন, নিত্য-তৃপ্ত—সে হল চৈত্যপুরুষ। এই চৈত্যপুরুষই অধ্যাত্মসাধনার সত্যকার সাধক। ইনি না জাগা পর্যন্ত সাধনা একটা কসরতের ব্যাপার থাকে শুধু—তাতে প্রাণসঞ্চার হয় না, সহজের সুরটি বেজে ওঠে না। অসীমের প্রতি শ্রদ্ধা, রতি, আকুতি—এইগুলি হল চৈত্যসত্তার জাগরণের লক্ষণ। শুধু মনের চাওয়াতে কিছুই হয় না, সে-চাওয়া হৃদয়ের চাওয়া হওয়া চাই। তবেই সমগ্র আধারে একটা আলোড়ন জাগে এবং তাইতে সবদিক দিয়ে তাঁকে পাওয়া সম্ভব হয়। প্রজ্ঞা দেয় লোকোত্তরের সন্ধান, আর সেই লোকোত্তরকে এই লোকে নামিয়ে আনে প্রেম। প্রেম ছাড়া সাধনা তাই পূর্ণ হয় না।

প্রজ্ঞার বৃত্তি যেমন ভাবনা, প্রেমের বৃত্তি তেমনি ভাব (feeling)। যেমন ভাবনার বেলায়, তেমনি ভাবের বেলাতেও বিবেকের প্রয়োজন। অশুদ্ধ ভাবকে বর্জন করে শুদ্ধ ভাবের আশ্রয় নিতে হবে। অশুদ্ধ ভাবের প্রযোজক হল কাম, আর শুদ্ধ ভাবের প্রচোদক প্রেম। 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।' কাম চায় সম্ভোগ, প্রেম দেয় সেবা। সেবা প্রেমের কর্মরূপ।

কার সেবা করব? ভক্ত বলেন, দেবতার সেবা কর। একমাত্র সেই সেবাই কর্ম, আর-সব বিকর্ম। কেউ বলেন, দেবতা মন্দিরে; কেউ বলেন, তিনি যন্ত্রে। কিন্তু যেখানেই তিনি থাকুন, শুধু একান্তে তাঁকে নিয়ে থাকলে সেবার পূর্ণ সার্থকতা হয় না। দেবতাকে নিয়ে ভাবের উদ্বেলতাতে সূক্ষ্ম প্রাণবাসনার তর্পণ হয় এবং অধিকাংশক্ষেত্রে জগৎ ও জীবনের অনেকখানি তার আওতায় আসে না। তাইতে কেউ-কেউ বলেন, নির্জনে নয়—সজনে দেবতার সেবা কর। মানবসেবাই সত্যকার দেবসেবা, সুতরাং নর-নারায়ণের পরিচর্যায় জীবন উৎসর্গ কর। আবার কেউ বলেন, মানবসেবাই একমাত্র ধর্ম; তার সঙ্গে আবার দেবসেবার কল্পনাকে জুড়ে দেওয়া কেন?

প্রত্যেকের মতের কিছু-না-কিছু সার্থকতা আছেই, কেননা এঁরা সবাই মানুষকে আত্মস্বার্থের সঙ্কীর্ণতা হতে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। তবুও এসব মতের কোনটিকেই সম্যক্-দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে স্বীকার করা যায় না। এদের মধ্যে সেবা কোথাও কেবল লোকোত্তর ইষ্টার্থের সাধক, কোথাও অধ্যাত্মসিদ্ধির অবান্তর সাধন মাত্র, কোথাও-বা শুধু অধ্যাত্মভাবনা-নিরপেক্ষ মনুষ্যত্বের উন্মেষক। মনঃকল্পিত আদর্শমাত্রেরই এই স্বরূপ, তারা কখনও খণ্ডভাবনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না।

বিশুদ্ধ অধ্যাত্মচেতনা বস্তুত এক অখণ্ড চেতনা। সে যে-প্রেমকে হৃদয়ে জাগায়, তা একটি সর্বাবগাহী সর্বতোভদ্র চিদ্বৃত্তি—তার মাঝে ইহলোকে-পরলোকে বা দেবতায়-মানুষে ভাগাভাগি নাই। হৃদি-সন্নিবিষ্ট চৈত্যসত্তাই সে-প্রেমের আশ্রয়; এবং যিনি বিশ্বোত্তীর্ণ হয়েও বিশ্বাত্মক, সেই সর্বময়ই তার বিষয়। এই চৈত্যসত্তা হৃদয়ের পুরোধা না হওয়া পর্যন্ত সত্যকার প্রেমও আমাদের মাঝে জাগে না।

চৈত্যসত্তার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র করেছি। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বললেই হবে চৈত্যপুরুষই আমাদের মাঝে সত্যকার নিত্যজীব—উপনিষদের ভাষায় 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ, সদা আত্মনি তিষ্ঠতি।' সূর্যমুখীর মত চিৎসূর্যের দিকে সবসময় তাঁর দৃষ্টি ফেরানো। প্রাকৃত-চেতনায় তাঁর প্রকাশ নাই, তবুও তিনি আছেন। জড়চেতনার পঙ্ক আর প্রাণবাসনার উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে সাবিত্রী-দীপ্তির দিকে ধীরে-ধীরে তিনি ফুটে উঠছেন—এই তাঁর স্বভাব। তাঁর স্ফুরণই আমাদের আধ্যাত্মিক বিজয়।

চেতনায় অভীপ্সার উন্মেষ চৈত্যপুরুষের জাগরণের প্রথম লক্ষণ। জাগ্রতবুদ্ধির সহায়ে তাকে আমরা খানিকটা ক্ষিপ্র করতে পারি। আধারশুদ্ধি হল সাধনার প্রথম পর্ব,

আর এটা সাধককে তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে নিজের চেষ্টাতেই করতে হয়। চাই স্নেহবোধের শুদ্ধি এবং স্বচ্ছতা, প্রাণবাসনার প্রশম আর মনের সমাহিতি। বাইরে থেকে ভিতরের দিকে মোড় ফিরিয়ে চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে একাগ্রতার ভূমিতে। সে-ভূমি বোধির আলোকে উদ্ভাসিত—পুরাণকারের রূপকের ভাষায় যেন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আনন্দবৃন্দাবন। পরমপুরুষের সঙ্গে চৈত্যসত্তার সেখানে সহজ যোগ—তিনি তার 'বন্ধুঃ আত্মা'। ধৃতি শক্তি প্রীতি রতি আর শান্তির বিশুদ্ধ প্রসাদ সেখানে চেতনার নিত্যসহচর। সেই প্রসাদে জীবন সমর্থ এবং প্রভাস্বর।

চৈত্যসত্তার সর্বোত্তম পরিচয় প্রেমে—অসীমের প্রতি এক সর্ববিস্মারী অবরুদ্ধ আকুল আকর্ষণে। মানুষের ভালবাসার সঙ্গে এ-প্রেমের তুলনা হয় না। এ-প্রেম 'নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়' আর মানুষের ভালবাসায় হাজার হলেও জড়ত্বের মোহ আর ক্লিপ্ত বাসনার খাদ মেশানো আছে। দেহের মূঢ়তা আর প্রাণের ক্ষিপ্ততার উর্ধ্বে চেতনার নিক্ষিপ্ত-ভূমিতে শুদ্ধমনোময় ভালবাসার আদর্শ মানুষের মাঝেও কখনও-কখনও প্রতিফলিত হয়, কিন্তু একাগ্রতার অভাবে তা স্থায়ী হয় না। ভালবাসার সত্যকার রূপ ফোটে মনোভূমির ওপারে বিজ্ঞানভূমিতে—যোগিচেতনার অধিকারে। সে-প্রেম অপ্রাকৃত; তার আশ্রয় এবং বিষয় দুইই অপ্রাকৃত। সত্যের মানুষ এই মানুষকেও যদি ভালবাসে, তবুও তার মাঝে সেই নিত্যের মানুষকেই ভালবাসে। আর সে ভালবাসে চিদ্‌ঘনবিগ্রহ গুরুকে, ভালবাসে তার পথের সোদর কল্যাণমিত্রকে।

অথচ সে-প্রেম নির্বীর্য নয়, জগতের প্রতি উদাসীনও নয়। যে-প্রেম দ্যুলোকের অভিসারে উৎশিখ হয়ে উঠেছিল, সেই প্রেমই আবার করুণার সৌম্যসুধায় বিগলিত হয়ে পড়ে পৃথিবীর 'পরে। রূপে-রূপে সে দেখে পরমেরই প্রতিরূপ। আর সে-প্রতিরূপকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চলে তার অপ্রান্ত তপশ্চর্যা। মহাশক্তির চিন্ময়ী সিসৃক্ষার অবরুদ্ধ প্রবেগ আশ্রয় করে সে-প্রেমকে। মহদ্‌ভয় উদ্যত বজ্রের হানায় অবিদ্যার পাষাণ-প্রতিরোধকে সে বিদীর্ণ বিচূর্ণ করে, দিক্‌চক্রবালে নতুন উষার অরুণ স্বপ্নকে করে সার্থক।

এই একান্ত একাগ্র আদিত্যাভিসারী অথচ বিশ্বজীব-হৃদ্‌বিলোড়ন প্রেমই চৈত্যসত্তার স্বরূপধর্ম।

[ক্রমশঃ]

ভারতীয় শিল্প

শ্রীঅরবিন্দ

প্রাচীন ভারতীয় শিল্প যখন শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে—আর যা শ্রেষ্ঠ তা অবশিষ্টকে প্রভাবিত ও স্বধর্মের রংয়ে রঞ্জিত করে তো বটেই—তখন তার মূলতত্ত্বটিও সম্পূর্ণ তার নিজস্ব, পৃথক। তার মহৎ উদ্দেশ্য আত্মদৃষ্টির সামনে সেই পরমাত্মাকে, সেই অসীমকে, সেই দিব্যকে অংশতঃ প্রকাশ করে ধরা প্রকাশ করা নানা ভাবের মধ্যে দিয়ে পরমাত্মাকে, জীবন্ত সসীম মূর্তির মধ্যে দিয়ে অসীমকে, তাঁর আপন শক্তির মধ্যে দিয়ে পরমেশ্বরকে। অন্যভাবে বলতে পারি, অন্তরাত্মার বুদ্ধি কিম্বা ভক্তির কাছে অথবা নিতান্তপক্ষে একটা অধ্যাত্মভাবাপন্ন কিম্বা ধর্মভাবাপন্ন রূপরুচির কাছে বিচিত্র ভগবানকে আভাসে ইঙ্গিত প্রকাশ, স্পষ্ট ব্যাখ্যাত কিম্বা অনাবৃত অভিব্যক্ত করে দেখাতে হবে। সমুন্নত শিখর থেকে এই পবিত্র শিল্প যখন নেমে আসে আমাদের জগতের ওপারে অন্তরীক্ষলোকে, উপদেবতা ও অশরীরী সত্তাদের কাছে, তখন পর্যন্ত সেখানে লেগে থাকে ঊর্ধ্বের খানিকটা স্পর্শ ও প্রভাব। তারপর তা যখন একেবারে নেমে আসে জড়জগতে, মানুষের জীবনে, স্থূল প্রকৃতির মধ্যে, তখনও সেখানে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না উপরের বৃহত্তর দৃষ্টি, পবিত্রতার স্পর্শ, অধ্যাত্মদর্শন। অধিকাংশ উৎকৃষ্ট সৃষ্টিরচনায়—অবশ্য এখানে ওখানে এসেছে যে একটু আধটু অবসর বিনোদনের ক্ষণিক বাসনা, লঘু বিষয় নিয়ে কিছু সরস রহস্যের স্পৃহা তার কথা স্বতন্ত্র—সর্বদাই এক অভ্রান্তদৃষ্টি জীবনকে এঁকে ধরেছে অপার্থিবের পরিবেশ দিয়ে। জীবন সেখানে দেখায় অন্তরাত্মাকে, আনে অসীমের কিম্বা একটা অন্যত্রের আভাস, অথবা যা এই সমস্ত রূপকর্মের মূলে তারই কিছু স্পর্শ বা ছায়া। অবশ্য ভারতীয় শিল্পের সর্বত্রই যে এই আদর্শ মূর্ত তা বলছি না ; অনেকটা আছে যা এতদূর যায় না নিশ্চয়—তা অনুন্নত, অক্ষম, কুরুচি-সম্মত পর্যন্ত। তবে যে শ্রেষ্ঠ বিশিষ্ট প্রভাব ও প্রয়োগপদ্ধতি দেয় একটা শিল্পের মেরুদণ্ড বা মূল সুর, বিচারের সময়ে তাকেই গণ্য করতে হবে। সমস্ত ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন তেমনি তার শিল্পের ক্ষেত্রেও পথ ও লক্ষ্য হল আধ্যাত্মিক।

ভারতীয় শিল্পী চলেন তাঁর আত্মার ধ্যানদৃষ্টি ধরে—এটি তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁর শিল্প-শাস্ত্রের অনুশাসন। বস্তুর যে অন্তর্নিহিত সত্য তিনি প্রকাশ করতে চান তাকে প্রথমে দেখেন তাঁর অধ্যাত্মসত্তার দৃষ্টি দিয়ে, তারপর তাঁর সমুদ্ধ মানসে ফুটে ওঠে সেই সত্যের রূপটি ; নমুনার জন্য, প্রস্তাবের জন্য, প্রত্যাদেশের জন্য, শিক্ষকের জন্য, প্রেরণার উৎস প্রাপ্তির জন্য স্থূল জীবন ও বাহ্য প্রকৃতির দ্বারস্থ হবার তাঁর দরকারই হয় না। আর তার প্রয়োজনই বা কী যখন একান্ত কোনো আভ্যন্তরীণ জিনিস তিনি প্রকাশ করতে চান ? তাঁকে এখানে

প্রেরণার জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে না কোনো বুদ্ধিগত ধারণার উপর, কোনো একটা মনগড়া কল্পনার উপর, একটা হালকা আবেগের উপর ; নির্ভর করতে হয়েছে আত্মার এক আবেশ, এক চিত্র-মূর্তি, এক নিবিড় অনুভূতির উপর। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে মনের উপাদান সব গৌণ, তারা শুধু দেয় বাহ্য আকৃতি ও উজ্জ্বলোর কিছুটা মাত্র। শিল্পচর্যায় আপাতদৃশ্য আকৃতি, বর্ণ, রেখা, নক্সা হল তাঁর স্থূল উপাদান, সে-সবের ব্যবহারে তাঁকে যে প্রকৃতিরই অন্ধ অনুকরণ করতে হবে এমন কোনো বাধা-বাধকতা নেই। প্রকট বস্তুটি যেন তার অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিভাত সত্যটি সম্পূর্ণ ধরে দেখায়—এই তাঁর লক্ষ্য। তা যদি সম্ভব, সুষ্ঠুভাবে সম্ভব, একটু পরিবর্তনের ফলে, একটা অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা, একটু রং বা অনুরাগের প্রলেপ দিয়ে, একটা বিচিত্র রূপক যোজনা করে, তবে অবশ্য সে-সব প্রয়োগের স্বাধীনতা তাঁর আছে ; কারণ তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হল যে অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ সত্য প্রকাশের ব্রত থেকে তিনি যেন বিচ্যুত না হন, যা দেখেছেন তা যেন দেখাতে পারেন। রেখা, বর্ণ ইত্যাদি তাঁর কাছে মুখ্য নয়, গৌণ বিষয়। কারণ, এরা ধারণ করবে সেই বহুবিধ জিনিস যা তাঁর মনে ইতিমধ্যেই অধ্যাত্ম রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর কাজ তো মানুষ বুদ্ধের মুখ এবং দেহ চিত্রে আবার এঁকে দেখানো নয়, তাঁর জীবনের একটি ঘটনা কিম্বা একটি অন্তরাবেগ চিত্রিত করাও নয় ; তাঁর কাজ বুদ্ধমূর্তির ভিতর দিয়ে নির্বাণের প্রশান্তি ফুটিয়ে তোলা—এই এক উদ্দেশ্যের সহায় ও অনুগত হয়ে চলবে আর যা-কিছু আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটি। আর যদি মানুষী আবেগ কিম্বা ঘটনা চিত্রিত করতেই হয়—নির্জলা ওরকম কদাচিৎ ঘটে—তখনও তাদের ছাড়িয়ে, তারা যে ইঙ্গিত করছে অন্তরাত্মার দিকে তাকে ধরতে হয়, সেখান থেকেই আবেগ ও ঘটনার উৎপত্তি। আসল জিনিস এইটি, কর্মের পিছনে যে অন্য অদৃশ্য শক্তি শিল্পীর সৃষ্টিতে প্রধান স্থান হয় যেন তার। দর্শকের চক্ষুর মধ্যে দিয়ে তার বাসনাময় আত্মাকে উত্তেজিত করা নয়, শিল্পীর আবেদন পৌঁছান চাই অন্তরাত্মার কাছে। বলা যায়, রসবোধের উদ্দেশ্যে সকল নন্দনবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন পার হয়ে আছে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি বা অনুশীলন—তাকে বাদ দিয়ে ভারতীয় শিল্পসৃষ্টির পরিপূর্ণ অর্থগ্রহণ আমাদের পক্ষে দুরাশা, কিম্বা সেক্ষেত্রে বড় জোর আমরা পৌঁছাব বস্তুর ত্বক্ অবধি নতুবা তার চেয়ে সামান্য একটু গভীরে। ভারতীয় শিল্প আধ্যাত্মিক ও সম্বোধিজাত—তাকে দেখতে হবে সেই সম্বোধির দৃষ্টি দিয়ে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে।

এই হল ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য, একে বাদ দিয়ে তার পরিচয় জানা অসম্ভব, অবশ্য কদর্থ করা সহজ। ভারতীয় স্থাপত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য শুধু ভারতীয় দর্শন, ধর্ম, যোগসাধনা, সংস্কৃতির মূল বস্তুর সঙ্গে একসূত্রে একসুরে বাঁধা নয়, তাদের অর্থপূর্ণ প্রকাশের বাহনও বটে।*

* Foundations of Indian Culture থেকে অনূদিত।

শূদ্ররাজ

শ্রীললিনীকান্ত গুপ্ত

বাল্মীকি বলিতেছেন রক্ষোরাজ রাবণের "আচারবর্জিত বিপরীত বুদ্ধি"। আচার-বর্জিত বিপরীত বুদ্ধি—আধুনিক জগতের সকল ব্যাধির মূল এই। আমরা জ্ঞান চাহিতেছি, বিদ্যার উপর বিদ্যা আহরণপূর্বক পুঞ্জীভূত করিতেছি; কিন্তু নাই আমাদের আচার, সৎপ্রয়োগ, সাধনা, চিত্তশুদ্ধি—সে দিকে কোন চেষ্টা করিতে বা দৃষ্টি দিতেও আমাদের ইচ্ছা বা অবসর নাই। Art for art's sakeএর মত আমাদের সব জ্ঞানের জন্য জ্ঞান। জ্ঞান যে ফলে স্বয়াচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে, বিপরীত দিকে ঝুঁকিয়া অজ্ঞানেরই সহায় হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? শিক্ষা আমরা জোর গলায় চাহিতেছি, কিন্তু দীক্ষার কথা শুনিলে কানে অঙ্গুলি দিয়া থাকি—ফলে শিক্ষা আমাদের ভয়স্থান হইয়া উঠিতেছে, তাহাও অনিবার্য্য।

বর্ত্তমান যুগের রেওয়াজ মনুকে গালাগালি দেওয়া—কারণ তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন শূদ্র যদি বেদপাঠ করে তবে তাহার জিহ্বা কাটিয়া দিতে হইবে এবং সে যদি বেদ শ্রবণ করে তবে তাহার কানে গলিত সিসা ঢালিয়া দিতে হইবে। কিন্তু মনুরও এই এতখানি রাগের কারণ কিছুই নাই? যে মানুষটি এত বড় সমাজের ব্যবস্থাদাতা, গঠনকর্ত্তা তাঁর কি এ যুগের রামাশ্যামার মত কাণ্ডজ্ঞান বা সহৃদয়তা ছিল না?

শূদ্র কে? আচারবর্জিত যে মানুষশ্রেণী ঠিক তারাই শূদ্র। শূদ্রেতর যাহারা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—তাহাদের আচার আছে, তাহারা দ্বিজ। ইহাদের আছে আন্তর বা অধ্যাত্ম জন্ম—দীক্ষা, সাধনা—যাহার প্রতীক হইল উপনয়ন। সাধনার অধিকারী যাহারা নয়, যাহাদের প্রকৃতি এখনও এতখানি জড়ত্বপূর্ণ, তামসগ্রস্ত তমসাচ্ছন্ন যে আন্তর জ্যোতি বা ঊর্দ্ধ-তর প্রভাবের ছায়া তাহার মধ্যে পড়িতে পায় না, তাহাদেরই নাম শূদ্র। শূদ্রের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাই সাধনা নয়, সেবা—পরার্থে একান্ত শারীরিক যত্ন পরিশ্রমের দ্বারা, আধারের ক্লেদ তাহাদের দূর করিতে হয় আগে, উচ্চতর পদবীতে উন্নীত হইবার সম্ভাবনা এইভাবে প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাকেই বলে জন্মান্তরীণ সুকৃতি—কারণ একই জন্মে এই উন্নয়ন সচরাচর ঘটে না, অন্ততঃ সমগ্র একটা শ্রেণীর পক্ষে নয়।

বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রে, সমাজে শূদ্রের অভ্যুত্থান হইতেছে তাহা ত স্পষ্টই দেখিতেছি। রাষ্ট্রের সমাজের নেতা তাহারাই হইয়া উঠিতেছে যাহারা যতখানি আচারবর্জিত। তাহাদের যদি কিছু আচার থাকে তবে তাহা হইল দেহগত বুদ্ধির আচার—উপনিষদের বৈরোচন-বাদ। অসুর বিরোচন "আত্মানং অবেক্ষ" এই মন্ত্র পাইয়া নিজেকে বা আত্মাকে দেখিলেন

কেবল শরীররূপে। কিন্তু সত্যকার আচার হইল শরীরে, শরীর আয়তনে অন্তরাত্মার সত্য, লোকোত্তর ধর্মের প্রকাশ। প্লেটো যে দার্শনিকের রাজত্ব, খৃষ্ট সাধকেরা যে সন্তের রাজ্য স্বপ্নে—দিব্য দৃষ্টিতে—দেখিয়াছিলেন তাহা হিটলার, মুসোলীনি এমন কি লেনীনের সাম্রাজ্য হইতেও বহু দূরের জিনিস।

কিন্তু বস্তুজগতের কথা ছাড়িয়া দিলাম—জ্ঞানের জগতে যে শূদ্রের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে এবং সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে তাহা আরও বিভীষিকাময়। আচারবর্জিত শিক্ষার বিপুল প্রসারের ফলে আজকাল কথা ফুটিয়াছে সকলের মুখে। চিত্তাবৃত্তির কণ্ডূয়ন যাহারই হইয়াছে, সে ধরিয়া লইয়াছে তাহার বলিবার কহিবার অধিকার জন্মিয়াছে যে কোন বিষয়ে। ম্যাক্সমুলার সংস্কৃত ভাষাটি শিখা করিয়াই স্থির করিলেন বেদমন্ত্রকে শিশুর কাকলি বা অসভ্যদের গান বলার তাঁর অধিকার হইয়াছে। উইনটের নিটস্ এই সে দিন বলিয়া ফেলিলেন যে উপনিষদ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা নয়—কেবল আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। আজকাল গীতার ব্যাখ্যা জনে জনে করিতেছে—বেদান্তের রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য শত শত জন সাগরপারে চলিয়াছে। রামকৃষ্ণের কথায় জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা ইহাদের মধ্যে চারপাঁচ কয়জন। পাইয়াছে ?*

আগে সকল বিদ্যাকে অপরা বিদ্যা বলা হইত এবং তাহাকে পরাবিদ্যার অনুগত অন্তর্গত করিয়া রাখা হইত। শিক্ষার প্রতিষ্ঠাই ছিল তখন দীক্ষা। জ্ঞান তাহারাই অর্জন করিত, বিতরণ করিত যাহারা একটা তপস্যা, সংস্কারের একটা শুদ্ধির ভিতর দিয়া গিয়াছে—জ্ঞান যাহাদের হইয়াছে তাহাদের নিজের সত্তার চেতনার সহজ অব্যর্থ অভিব্যক্তি। তখন জ্ঞানীর সংখ্যা ছিল স্বল্প, স্বল্প-লোকেই কথা বলিতে জানিতেন ও পারিতেন—বেশীর ভাগ ছিল শ্রোতা ও অনুসর্তা। কিন্তু এই শূদ্রযুগে—শ্রোতা আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কারণ আমরা প্রত্যেকেই হইয়া উঠিয়াছি বক্তা।

আধুনিক মনের সংস্কার অনুসারে শূদ্রতপস্বী শম্বুককে শ্রীরাম যে বধ করিয়াছিলেন তাহা রামচরিত্রের অমপনের কলঙ্ক (বালীবধ ও সীতা-বনবাস হইল আর দুইটি কলঙ্ক)। কিন্তু রামচন্দ্র এখানে একটি ধর্মকে, নীতিকে, ব্যবস্থাকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করিতেছিলেন, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। শূদ্র যদি দ্বিজের অনুকরণে সাধনা বা তপস্যা আরম্ভ করে, তাহার ফল ভাল হয় না। যোগপথের প্রথম বিধানই এই যে প্রথমে প্রয়োজন শুদ্ধি, আধারকে সাত্ত্বিক করিয়া তোলা। অশুদ্ধ আধারে তপোবলের, যোগশক্তির প্রকাশ বা প্রভাবে নিম্নতর প্রকৃতিকেই বলীয়ান করিয়া তোলে—অহংকারের সেবায় তাহার প্রয়োগ হয়—রাবণের

* রামকৃষ্ণকেও বিচার করিতেছেন আধুনিক দার্শনিকেরা—একদিকে ব্রহ্মরাজ অন্যদিকে কালী দুর্গা প্রভৃতি পৌরাণিক কুসংস্কার লইয়া রামকৃষ্ণ এক জগাখিচুড়ী। দার্শনিকেরা রামকৃষ্ণের দার্শনিক ডিগ্রি খুঁজিয়া পাইতেছেন না! তাঁহারা সহজ কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন, "নৈষা তর্কেন…"

নিজের তপস্যার ফল যাহা হইয়াছিল। দেবত্বের পদে ও চেতনায় আত্মদানের ফলে নিজে উন্নীত না হইয়া, দেববৃন্দকে সে নিজের সেবাকল্পে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। শূদ্রের তপস্যার স্বরূপ এই আসুরিক তপস্যা—তাহা তাহার নিজের পক্ষে, সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের সমস্ত ব্রতই ছিল পাশব, রাক্ষস তমোরাজস মানব প্রকৃতির উপরে (বালী ও রাবণ যাহার প্রতীক) একটা সাত্ত্বিক চেতনায় মানব সমাজকে গড়িয়া তোলা তাহার সকল ক্রিয়ার মানদণ্ড এইখানে—তিনি আপনার ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে যেমন দৃষ্টিপাত করেন নাই, তেমনি পরের সম্বন্ধেও কোন ব্যক্তিগত কারুণ্য কর্ত্তব্য হইতে তাঁহাকে বিচলিত করে নাই।

সে যাহা হৌক, আমাদের কথা হইল আধুনিক যুগ লইয়া। আধুনিক যুগে দ্বিজ নাই—সকলেই শূদ্র। সকলেই আমরা আচারবর্জিত। নূতন সমাজগঠনের প্রয়োজন হইয়াছে—সে জন্য প্রয়োজন নূতন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি, কারণ ব্রাহ্মণ হইতেই অন্যান্য শ্রেণীর সমাজ সৃষ্টি সম্ভব। আধুনিক জগতে যে নূতন ব্রাহ্মণের নমুনা আমরা পাই—যাঁহারা সমাজগঠনের নূতন ব্যবস্থা দিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে শূদ্রাতিরিক্ত শিক্ষাদীক্ষা আদৌ নাই। যে শিক্ষাদীক্ষার ফলে দ্বিজ, আচারবান হওয়া যায় আমি সেই শিক্ষাদীক্ষার কথা বলিতেছি। বলা বাহুল্য আচার অর্থ বাহ্য নিয়ম, অনুষ্ঠান বা সুনীতিগত ব্যবহার নয়। আচার হইল একটা ঊর্দ্ধতর গভীরতর চেতনার কর্ম্মগত অভিব্যক্তি।

জগৎ শুধু একটা ভোগস্থান এবং ভোগ্যবস্তুর আহরণ, পরিবেষণ ও রক্ষনই সমাজ ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য ও সার্থকতা—এটিকেই সমাজগঠনের মূলনীতি যদি করিয়া তুলি তবে সে নীতির দিক দিয়াও সুফলের সম্ভাবনা নাই। ভোগ্যেরও সুব্যবস্থা তখনই হইতে পারে যখন ভোগ্যকে আর একটি ঊর্দ্ধতর প্রয়োজন বা সার্থকতার অঙ্গীভূত, অনুগত করিয়া লইতে পারি। উপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা', বাইবেলের 'He that loseth life shall find life' এই ধরণের একটা লক্ষ্যের, সাধনার দিকে মানুষকে উপযুক্ত করিতেছে।

আধুনিক যুগে আমরা শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ হইতে চাহিতেছি অর্থাৎ সমাজের নেতা অধিপতি—স্রষ্টা পর্য্যন্ত—হইতে চাহিতেছি, কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বাদ দিয়া। বিদ্যার চর্চ্চা, বুদ্ধির চর্চ্চা, নিজের স্বাতন্ত্র্যের চর্চ্চা অথবা আর্থিক স্বচ্ছলতা—এ সকল কিছুই সত্যকার ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণ্যমর্য্যাদা আনিয়া দিতে পারে না—সে জন্য উপায় যদি কিছু থাকে তবে তাহা গীতাকারের সেই

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।

কিন্তু আমাদের কি সে মনোভাব আছে, না তাহা সহজ আমাদের পক্ষে? স্বাতন্ত্র্যের স্বৈরাচারের যুগে প্রাণ মন দেহকে প্রণত জিজ্ঞাসু হইতে বলা, ঊর্দ্ধতর জ্যোতির অনুগত দাস হইতে বলা প্রায় অরণ্যে রোদন।

বিশ্বধর্ম্মগ্রন্থ—গীতা

শ্রীঅনিলবরণ রায়

মানুষে মানুষে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রেমকে মানবজীবনের ভিত্তি করিতে হইলে আত্মার সন্ধান করিতেই হইবে, কারণ কেবল আত্মাতেই সকল মানুষ এক, আর সব কিছুতে, দেহে, প্রাণে, মনে তাহারা বিভিন্ন। জাতি হিসাবে মানুষ এখনও সেই আত্মার সন্ধান পায় নাই, তাই জগতে আজ এত দ্বন্দ্ব, বিরোধ, অশান্তি। এই অশান্তি যত তীব্র হইয়া উঠিতেছে ততই মানুষ উপলব্ধি করিতেছে যে, আত্ম-জ্ঞান বা আধ্যাত্মিকতা ভিন্ন মানুষের আর গত্যন্তর নাই—আর এই আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে পথ দেখাইবার জন্য সমগ্র জগৎ আজ ভারতের দিকে ফিরিতেছে। সম্প্রতি লণ্ডনে রামকৃষ্ণবেদান্ত কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সভার সভাপতি ব্রিটিশ রাজনীতিক Mr. Clement Davis বলিয়াছেন—"The future of Asia and the world rests much on the guidance that may be received from India. This guidance has to be a spiritual guidance. India has great opportunity for influencing the world." অর্থাৎ "ভারত কি পথ দেখায় তাহারই উপর এশিয়া ও জগতের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। ইহা আধ্যাত্মিকতার পথ—সমগ্র জগৎকে সেই পথ দেখাইবার মহান সুযোগ আজ ভারতের সম্মুখে।" শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার স্বাধীনতা দিবসের বাণীতে এই আশাই প্রকাশ করিয়াছিলেন—এইটিই ছিল তাঁহার জীবনের একটি প্রধান ব্রত—"Another dream, the spiritual gift of India to the world has already begun."

কিন্তু প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা কি সে বিষয়ে জগদ্বাসীর, এমন কি ভারতেরই অনেকের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। মানুষ তাহার মনের চিন্তা, প্রাণের বাসনাকামনা, হৃদয়ের স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা—এই সবের সহিতই পরিচিত, এই সবকেই সে তাহার সমগ্র সত্তা বলিয়া মনে করে—এই সবের পশ্চাতে যে আত্মা রহিয়াছে, ইহাদের ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকট করিতেছে—তাহার অস্তিত্ব মানুষের কাছে আজও স্পষ্ট হয় নাই। কিন্তু ক্রমবিকাশের ধারায় এই আত্মোপলব্ধি আসিতে বাধ্য—তখনই মানুষ পাইবে তাহার স্বরূপের সন্ধান—তখনই মানব-আধারে দিব্যজীবনের ভিত্তিটি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—

"At first soul in man does not appear as something quite different from mind and from mentalised life; its movements are involved in the mind movements, its operations seem to be mental and emotional activities; the mental human being is

not aware of a soul in him standing back from the mind and life and body, detaching itself, seeing and controlling and moulding their action and formation; but, as the inner evolution proceeds, this is precisely what can, must and does happen,—it is the long-delayed but inevitable next step in our evolutionary destiny."—*The Life Divine*. P. 854.

অর্থাৎ "মানুষের মধ্যে আত্মা প্রথমে মন এবং মনোবাসিত প্রাণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা কিছু বলিয়া দেখা দেয় না, ইহার ক্রিয়া মনের ক্রিয়ার সহিত জড়িত হইয়া থাকে, ইহার বৃত্তিগুলিকে হৃদয় ও মনের বৃত্তি বলিয়াই ভুল হয়। মনোময় মানুষ জানে না যে, তাহার মন, প্রাণ, দেহের পিছনে একটি অধ্যাত্ম সত্তা রহিয়াছে, নির্লিপ্তভাবে তাহাদের ক্রিয়া ও রূপায়ণ দর্শন করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, গড়িয়া দিতেছে। কিন্তু অন্তর যেমন বিকশিত হইতে থাকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মজ্ঞান আসিতে পারে, আসিবেই, আসিয়াই থাকে... কেননা বহুবিলম্বিত হইলেও মনোময় মানবের পর অধ্যাত্ম মানবের আবির্ভাব হইতেছে আমাদের বিবর্তনধারার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।"

যে সাধন, এই পরিণতি লাভে সাহায্য করে আধুনিক যুগে গীতা হইতেছে তাহার প্রকৃষ্ট গ্রন্থ। সেই জন্যই শ্রীঅরবিন্দ দুইটি বৃহৎ খণ্ডে গীতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন—কারণ পৃথিবীতে দিব্যজীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এই অধ্যাত্মচেতনার আবির্ভাব অপরিহার্য্য।

"It is the foundation of the pure spiritual consciousness that is the first object in the evolution of the spiritual man, and it is this and the urge of that consciousness towards contact with the Reality, the Self or the Divine Being that must be the first and foremost or even, till it is perfectly accomplished, the sole preoccupation of the spiritual seeker. It is the one thing needed that has to be done by each on whatever line is possible to him, by each according to the spiritual capacity developed in his nature."—*The Life Divine*. P. 862-63.

গীতা সকল স্তরের মানবের উপযোগী সাধনপ্রণালী দিয়াছে এবং তাহার সমর্থনে যে দার্শনিক তত্ত্বের বিকাশ করিয়াছে তাহাতে মনের জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হয়, সকল সন্দেহের নিরসন হয়। জগতে অন্যান্য মহান ধর্ম্মশাস্ত্র আছে—কিন্তু তাহাদের মধ্যে এমন অনেক কথা আছে যাহার সহিত আধুনিক জ্ঞান ও ভাবধারার বিরোধ হয়—তাই মানুষ আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস রাখিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে বাইবেলে সৃষ্টিতত্ত্ব যে-ভাবে

বর্ণিত হইয়াছে ভগবান শূন্য হইতে জগৎ ও জীবের সৃষ্টি করিলেন, ইহা আধুনিক বিজ্ঞানের Laws of Conservation of Mass and Energy-র বিরোধী—আধুনিক মতে যাহা আছে তাহা কখনও বিনষ্ট হয় না, যাহা নাই তাহা কখনও সৃষ্ট হইতে পারে না। গীতায় ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

গীতার মতে সৃষ্টির অর্থ যাহা অজ্ঞানের মধ্যে অব্যক্ত ছিল তাহাই ব্যক্ত হওয়া। গীতা বলিয়াছে, চৈতন্যময় ভগবান হইতেই সর্ব্বজগতের উৎপত্তি তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্। ১৮।৪৬

এক চৈতন্যময় সত্তা বা ভগবান জগতের মূলে রহিয়াছেন—একথা জড়বিজ্ঞান এতদিন স্বীকার করিত না—তাহার মতে অচেতন জড়ই মূল সত্য—জড়েরই একটি পরিণতিরূপে মন বা চৈতন্য দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই অভিমত অগভীর দৃষ্টির ফল। এইরূপ দৃষ্টি লইয়া বলা যায় মেঘে যখন বিদ্যুৎ প্রকাশ হইতেছে—তখন মেঘই মূল সত্য, বিদ্যুৎ তাহারই একটি পরিণতি মাত্র। কিন্তু গভীরতর সন্ধানের দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, মেঘ ও বারিবিন্দু যে অণুপরমাণুর দ্বারা গঠিত তাহাদের মূলে রহিয়াছে বিদ্যুৎশক্তি—আদিতে যাহা অব্যক্ত ছিল তাহাই পরিণামে ব্যক্ত হইয়াছে। ঠিক এইভাবেই জগতের মূলে রহিয়াছে চৈতন্য—আমাদেরও দেহ, প্রাণ, মনের পিছনে রহিয়াছে আত্মা—তাহাই আমাদের ও জগতের মূল সত্তা ও সত্য। পাশ্চাত্য মন এতদিন এই সত্যটি ধরিতে পারে নাই—আর পাশ্চাত্যের প্রভাবে সমগ্র মানবজাতিই জড়মনোভাবাপন্ন হইয়াছিল, আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস হারাইয়াছিল। এই অবিশ্বাসই ছিল পৃথিবীতে দিব্যজীবন-প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধক। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার সাধনায় মানুষের মনে পরিবর্তন আসিয়াছে। ১৯২৬ সালের ২৪শে নভেম্বরে দেবজগতের সহিত জড়জগতের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহারই ফলে এই পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে—বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও আর আত্মা বা আধ্যাত্মিকতাকে মনের কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে না—আধ্যাত্মিকতার সহিত বিজ্ঞানের সমন্বয় করিয়া মানবজীবনে এক নূতন তত্ত্ব কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের দিক হইতেও সে চেষ্টা বিশেষভাবে হইতেছে। বিজ্ঞান আজ মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতেছে যে, জগতের মূল সত্য সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকার তাহার নাই। সম্প্রতি প্রকাশিত Modern Science and Modern Man নামক গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"Physical research aims not to disclose a 'real existence' of things from 'behind' the appearance world, but rather to develop thought systems for the control of the appearance world".

অর্থাৎ "দৃশ্য জগতের পশ্চাতে যে মূল সত্তা রহিয়াছে জড়বিজ্ঞান তাহার সন্ধান করে না, ইহার লক্ষ্য হইতেছে দৃশ্যজগৎকে কেমন করিয়া আয়ত্ত করা যায় তাহারই মানস পরিকল্পনা রচনা করা"। কিন্তু জড়বিজ্ঞান যাহা করে না বা করিতে পারে না—অধ্যাত্মবিজ্ঞান তাহা করে এবং মূল সত্যের সন্ধান লইয়াই তদনুসারে জগৎ ও জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়। ইহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় রহিয়াছে গীতার মধ্যে। মানুষ চায় সুখ, কিন্তু পায় শুধু দুঃখ। প্রকৃত সুখলাভ করিতে হইলে মূল সত্যকে ধরিতেই হইবে—গীতা তাহারই সহজ পন্থা দেখাইয়া দিয়াছে,

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥৬ ॥২৮

আমাদের মধ্যে যে আত্মা রহিয়াছে তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই ভগবান, সচ্চিদানন্দ, তাহাকে জানিতে হইবে, পাইতে হইবে, তাহার সহিত যোগে জীবন ও কর্ম্ম পরিচালিত করিতে হইবে —তাহা হইলেই মর্ত্ত্যের মানবজীবন জ্যোতি, শান্তি, প্রেম ও আনন্দে পূর্ণ দিব্যজীবন হইয়া উঠিবে—ইহাই মানবের ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট নিয়তি। পাশ্চাত্য মন এখনও এই দিব্যজীবনের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝে নাই, সেই দিকে ফিরিতেছে মাত্র, অনেক ক্ষেত্রেই তাহারা আলোক ফেলিয়া আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিতেছে—এই সন্ধিক্ষণে গীতাই হইতে পারে জগতের দিশারী—তাই আজ সর্ব্বত্র গীতার আদর বাড়িতেছে। আজও অনেকেই ধর্ম্ম (Religion) এবং নৈতিকতাকেই (Morality) আধ্যাত্মিকতা (Spirituality) বলিয়া ভুল করিতেছে। ধর্ম্ম ও নৈতিকতা মানবীয় সভ্যতার বিকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে—কিন্তু উহারা মানব-প্রকৃতির আমূল রূপান্তর সাধন করিতে পারে নাই, মানুষ এখনও নিম্নপ্রকৃতির কবলে রহিয়াছে—এবং যতদিন ইহা থাকিবে ততদিন মানবজীবন, মানবসমাজের কোন সমস্যারই প্রকৃত সমাধান হইতে পারে না; আজ সেই সমাধানেরই দিন আসিয়াছে—মানুষকে আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াই তাহা সম্ভব হইবে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—**"A total spiritual direction given to the whole life and the whole nature can alone lift humanity beyond itself."** কেমন করিয়া ইহা কার্য্যতঃ সম্পন্ন করা যায় গীতা সেই শিক্ষাই দিয়াছে।

অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহা কোন বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালের উপযোগী—কিন্তু গীতার শিক্ষা এরূপ সীমাবদ্ধ নহে—গীতার মধ্যে এমন খুব কম জিনিসই আছে যাহা সকল দেশ, সকল কালের লোক গ্রহণ করিতে পারে না—গীতা প্রকৃত পক্ষেই সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র। গীতা কোন কোন বিষয় পরিস্ফুট করিতে প্রাচীন ভারতের রীতিনীতিকে উপলক্ষ্য স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে—কিন্তু তাহাও এমনভাবে করিয়াছে যে সহজেই তাহা সার্ব্বজনীনভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং কেবল সেইরূপ করিলেই গীতার শিক্ষার প্রকৃত মর্য্যাদা দেওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, গীতা প্রাচীন ভারতের যজ্ঞানুষ্ঠানের

উল্লেখ করিয়াছে। কিন্তু সেই বৈদিক যজ্ঞ ভারতেই বহুকাল পূর্বে লুপ্ত হইয়াছে, মহাভারতের যুগেও তাহার প্রচলন ছিল না। কিন্তু সেই যজ্ঞের অন্তর্নিহিত যে মূল সত্য—পরস্পরের ত্যাগ ও আত্মদানের ভিতর দিয়াই এই বিশ্বব্যাপার চলিতেছে—সেইটিকেই গীতা যজ্ঞের প্রকৃত মর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছে এবং তাহা সকল দেশ ও কালের পক্ষেই সত্য। আধুনিক যুগের যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরহিতসাধন, মানবজাতির সেবা—এইটিকেই গীতার যজ্ঞ বলিয়া বুঝিলে কিছুই ভুল হয় না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের সহিত আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় করিতে এই যজ্ঞকেই আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতেছেন। উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে বলা হইয়াছে **"Loving your neighbour is the epitome of a religious outlook"**—অর্থাৎ ধর্ম্ম বা আধ্যাত্মিকতার সারকথা হইতেছে "তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস।" আমাদের দেশেও সমাজ-নেতারা স্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে এই প্রেমকেই জীবনের নীতি করিতে উপদেশ দিতেছেন —**Love and non-violence**, কিন্তু এটি যদি শুধু একটা মানসিক ধারণা হইয়া থাকে তবে ইহা মানবজীবনকে কার্য্যতঃ প্রভাবিত করিতে পারিবে না। মানব-প্রাণের মজ্জাগত যে অহমিকা ও স্বার্থপরতা তাহাকে ইহা জয় করিতে পারে নাই, যদিও এই প্রেমের শিক্ষা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া জগতে প্রচারিত হইয়াছে। যতদিন না ইহা অধ্যাত্ম-অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—ততদিন ইহা এইরূপই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শ স্বপ্নমাত্রই থাকিয়া যাইবে। মানুষ যখন তাহার আত্মার সন্ধান পাইবে, উপলব্ধি করিবে যে এই আত্মায় সে আর সকল মানবের সহিত এবং ভগবানের সহিত এক—তখনই প্রেম পাইবে তাহার সুদৃঢ় অধ্যাত্ম-প্রতিষ্ঠা—মানুষ অন্য সকলের মধ্যেই নিজেকে দেখিবে, ভগবানকে দেখিবে, তখন সকলের প্রতি প্রেম তাহার হৃদয়ে আপনা হইতেই উৎসারিত হইবে—গীতা সেই শিক্ষাই দিয়াছে,

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। ৬।৩১

সাধারণ ধর্ম্ম এই আত্মোপলব্ধি আনিয়া দিতে পারে না, তাহা কেবল কতকগুলি অন্ধবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি। এই সব বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান বিভিন্ন ধর্ম্মে বিভিন্ন প্রকারের, তাই প্রচলিত ধর্ম্মগুলি মানবজাতিকে মিলিত না করিয়া ভেদবিবাদেরই সৃষ্টি করিতেছে। এই সব বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের পিছনে যে অধ্যাত্ম সত্য ছিল লোকে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে —গতানুগতিকভাবে তাহারা এই সব অনুসরণ করিতেছে, ইহাতে কোন আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে না, ইহা কেবল দ্বন্দ্ব ও বিরোধেরই সৃষ্টি করিতেছে। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন— **"It is unhappily the fate of all forms in human life to become crystallised, purely formal and therefore effete, and although form and cult preserve always their power for the man who can still enter into their meaning, the majority come to use the**

ceremony as a mechanical rite and the symbol as a lifeless sign and because that kills the soul of religion, cult and form have in the end to be changed or thrown aside altogether"—*The Synthesis of Yoga.*

এইভাবে যখন বৈদিক ধর্ম্মে গ্লানি আসিয়াছিল—বুদ্ধ তাহা পরিহার করিয়া পঞ্চশীল বা নৈতিকতার উপর জোর দিয়াছিলেন, কিন্তু গীতা সেই ধর্ম্মের মূল সত্যটি গ্রহণ করিয়া তাহাকে নূতন শক্তিশালী রূপ প্রদান করিয়াছিল। আজও ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিতে আমাদিগকে প্রথমেই গীতার আশ্রয় লইতে হইবে। লোকে মন্দিরে মসজিদে গির্জায় যায়, গতানুগতিকভাবে পূজা ও প্রার্থনা করে—কিন্তু ইহাতে আত্মা বা ভগবানের দর্শন মেলে না। ভারতে একযুগে মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল প্রতীক হিসাবে—যেমন মন্দিরের মধ্যে প্রতিমা বিরাজ করিতেছে, তেমনই সকল মানবের হৃদয়ের মধ্যেই ভগবান বিরাজ করিতেছেন, সেখানে তাহাকে আবিষ্কার করিতে হইবে, পূজা করিতে হইবে, ভালবাসিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ এই মূল সত্যটি জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

আধুনিক **Religion of Humanity** বা মানবধর্ম্মের এইটিই হইতেছে অধ্যাত্মস্বরূপ এবং গীতা ইহার প্রকৃষ্ট শাস্ত্র। অর্জুনের রথে উপবিষ্ট কৃষ্ণ তাহার সকল সংশয়ের সমাধান করিতেছেন, সকল দুর্ব্বলতা ও ভয় দূর করিয়া দিতেছেন, জগতে তাহার ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট মহান কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য তাহাকে শক্তি দিতেছেন—মানুষের সহিত ভগবানের সম্বন্ধের এইটি হইতেছে সুন্দর জীবন্ত দৃষ্টান্ত। ভগবান কোন দূর স্বর্গে বসিয়া নাই, তিনি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছেন, তিনি আমাদের অন্তরতম সুহৃদ—তাঁহার উপর যদি আমরা নির্ভর করিতে শিখি তিনি কখনই আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না। নিয়মিত গীতা পাঠে এই পরম অধ্যাত্ম সত্যটি আমাদের চৈতন্যে বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং উহাই আমাদের জীবনকে দিব্যভাবে গড়িয়া তোলে।

গীতা সমগ্র আর্য্যসংস্কৃতির অপূর্ব্ব সার-সমন্বয়। ইহা শুধুই দার্শনিকতা নহে, কেমন করিয়া আমরা ভগবানকে লাভ করিয়া মানবজন্ম ধন্য ও সার্থক করিতে পারি, গীতা তাহারই কার্য্যকরী পন্থা দেখাইয়াছে। গীতার সাধনা অনুসরণ করিতে হইলে ভগবান সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব পর্য্যাপ্ত ধারণা লইয়া অগ্রসর হইতে হয়, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত যেন তাহার কোন অসঙ্গতি না থাকে, যেন তাহা আমাদের বুদ্ধি ও প্রাণ ও হৃদয়কে তৃপ্তি দেয়। গীতার মধ্যে আমরা এইরূপ ধারণাই পাই। ভগবান এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়ন্তা, জগতের

সকল জীব সকল শক্তি তাঁহারই সেবা করিতেছে, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে. তিনি নিজের আনন্দের জন্য নিজের সত্তার মধ্যে এই আশ্চর্য্যময় বিশ্বলীলা প্রকট করিতেছেন, এই জগতে তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই সংঘটিত হয় না, কোন কিছুই তাঁহার সঙ্কল্পকে ব্যর্থ প্রতিহত করিতে পারে না—সে সঙ্কল্প হইতেছে সকল জীবকেই অমৃতত্ব ও দিব্যজীবনের আনন্দের মধ্যে লইয়া যাওয়া। এই সব তত্ত্ব গীতার একটি শ্লোকের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে—

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ৫।২৯

ভগবান সম্বন্ধে এই ধারণা মনে বদ্ধমূল করিয়া সর্ব্বপ্রকারে ভগবানের সেবা করা, ভগবানকে ভালবাসা অভ্যাস করিতে হইবে। এজন্য মন্দিরে বা তীর্থে যাইতে হইবে না, কোন পাণ্ডা বা পুরোহিতের শরণাপন্ন হইতে হইবে না, প্রয়োজন কেবল যেখানে হউক বসিয়া প্রত্যহ কিছুক্ষণ ভগবান সম্বন্ধে নীরবে ধ্যান করা এবং পত্র পুষ্প ফল জল যাহা হউক কিছু তাঁহাকে ভক্তিভাবে অর্পণ করা—সেই ভালবাসার দান ভগবান ভালবাসার সহিতই গ্রহণ করেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৯।২৬

গীতা জোর দিয়া বলিয়াছে, সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্মই নিষ্ঠা ও উৎসাহের সহিত করিতে হইবে, সর্ব্বকর্ম্মাণি, তবে সে-সব কর্ম্মই ভগবানের পূজা মনে করিয়া করিতে হইবে, সে-সবই উল্লিখিত পত্রপুষ্পের ন্যায় ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৯।২৭

কাম, ক্রোধ আর লোভ—এই তিনটিকে গীতা নরকের দ্বার বলিয়াছে, অতএব এই তিনটির বশীভূত হইবে না—অর্থাৎ ইহাদের বেগ আসিলেও তাহা সংযত করা অভ্যাস করিতে হইবে, তাহাদের বশে কোন কাজ করা চলিবে না, যাহা করিতে হয় শান্তভাবে বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়াই করিতে হইবে, যতক্ষণ না আমরা সজ্ঞানে ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহার ইচ্ছা ও শক্তির সচেতন যন্ত্র হইয়া উঠিতেছি।

যে-সব কাজে ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে যথা নিজের যশ, মান, প্রতিষ্ঠা অথবা স্ত্রীপুত্র পরিবার-বর্গের প্রতিপালন—এই সব করিতে করিতে গীতার কর্ম্মযোগ অভ্যাস ঠিক মত হয় না—অতএব সকলেরই কর্ত্তব্য অন্ততঃ কতকটা সময় ও শক্তি নিঃস্বার্থ জনসেবায় প্রয়োগ করা।

আর এই সাধনার সহায়স্বরূপ শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যার সাহায্য লইয়া নিয়মিত গীতা পাঠ করিতে হইবে। শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর জেলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে গীতার ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন, আধুনিক যুগে একমাত্র সেই ব্যাখ্যার সহায়েই গীতার প্রকৃত শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিব্যজীবনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

জাগরণ

(গান)

নিশিকান্ত

প্রিয়তম, তুমি জাগালে আমায়
তোমার কঠিন আঘাতে।
তোমার প্রেমের কোমল পরশে
পারোনি আমায় জাগাতে
জাগালে কঠিন আঘাতে।
লভিয়া তোমার দানের কুসুমগুলি
প্রাণ-বল্লরী ছিল যে তোমায় ভুলি ;
সে-ভুলভাঙার কণ্টকমালা।
দিলে চেতনার শাখাতে।
জাগালে কঠিন আঘাতে॥

আমার বিফল পূর্ণিমারাতে
ঘনায়ে আঁধার রাত্রি ;
ঘরভাঙা-ঝড়ে কোরেছ আমায়
তোমার পথের যাত্রী।
মলয়-বাসর-বাঁশরীতে বাজি নাই,
প্রলয়শঙ্খে বাজায়েছ মোরে তাই ;
প্রভঞ্জনের প্রগতি দিয়েছ
জীবন-পাখির পাখাতে।
জাগালে কঠিন আঘাতে॥

পরম প্রেমের সাধনা

শ্রীললিনীকান্ত সরকার

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলায় ভক্ত ও ভগবান ব'লে কোনো-কিছু নাই। এ রসের রাজত্বে ভগবান নেমে এসেছেন 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ' হ'য়ে। বৃন্দাবনের গোপগোপীদের কৃষ্ণানুরাগকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনেরা বলেছেন রাগাত্মিকা ভক্তি। এ কৃষ্ণভক্তি নারদ, বিদুর বা উদ্ধবের প্রভুভক্তি নয়,—যে-ভক্তি ভগবানের ভগবানত্ব পর্যন্ত তিরোহিত ক'রে তাঁকে আপন হতেও আপন ক'রে নেয়, এ সেই ভক্তি। এ ভক্তির সাধনা পরম প্রেমের সাধনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনেরা তাঁদের কাব্যে, নাটকে, চরিত-কথায় ও পদাবলীতে এই পরম প্রেমের চিত্র দিয়া সুষমায় অঙ্কিত করেছেন।

রাগাত্মিকা-ভক্তি-রস আস্বাদন করবার জন্যই বৃন্দাবনের গোপগৃহে লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের অপ্রত্যাশিতরূপে আবির্ভাব। এখানে তিনি নিজেকে নিমজ্জিত করেছেন বাৎসল্য-, সখ্য- ও শৃঙ্গার-রসে। স্নেহময় পিতামাতা, বালাবন্ধু রাখাল-বালকেরা ও প্রেমাধিনী গোপিকাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বর-ভাবের কোনও স্থান নাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদেরি মতো একজন সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কেহ নন। চৈতন্যচরিতামৃতকার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন—

"ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি না মানে ব্রজজন॥"

নন্দ-যশোমতীর কাছে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বড় আদরের সন্তান। আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে সন্তানের সেবাই তাঁদের একমাত্র কর্তব্যকর্ম, সর্বচিন্তা পরিহার ক'রে সর্বক্ষণ সন্তানের কল্যাণই তাঁদের একমাত্র কাম্য। পাছে কখনো কোনো সূত্রে সন্তানের অকল্যাণ হয়, এজন্য তাঁরা সর্বদা সতর্ক থাকেন। শিশু শ্রীকৃষ্ণের আচারে ব্যবহারে কোনোরূপ অসাধারণত্ব দেখলে তাঁরা অমঙ্গলের চিহ্ন ব'লে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। একবার এইরূপ পরিস্থিতিতে মা যশোদা

"ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চর্য বিধান
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে কর দান॥"

তাই ব'লে যশোদা স্নেহান্ধ জননী নন। পুত্রের অবাধ্যতা, অশিষ্টতা বা দুরন্তপনা দেখলে তার চরিত্র-সংশোধনের জন্যে যথোচিত শাস্তি দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না।

"গৃহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবনীত।
কোপ নয়নে রাণী চাহে চারিভিত॥

হেদেরে নবনীচোরা বলি পাছে ধায়।
এ-ঘর ও-ঘর করি গোপাল লুকায়॥
লড়ি হাতে নন্দরাণী যায় খেদাইয়া।
অখিলভুবনপতি যায় পালাইয়া॥
এ তিন ভুবনে যারে ভয় দিতে নারে।
সে হরি পালাঞা যায় জননীর ডরে॥"

রাখালবালকদের সঙ্গে গোপালের গোষ্ঠে গমনকালে যশোমতীর কেবলই আশঙ্কা, পাছে সেখানে তাঁর পুত্রের কোনো বিপদ ঘটে। পিতা নন্দের অবস্থাও তদ্রূপ। একদিন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের সঙ্গে গোচারণে যাচ্ছেন, মাতা যশোমতী তাঁকে সাশ্রু নয়নে বিদায় দেবার আয়োজন করছেন। এমন সময়ে নন্দঘোষ সেখানে এসে পুত্রের কল্যাণের জন্য

"ঈশ্বরের নামে মন্ত্র পড়ে হস্ত দিয়া
নৃসিংহ বীজ বজ্র মণি গলে বান্ধে লইয়া॥
পৃথিবী আকাশ আর দশদিগ পথে।
নৃসিংহ তোমারে রক্ষা করু ভাল মতে।"

যাত্রাকালে মা যশোদা গোপালের শিরশ্চুম্বন ক'রে বলেন—

"আমার শপতি লাগে না যাইও ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি॥"

মাতা যশোমতী ও পিতা নন্দের বাৎসল্য-রস ভগবান আস্বাদন করেছেন অপূর্ব লীলা-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে। নন্দ একদিন পুত্র কানাইকে বললেন—"দোহন করিব গাভী চলহ বাথানে", এই কথা বলে তাঁর পায়ের বাধা অর্থাৎ খড়মজোড়া খুলে তিনি পুত্র কানাইএর হাতে দিলেন।

"পায়ের বাধা খুলি দিল কৃষ্ণের হাতে।
ভকতবৎসল হরি বাধা নিল মাথে॥
আগে ধায় রামকৃষ্ণ পাছে নন্দরায়।
কণ্টক দেখিয়া নন্দ বাধা আন্ বোলায়॥
ধাই গিয়ে বাধা দিল নন্দের চরণে।
আনন্দে বিভোর নন্দ চলিল বাথানে॥"

গোচারণে গিয়ে শ্রীদামাদি সখাদের সঙ্গে তাদের প্রাণ-কানাই হয়ে শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব অভিরাম লীলা-মাধুরী প্রকটিত করেছেন। রাখালবালকেরা তাদেরই একজন ব'লে জানে তাদের কানাইকে। জানে তাদের অন্তরঙ্গ সখা, তাদের খেলার সাথী, তাদের আনন্দদাতা। কানাই সঙ্গে না থাকলে তাদের গোষ্ঠবিহারে আনন্দ হয় না, খেলায় মন বসে না, এমন কি গোরুগুলিও আয়ত্তের বাইরে চ'লে যায়। তাই তারা সকলে মিলে সাধ্যসাধনা ক'রে বা যশোদার কাছ থেকে গোপালকে নিয়ে যায় গোচারণে।

বনে গিয়ে তারা কত রকমেরই আনন্দ উপভোগ করে কানাইকে নিয়ে। বনের ফল আগে খেয়ে তার আস্বাদন সুমিষ্ট হ'লে সেই ফলের অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অংশটুকু তাদের কানাইএর মুখে তুলে দিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করে। কানাইও বন্ধুদের এই প্রেমের দান পরম আনন্দেই গ্রহণ করেন।

গোষ্ঠবিহারে রাখালবালকেরা খেলা করে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে। একদলের অধিপতি বলদেব—অন্যপক্ষের কানাই। খেলার পূর্বে

"সভাই সমান খেলু বাটিয়া লইল।
হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ কৈল॥
যেজন হারিবে ভাই কান্ধে করি লবে।
বংশীবটের তলে রাখিয়া আসিবে॥"

দুই দলে হ'লো দারুণ প্রতিযোগিতা কিন্তু "আজি খেলায় হারিল কানাই।" অতএব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র

"সুবল করিয়া কান্ধে বসন আটিয়া বান্ধে
বংশীবটের তলে যায়।"

খেলার পরিণতি প্রায় প্রত্যহই হয় এইরূপ। সখাদের স্কন্ধে নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করাতেই আনন্দময়ের আনন্দ। এই রসের আস্বাদনের জন্য তিনি যে বৃন্দাবনে এসেছেন। খেলায় মত্ত থাকা কালে গোরুগুলি নয়নের অন্তরালে দূর বনে চ'লে যায়। তখন তাদের একত্র করার ভার পড়ে কানাইএর উপর। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বেণু-সঙ্কেতে আহ্বান করেন ধেনুগুলিকে—

"সব ধেনু নাম কৈরা অধরে মুরলী লৈয়া
ডাকিতে লাগিলা উচচ স্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব ধায় ধেনু-বৎস সব
পুচ্ছ তুলি পিঠের উপরে॥"

বৃন্দাবনের গোধনও কৃষ্ণ-অনুরাগী। কেবল গোধনই বা কেন, তরুলতা, পশুপক্ষী এমনকি যমুনা নদীটি পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের আগমনে তথা অবগাহনে তরঙ্গোচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে,

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে যমুনার অশ্রুপাত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে

"সহজে যমুনা-জল অধিক হোয়ন
কহতহি গোবিন্দ দাস।"

শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুরাগে শুক-শারী বিহগমিথুনও সেবাপরায়ণ। একদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-যামিনীর এক উষায় অরুণোদয়ের সম্ভাবনা দেখে শুকশারীর কি দারুণ দুশ্চিন্তা ;—

"শুক বলে, শারী তুমি গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক॥"

এই রাগাত্মিকা ভক্তির চরম পরিণতি শ্রীমতী রাধাপ্রমুখ গোপবালাদের অকৈতব প্রেমে—পরিপূর্ণ আত্মদানে, পার্থিব প্রেমের মধ্যে অপার্থিব অনুরাগের বিকাশে। ঘৃণা-লজ্জা-ভয়, সমাজবন্ধন, নীতিবন্ধন, পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, মঙ্গল-অমঙ্গল, নিন্দা-স্তুতি—কোনোকিছুরই প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে ব্রজাঙ্গনারা একমাত্র অবলম্বন করেছেন তাঁদের পরম প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীরাধা এই পরম প্রেমের পূর্ণ প্রতীক।

শ্রীরাধার প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন—

Radha is the personification of the absolute love for the Divine, total and integral in all parts of the being from the highest spiritual to the physical, bringing the absolute self-giving and total consecration of all the being and calling down into the body and the most material nature the supreme Ananda.

—Lights on Yoga

"উর্ধ্বতন অধ্যাত্মসত্তা হইতে শারীর স্তরে পর্যন্ত আধারের সমুদয় অংশে ভগবানের প্রতি যে অখণ্ড ও সর্বাঙ্গীণ প্রেম, যাহার ফল পূর্ণতম আত্মসমর্পণ ও সমস্ত সত্তার সম্পূর্ণ উৎসর্গ, যাহা শরীর ও স্থূলতম জড়প্রকৃতির মধ্যে পরম অধ্যাত্ম আনন্দ নামাইয়া আনে, সেই পূর্ণতম প্রেমের মূর্তি রাধা।" —যোগের পথে আলো

গোপবালাদের হৃদয়ে এই প্রেম জাগিয়েছেন লীলাসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজগোপীরা স্ব স্ব গৃহে সাংসারিক কার্যে সংলিপ্ত আছেন। তাঁরা সমাজবদ্ধ মানুষ—স্বজনসেবা তাঁদের ধর্ম ; সাংসারিক কাজকর্মের মধ্যেই তাঁদের দিনগুলি অতিবাহিত হয়। এই নিরবচ্ছিন্ন সংসারযাত্রার মধ্যে একদিন এক পরম ক্ষণে প্রাচীর ভেদ করে বাতাসে ভেসে এল এক অপার্থিব আকুল আহ্বান বংশীধ্বনির ভিতর দিয়ে। শ্রীকৃষ্ণের ডাক। কাল সমাগত, তাই কালিয়া নাগর মুরলীধ্বনিতে তাঁদের ডাক দিয়েছেন।

He who chooses the Infinite has been chosen by the Infinite.

—Sri Aurobindo

আগে ডাক, পরে সাড়া। সে ডাকে

"রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে ছিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি তনু শীতল করিয়া॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাতারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি
বিচারিতে নাহি পাই ওর॥"

সে ডাক একদিন রূপপরিগ্রহ করলো কালিন্দীকূলে কেলিকদম্বের তলায় শ্রীরাধার সম্মুখে। প্রাণবল্লভের এই সাক্ষাৎ-দর্শনে শ্রীমতী অভিভূত হয়ে পড়লেন। ঘরে ফিরে যাবার সার্বত্ব যেন তাঁর লোপ পেয়েছে। কোনোরূপে নিতান্ত অনিচ্ছায় গৃহে প্রত্যাবর্তন ক'রে তিনি সখীদের বলেন,

"ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥"

বলেন—

"কি রূপ দেখিনু মধুর মুরতি
পিরীতি রসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক যার॥"

পরম প্রেমবতী শ্রীরাধা ত্রিভুবনে শ্রীকৃষ্ণ-রূপের তুলনা খুঁজে পান না। সে রূপ তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে জ্যোতিষ্মান হ'য়ে আছে সর্বক্ষণ।

ঘরে শান্তি নাই, তাই তিনি ঘরের বাহির হ'য়ে এসে নির্জনে একলাটি ব'সে আছেন আর স্থিরদৃষ্টি ধ্যানীর মতো চেয়ে আছেন মেঘের পানে। মেঘের শ্যামল শোভা দেখে তাঁর মনে শ্যামসুন্দরের অঙ্গকান্তি হয়তো উদিত হয়েছে।

"হসিত বদনে চাহে মেঘপানে
কি কহে দু'হাত তুলি।"

মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার এই অবস্থা দেখে একজন সখী তাঁকে ঘরে ফিরে যাবার জন্যে অনুনয় করেন, তিনি রাজা বৃষভানুর নন্দিনী, তিনি সম্ভ্রান্ত কুলবধূ;—এ-সব কথা স্মরণ করিয়ে দেন তাঁকে।

শ্রীরাধা সখীকে বলেন—

"ফিরিয়া আপন ঘরে যাও
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও?"

রাধা বলেন, তিনি আর তাঁর নন, —তিনি তাঁর সর্বস্ব, তাঁর আপনার বলতে যা-কিছু সবই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করেছেন। তাঁর দেহ-প্রাণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত। তিনি যেন জীবন্তে মৃত। তাই তিনি সখীকেই বলছেন ঘরে ফিরে যেতে। বলছেন,

"ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও?
নয়ন-পুতলী করি লইনু মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি-আগুন জ্বালি সকলি পোড়ায়েছি
জাতি-কুল-শীল-অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কত কি যে বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণগোচরে।
যোত বিথার জলে এ তনু ভাসায়েছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥"

কৃষ্ণ-প্রেম-স্রোতে শ্রীরাধা তনু ভাসিয়েছেন—চলেছেন সেই স্রোতেরই প্রবল টানে। অন্য কোনোদিকে কোনও চিন্তা পর্যন্ত নাই তাঁর। এক চিন্তা—ইষ্টচিন্তা—কৃষ্ণচিন্তা।

"খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনা আন নাহি ভায়।"

প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোনো-কিছু তাঁর মনে উদিত হয় না। পরমপ্রেমময়ী শ্রীরাধার এই অবস্থা।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণও আকুল হয়েছেন শ্রীরাধার সান্নিধ্যলাভের জন্য। পরস্পর পরস্পরের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ। শ্রীরাধাপ্রেমের "ইন্দ্রজালক কুসুম-শায়ক" শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ও বিদ্ধ করেছে। তিনিও "গোরোচনা গোরী নবীনা কিশোরী"কে যমুনা ঘাটে "নাহিতে" দেখেছেন। দেখেছেন—"যমুনার তীরে বসি তার নীরে পায়ের উপরে পা।" স্নানান্তে শ্রীমতী রাধিকা যখন কূলে উঠেছেন—পিঠের উপরে এলায়িত কুন্তলদাম দিয়ে জলধারা ঝরে পড়ছে, রসরাজ বিদগ্ধমাধব দেখছেন, যেন

"কাঁদিয়া আঁধার কনকচাঁদার
শরণ লইল আসি।"

"চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

পরস্পর-পরস্পরের প্রতি তীব্র আকূতি—নিবিড় অনুরাগ—একদিন সার্থক হ'লো মিলনের বন্যা দিয়ে। এ মিলন প্রেমপিপাসু হৃদয়ে জাগিয়ে দেয় নিত্যমিলনের সংকুচ্ছ ক্ষুধা—জাগিয়ে দেয় পিয়ার পরশ-রসের প্রবল পিপাসা।

সখাদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরাধা বলেন—

"কি পুছসি অনুভব মোয়।
কানুক পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥"

শ্রীরাধা যেন জন্মজন্মান্তর ধ'রে তাঁর প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপকে নয়নের মণি ক'রে চলেছেন—তবু সে রূপ দেখে তাঁর তৃপ্তি নাই। লক্ষ লক্ষ যুগ ধ'রে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখেছেন—তবু হৃদয় যেন জুড়োয় না। শ্রীরাধা বলেন—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণপিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥"

শ্রীকৃষ্ণও রাধা-ভাবে বিভোর। সর্বৈশ্বর্যশালী শ্রীকৃষ্ণের কাছে শ্রীরাধার প্রেমসম্পদ সবার উপরে। যিনি সাক্ষাৎ রসস্বরূপ, তিনি রাধাপ্রেমের রসাস্বাদনের জন্য বুভুক্ষু। যিনি স্বয়ং আনন্দবিগ্রহ, তিনি শ্রীমতী রাধার কাছ থেকে প্রেমানন্দের প্রত্যাশী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ সখাদের বলেন—

"রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ান।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার অধর-রস করে মোরে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল।
রাধিকার স্পর্শ মোরে করে সুশীতল॥"

শ্রীমতী রাধারও অন্তরে-বাহিরে শ্রীকৃষ্ণ। গৃহের অন্তঃপুরে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। নিরালায় ব'সে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেন। প্রাণবন্ধুর উদ্দেশে বলেন—

"রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধোঁয়ার ছলনা করি কাঁদি ।।"

ঘরের বাহির হন যখন, শ্রীমতী যেন সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেন শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণ থাকেন কখনও তাঁর গতিপথ রোধ ক'রে, কখনও থাকেন কদম্বের তলে, কখন বা কদম্ববৃক্ষের শাখায় লোকচক্ষুর অন্তরালে ;—নানাভাবে নানা ক্ষেত্রে দেখতে পান প্রেমের পূর্ণচন্দ্রকে। শ্রীরাধিকা যমুনায় স্নান করছেন, দেখেন অপর ঘাটে স্নানরত শ্রীকৃষ্ণ। তিনি সখীদের বলেন—

"সই, পিরীতি পিয়া সে জানে।
যা দেখি যা শুনি চিতে অনুমানি
নিছনি দিয়া পরাণে ।।
সো যদি সিনাও আগিলা ঘাটে
পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল পরশ লাগিয়া
বাহু পসারিয়া রয় ।।
বসনে বসনে লাগিবে লাগিয়া
একই রজকে দেয়।
মোর নামের আধ আখর পাইলে
হরিষ হইয়া নেয় ।।
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়া
ঘুরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিকে
সে দিকে সে মুখে থাকে ।।"

শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই প্রেম প্রস্ফুরিত হয়েছে দান-মান-কলহান্তরিতাদি নানা লীলা-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে। আর তার চরম অভিব্যক্তি হয়েছে মহারাসে। এখানে "রাই-কানু দুই তনু একই হইয়াছে"—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সাযুজ্যলাভ করেছেন। কেবল শ্রীরাধাই নন, প্রত্যেকটি কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজগোপী স্বতন্ত্রভাবে সাযুজ্যলাভ করেছেন শ্রীকৃষ্ণের।

শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসলীলার ইচ্ছা ক'রে নিধুবন থেকে বেণুরবে গোপীদের আহ্বান করলেন, সে মহা আহ্বানে গোপীদের চিত্ত মিলন-চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। যিনি যে-অবস্থায় যেভাবে গৃহকর্মে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি সেই অবস্থাতেই ছুটলেন নিধুবনে—

"বিভুরি গেহ নিজহঁ দেহ,
এক নয়নে কাজর রেহ,
বাহে বলিত বলির এক
এক কুণ্ডল দোলনি।

শিথিল ছন্দ নিবিক বন্ধ,
বেগে ধায়ত যুবতিবৃন্দ,
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণী লোলনী ।।"

শ্রীরাধাপ্রমুখ সমস্ত লীলাসঙ্গিনীরা সমবেত হ'লেন নিধুবনে। আজ পরিপূর্ণ উপলব্ধির আনন্দ—পরিপূর্ণ আনন্দের মেলা। ব্রজাঙ্গনারা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁদের প্রাণবল্লভের কাছে। তাঁদের নিজেদের সুখ-সম্ভোগ-আনন্দ ব'লে কিছুই নাই। পরম দয়িত শ্রীকৃষ্ণের সুখেই তাঁদের সুখ, শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগেই তাঁদের সম্ভোগ, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দেই তাঁদের আনন্দ।

গোপীমণ্ডলী দ্বারা রচিত হ'লো রাসমণ্ডল ;—মণ্ডলটি যেন স্বর্ণ-নির্মিত ও মণিমানিক্য-খচিত রূপ ধারণ করেছে—

"কাঞ্চন-মণিগণে জনু নিরমায়ল
রমণীমণ্ডল সাজ।
মাঝই মাঝ মহা মরকত সন
শ্যামরু নটবর রাজ ।।
ধনি ধনি অপরূপ রাস-বিহার।
থির বিজুরি সঞে চঞ্চল জলধর
রস বরিখায় অনিবার ।।
কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই
তিমিরহ কত কত চান্দে।
কনকলতায়ে তমালহ কত কত
দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু বান্ধে ।।
কত কত পদুমিনী পঙ্কজ গায়ত
মধুকর ধরু শ্রুতি ভাষ।
মধুকর বেলি কত পদুমিনী গায়ত
নুগধল গোবিন্দ দাস ।।"

সঙ্গীতে, নৃত্যে, হাস্যে, পরিহাসে এই রাসমণ্ডলীতে লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। ব্রজগোপীরা যেমন পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেন তাঁর কাছে, তেমনি তিনিও পূর্ণরূপে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন গোপীদের কাছে। শ্রীমদ্ভাগবতকার গোপীদের এই আত্মসমর্পণকে যোগী-ঋষি-তপস্বী-সাধুসন্তদের সাধন-সিদ্ধির সঙ্গে তুলনা ক'রে বলেছেন—

"অপরাহ্নিনিমিষদৃগ্ভ্যাং জুষাণাং তন্মুখাম্বুজং।
আপাতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা ।।

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা ॥
সর্ব্বাস্তা কেশবলোক-পরমোৎসব-নির্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥"

সাধুসন্তরা বারবার ভগবানের সেবা করেও যেমন সম্যক্‌রূপে তৃপ্তিলাভ করেন না, কোনো কোনো ব্রজগোপীরও সেই অবস্থা। ধ্যানী যোগী যেমন নিমীলিতনেত্র হয়ে সমাধিস্থ হয়ে থাকেন, কোনো কোনো গোপীর অবস্থা তদ্রূপ। ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানীগণের পরমাত্মভাব প্রত্যক্ষ ক'রে সংসার-জ্বালা অতিক্রমণের মতো গোপিকারাও শ্রীকৃষ্ণ-ভাব-দ্যুতিতে নিমগ্ন হয়ে বিরহ-তাপ থেকে মুক্তিলাভ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাসহচরী তাঁরা—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের অবিচ্ছেদ্য মিলন—নিত্যানন্দলোকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁদের নিত্য-মহারাস।

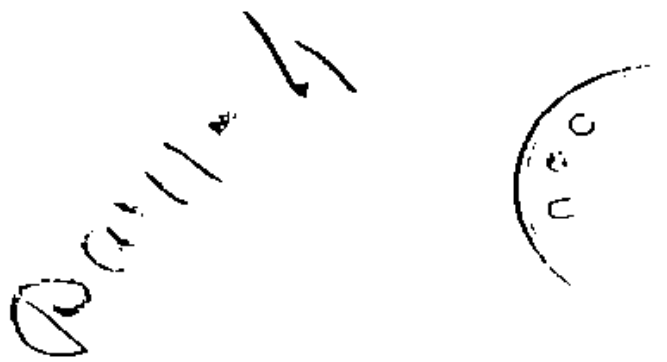

নভেম্বর ২৪

১৯৫৮

"অসৎ-বস্তু থেকে আমায় নিয়ে চল সৎ-বস্তুর মধ্যে,
তমসা থেকে আমার নিয়ে চল জ্যোতির মধ্যে,
মৃত্যু থেকে আমায় নিয়ে চল অমৃতের মধ্যে।

ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!"

উপনিষদ

"তথাস্তু"

—শ্রীঅরবিন্দ

মায়ের প্রার্থনা

জানুয়ারী ২৯, ১৯১৭

রূপের জগতে সৌন্দর্য্যে কোন ত্রুটি ঠিক তত বড় দোষ, যত বড় দোষ জ্ঞানের জগতে সত্যে কোন ত্রুটি। কারণ সৌন্দর্য্য হল বিশ্ববিধাতার কাছে প্রকৃতির পূজা-নিবেদন। রূপায়িত দিব্যভাষাই সৌন্দর্য্য। যে ভাগবতী চেতনা সৌন্দর্যকে ধারণ ক'রে, প্রকাশ ক'রে বাহ্যতঃ প্রবুদ্ধ হয় না, তা হল অসম্পূর্ণ চেতনা।

কিন্তু ভগবানের অন্যান্য প্রকাশধারা যে রকম ঠিক সে-রকমই সত্যকার সৌন্দর্য্যও আবিষ্কার করা, ধারণ করা, বিশেষতঃ জীবনে জীবন্ত করে তোলা কঠিন। এই আবিষ্কার এবং এই প্রকাশের জন্য ঠিক ততখানি নির্ব্যক্তিত্ব ও নিরহঙ্কার প্রয়োজন যতখানি তা প্রয়োজন সত্য বা আনন্দের জন্য। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য হল সার্ব্বভৌম, তাকে দেখতে হলে চিনতে হলে সার্ব্বভৌম হওয়া দরকার।

হে ভাগবত সৌন্দর্য্য, তোমার কাছে কত না দোষ করেছি, কতই না করে চলেছি... তোমার ধর্ম্মের তোমার বিধানের পূর্ণ অবধারণা আমাকে দাও, যেন তা হতে আর কোন বিচ্যুতি না হয়। তোমার বিহনে প্রেম হবে অপূর্ণ—তুমি হলে প্রেমদেবতার সুষ্ঠুতর আভরণ, পরম সুধীর হাস্য। তোমার সার্থকতা কখন কখন আমি স্বীকার করি নাই, কিন্তু অন্তরের অন্তরে সর্ব্বদাই তোমাকে আমি ভালবেসেছি। শিশুকাল হতে তোমাকে যে পূজা আমি দিয়ে এসেছি তার আগুন কোন মতবাদ, তা যত অযৌক্তিক যত বৈনাশিকই হোক না, নির্ব্বাপিত করতে পারে নাই।

অহংসর্ব্বস্ব মানুষেরা যা মনে করে সে রকম তুমি আদৌ নও, জীবনের কোন একটি বিশেষ রূপায়ণের সঙ্গে অনন্যভাবে তুমি সংযুক্ত নও—সকল রূপের মধ্যে তোমাকে প্রবুদ্ধ করা যায়, উদ্ভাসিত করা যায়; তবে সে জন্য প্রয়োজন তোমার রহস্যটি আবিষ্কার করা।

হে সুন্দরের দেবতা, আমাকে তোমার দিব্য-বিধানের পূর্ণ-জ্ঞান দাও, তা থেকে আমি যেন আর ভ্রষ্ট না হই, আমার মধ্যে তুমি যেন হয়ে ওঠ প্রেমের দেবতার সৌম্যতর মুকুটমণি।

মার্চ্চ ২৭, ১৯১৭

(ধ্যানের মধ্যে লব্ধ সংলাপ-আকারে বাণী)

"এই দেখছ ত জীবন্ত রূপ একটি আর তিনটি নিষ্প্রাণ প্রতিরূপ। জীবন্তটি বেগুনী রঙে আবৃত, আর তিনটি ধূলি-কণায় গঠিত, তবে সে ধূলি-কণা শুভ্র শুদ্ধ। এক নীরব শান্তির

মধ্যে থেকে জীবন্তরূপটি অপর কয়েকটির অন্তরে প্রবেশ করে, তাদের নিলিত করে ধরে, তাদের প্রাণবন্ত কর্ম্মবন্ত আশ্রয় রূপে পুনর্গঠিত করে।"

* * *

ভগবান, তুমি ত জান, আমি তোমার অনুগত, আমার সত্তাকে তুমি যা-কিছু দাও তাতেই সে প্রশান্ত ও গভীর আনন্দে অনুরক্ত।

* * *

"তোমার অনুরক্তি আমি জানি, কিন্তু আমি চাই তোমার চেতনাকে বাড়িয়ে ধরতে, সে-জন্য তোমার মধ্যে এখনো যা সুপ্ত তা জাগিয়ে তুলতে। আলোকের দিকে চোখ মেলে চাও, তা হলে মনের স্বচ্ছ মুকুরে প্রতিফলিত হবে যে-জ্ঞান তোমার দরকার"।

* * *

ভগবান, সব আমার সত্তার মধ্যে নীরব হয়েছে, অপেক্ষায় আছে...

* * *

"চেতনার দরজায় আঘাত করো—দরজা খুলে যাবে।"

* * *

নদী বয়ে চলেছে স্বচ্ছ শুভ্র—তার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ নেমে আসছে স্বর্গ থেকে পৃথিবীর দিকে। কিন্তু কি বস্তু আমায় বুঝতে হবে তুমি বলতে চাও?

* *

"তোমার নীরবতা এখনো যথেষ্ট গভীর নয়, তোমার মনে এখনো আছে কিছু যা চঞ্চল...

"অন্তরাত্মার আগুন দেখা দেবে বাহ্য-প্রকাশের আবরণ ভেদ করে—কিন্তু সে-সব আবরণ হবে সুস্পষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট, আলোকিত পর্দ্দার উপর লিখিত বাক্যের মত। এ সবই সুরক্ষিত থাকবে তোমার হৃদয়ের নির্ম্মলতার মধ্যে, তৃণাচ্ছাদিত ভূভাগ নিহিত রক্ষিত থাকে যেমন হিমানীর অন্তরালে।

"এখন যে তুমি ক্ষেত্রে বীজ বপন করছ, পর্দ্দার উপরে লেখা ফুটিয়ে তুলছ, এখন তুমি ফিরে যেতে পার তোমার প্রশান্ত নীরবতার মধ্যে, ফিরে উঠে যেতে পার বিশুদ্ধ নির্জ্জন বাসের মধ্যে, পুনরায় নিজেকে গভীরতর সত্যতর চেতনায় অভিষিক্ত করে তুলতে। নিজের ব্যক্তিত্বকে এখন তুমি ভুলে যেতে পার, সার্ব্বভৌমের মাধুর্য্যকে আবার সাক্ষাৎ করতে পার।

"এই বিরাম-কালে শান্তি যেন নেমে আসে তোমার উপরে, কিন্তু ভুলে যেও না পুনর্জাগরণের ঘণ্টা শীঘ্রই বাজবে।

"তোমার নিয়তি মুখ ফুটে কথা বলছে দেখে প্রফুল্লচিত্তে হাসবে তুমি।

"শক্তি তোমার ফিরে আসছে—তোমার হৃদয় তাকে কাজে ব্যবহার করবে

"তুমি হবে কাঠুরে, ইন্ধনের জন্যে কাঠের আঁটি বাঁধবে বলে।

"তুমি হবে হংসরাজ, পাখা মেলে উড়ে চলবে, তার মুক্তাশুভ্র ছটায় দৃষ্টি সব শুদ্ধ করে দেবে, তার পালকের শ্বেত আভায় হৃদয় সব তপ্ত করে তুলবে।"

"তুমি সকলকেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তাদের পরম সার্থকতার অভিমুখে।

"অগ্নিকুণ্ড দেখেছ, দেখেছ শিশুটিকে—উভয়ে তারা উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট, এক জন জ্বলছে বলে, আর এক জন তপ্ত হয়েছে বলে।

"তোমার হৃদয়ের মধ্যে তুমি দেখছ ত এই সর্ব্বজয়ী অগ্নিকুণ্ড—শুধু তুমিই তাকে ধারণ করতে পার, কোন ধ্বংস কিছু না করতে দিয়ে। অন্য কেউ যদি একে স্পর্শও করে তবে দগ্ধ হয়ে যাবে—তার খুব বেশি কাছে আসতে কাউকে দিও না। শিশুর জানা দরকার, যে-উজ্জ্বল শিখায় আকৃষ্ট সে, তাকে স্পর্শ করতে নাই—দূরে থেকেই তা উত্তাপ দেয়, হৃদয়কে আলোকিত করে—অতি সন্নিকটে এলে হৃদয় ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

"এক জন কেবল ঐ হৃদয়ের মধ্যে নির্ভয়ে বসবাস করতে পারে। কারণ সে হল সেই রশ্মি স্বয়ং যে তাকে প্রজ্বলিত করেছে—সে হল আগুনের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে যে অগ্নিজীবী প্রাণী।

"আর এক জন আছে সবার উপরে, দাহনের কোন আশঙ্কা তার নাই—সে হল সেই নিষ্কলঙ্ক ফিনিক্স-পাখী, স্বর্গ হতে যে এসেছে, সেখানে আবার ফিরে যেতেও যে সক্ষম।

"এক হল সিদ্ধির শক্তি।
আর এক হল দিব্যজ্যোতি।
তৃতীয়টি পরা চেতনা।"

* * *

ভগবান, তোমার কথা আমি শুনছি মানছি, তোমাকে প্রণতি জানাই আবার—দরজা আমার তুমি খুলে দিয়েছ, চক্ষু খুলে ধরেছ—রাত্রির খানিকটা আলোকিত হয়েছে।

মার্চ ৩০, ১৯১৭

নিজেকে নিয়ে আদৌ ব্যস্ত না থাকার মধ্যে আছে একটা সমুচ্চ রাজশ্রী।

অভাব থাকা অর্থ দুর্ব্বলতা জ্ঞাপন; কোন জিনিস আকাঙ্ক্ষা করা প্রমাণ করে তুমি সে জিনিস থেকে বঞ্চিত। কাননা করা অর্থ অশক্ত হওয়া, নিজের সীমা স্বীকার করা, স্বীকার করা সে-সব সীমা অতিক্রম করা অসাধ্য।

অন্য কোন দিক থেকে নয়, দেখা যায় যদি কেবল ন্যায়সঙ্গত আত্ম-মর্য্যাদা, তা হলে আত্মর আভিজাত্যের জন্যেই সকল বাসনা পরিত্যাগ করা উচিত। নিজের জন্য জীবনের কাছে, আর যে পরা-চেতনা তাকে অনুপ্রাণিত করে তার কাছে কিছু যাচঞা করা কতখানি

না আত্মাবমাননা—কতখানি আত্মাবমাননা তা আপনার কাছে, কতখানি অপমানকর অজ্ঞতা সেই পরা-চেতনার কাছে। কারণ, সবই ত আমাদের আয়ত্তের মধ্যে—কেবল আমাদের সত্তার অহং-নির্ম্মিত সীমাবদ্ধ একদিকে আমাদের বঞ্চিত করে রেখেছে সারা বিশ্বের ঠিক ততখানি জাগ্রত উপভোগ্য থেকে, যতখানি বঞ্চিত করেছে আবার আমাদের নিজেদের দেহের এবং সন্নিহিত পরিবেশের তেমনি জাগ্রত উপভোগ থেকে।

আর কর্ম্মের উপায় সম্বন্ধেও আমাদের মনোভাব হবে এই রকমই।

তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান কর, তোমার পরম ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সব চালনা কর; তুমি আমায় বলেছ, এক বছর পূর্ব্বে, সব বন্ধন কেটে ফেলে দিতে, মাথা এগিয়ে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়তে অজ্ঞাতের মধ্যে, সাঁজর যেমন করেছিলেন যখন তিনি কবিকন-নদী পার হলেন এই নয় নিয়ে—হয় "কপিটল"-চূড়া নতুবা "তারপাই" পাহাড়ের তলা।

আমার চোখ তুমি বন্ধ করে দিলে, যাতে কর্ম্মের ফল আমি না দেখতে পাই। তাকে এখনো তুমি গুপ্ত রেখেছ; তবুও তুমি ত জান, ঐশ্বর্য্য হোক আর দৈন্য হোক, দুয়েরই সম্মুখে একই আমার অন্তরাত্মার সমতা।

তোমার ইচ্ছা, ভবিষ্যৎ আমার কাছে থাক অনিশ্চিত, আমি যেন দৃঢ় বিশ্বাসে এগিয়ে চলি, পথ কোন দিকে নিয়ে চলেছে তা না জেনেও।

তোমার ইচ্ছা, আমি যেন আমার ভাগ্য সম্বন্ধে চিন্তাভার সম্পূর্ণরূপে তোমার উপর অর্পণ করি, ব্যক্তিগত সকল ভাবনা যেন সমগ্রভাবে বিসর্জ্জন দিতে পারি।

আমার নিজের মনের কাছেও আমার পথ থাকবে অজ্ঞাত-অলক্ষ্য।

মার্চ্চ ৩১, ১৯১৭

তোমার মুখের শ্বাসে কোথাও কোন হৃদয় যখন দুলে ওঠে, যেন মনে হয় আরো একটু সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করল, আকাশ-বাতাস যেন মধুর সুগন্ধে সুরভিত হয়ে উঠল, সকলি যেন আরো আপন-জন হয়ে উঠল।

কি শক্তি না তোমার, হে সর্ব্বলোকেশ্বর! তোমার আনন্দের একটি কণিকামাত্র এতখানি অন্ধকার এতখানি বেদনা মুছে ফেলতে পারে, তোমার মহিমার একটি রশ্মি একান্ত অসাড় যে পাথরখানি, একান্ত তমোগ্রস্ত যে চেতনা তাকেও উদ্ভাসিত করে ধরতে পারে।

তুমি তোমার এত অনুগ্রহ সব ঢেলে দিয়ে আমায় অভিভূত করেছ, কত রকম গুপ্ত-রহস্যই না আমার কাছে ব্যক্ত করেছ, কত অপ্রত্যাশিত অনপেক্ষিত আনন্দ উপভোগ করতে দিয়েছ—কিন্তু যখন তোমার মুখের শ্বাসে কোথাও কোন হৃদয় দুলে ওঠে, তখন তুমি যে কৃপা আমাকে দেখাও, তার তুলনা তোমার আর কোন করুণাই নয়।

ধন্য সে সব মুহূর্ত্ত, তখন সমস্ত পৃথিবী আনন্দের স্তুতি গেয়ে ওঠে, পুলকে তৃণশস্প রোমাঞ্চিত, বাতাস আলোর তরঙ্গে স্পন্দিত—তরু সব আকাশের দিকে প্রসারিত করে দেয়

তাদের তীব্রতম প্রার্থনা, পাখীর গান হয়ে ওঠে কীর্ত্তন, সাগরের ঢেউ সব প্রেমে সঙ্গীত হয়ে ওঠে, শিশুর মুখে হাসি অনন্তের কাহিনী বলে, মানুষের অন্তরাত্মা তার চোখের পাতায় ভেসে ওঠে।

বল ভগবান, তুমি কি সে অপূর্ব্ব শক্তি আমাকে দেবে না, যাতে উৎসুক হৃদয়ে আমি এই নব-উষার জন্মদান করতে পারি, যাতে সকলের চেতনা তোমার মহান সান্নিধ্যে সজাগ হয়ে উঠতে পারে, যাতে এমন দুঃখী এমন বিপর্য্যস্ত জগতেও তোমার সত্যকার স্বর্গের একটুখানি ফুটিয়ে তুলতে পারি? কোন্ পার্থিব সুখ, সম্পদ, শক্তি এই পরমদানের সমতুল?...

ভগবান, তোমার কাছে কখন বৃথা প্রার্থনা করি নাই; কারণ আমার মধ্যে যে তুমি, সেই ত কথা বলছে তোমারই সঙ্গে...

বিন্দু বিন্দু করে জীবন্ত ধারায় তুমি ঢেলে দিয়েছ তোমার সর্ব্বশক্তিময় প্রেমের প্রাণদায়ী উদ্ধারক অগ্নিশিখা। আমাদের অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতের উপর চিরন্তন জ্যোতির বিন্দুধারা ধীরে ধীরে পড়তে থাকে যখন, তখন মনে হয় নিরালোক আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর বর্ষিত হয় সোনার নক্ষত্র সব একে একে।

আর এই অলৌকিক ঘটনা ঘটছে নিত্যনূতন হয়ে—তার সম্মুখে সকলে নির্ব্বাক ভক্তিভরে আভূমি প্রণত।

যোগের প্রথম পাঠ

শ্রীঅরবিন্দ

প্রশ্ন : আত্মসমর্পণ ব্যতীত সত্তার রূপান্তর কি সম্ভব ?

উত্তর : আত্মসমর্পণ ব্যতিরেকে সমগ্র সত্তার রূপান্তর হতে পারে না।

প্র: : সাধকের সত্যকার আত্মসমর্পণ কখন শুরু হয় ?

উ : তখনি যখন আসে সত্যকার আত্ম-নিবেদন।

প্র : যথার্থ আত্ম-নিবেদন কি ক'রে সম্ভব ?

উ : অহং এবং বাসনা চরিতার্থ না ক'রে। অহং ও বাসনাই আত্ম-সমর্পণের বাধা

প্র : ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের বদ্ধপরিকরতা যে সাধকের জীবনের ওপর বাস্তবিক সক্রিয় হয়েছে, কী লক্ষণ দেখে তা বোঝা যাবে ?

উ : তার দ্বিধাহীন শর্তহীন অনুগত নিরঙ্কুশ অনুবর্তিতা, সকল ভাগবত প্রভাব গ্রহণ এবং অদিব্যের সব-কিছু বর্জন।

প্র : এ-কথা কি সত্যি নয় যে আত্মসমর্পণের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্কল্প থাকা সত্ত্বেও পুরাতন অভ্যাসগুলি এসে তার পূর্ণ সক্রিয় সার্থকতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ?

উ : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—যতক্ষণ নিষ্ঠা, পবিত্রতা ও আত্মসমর্পণ না পূর্ণ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ও-কাজে লিপ্ত থাকে।

প্র : আত্মসমর্পণের ইচ্ছাকে দ্রুত কার্যকরী করবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি ?

উ : চরম নিষ্ঠা।

প্র : কখন ভগবান নিজে সম্পূর্ণরূপে সাধকের হাত থেকে সাধনা গ্রহণ করেন এবং তার হয়ে নিজে তা সাধন ক'রে চলেন ?

উ : যখন সে অহং বিসর্জন দিয়েছে।

প্র : ভগবান সাধনা গ্রহণ করেছেন—এ কথার অর্থ কি ?

উ : তখন ভাগবতী শক্তি এক প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার বলে সমগ্র যোগ এবং সকল তার কর্ম-ধারার বিকাশ করেন—আর সাধকও বুঝতে পেরেছে সেই প্রত্যক্ষ ক্রিয়া।

প্র : ভগবান কারো সাধনা গ্রহণ করেছেন, তা কি ক'রে জানা যায় ?

উ : অনুভব দিয়ে।

প্র গীতার উত্তম রহস্য হ'ল সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে—সর্ব্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য"—ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া। "সর্ব্ব ধর্মান্" বলতে কি বোঝায় ?

উ : মনের রুচি-অরুচি, প্রাণের বাসনা-কামনা ও শরীরের অভ্যাসগত দাসত্বের ওপর ভর ক'রে ওঠে যত ধারণা।

প্র : সাধকের পক্ষে কি সাধনার শুরুতেই সকল 'ধর্ম' পরিত্যাগ করা সম্ভব ?

উ : না, তা সময়সাপেক্ষ—কিন্তু আত্মসমর্পণের ইচ্ছা অবশ্য চাই।

প্র : প্রকৃতির যাবতীয় প্রবৃত্তি ভগবানে নিবেদন করতে গেলে প্রথমে চাই তাদের নিরীক্ষণ করা। এই নিরীক্ষণ-ক্ষমতাকে কি ক'রে সত্যাশ্রয়ী ও সম্পূর্ণ করা যায় ?

উ : সতর্কভাবে তাদের নিরীক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণ ক'রে এবং সেই আত্ম-পর্যবেক্ষণে কোন-কিছুকে না-এড়িয়ে যেতে দিয়ে, আর সেই সঙ্গে এই আস্পৃহা পোষণ করা—আমূক গভীরতর দৃষ্টি।

প্র : সচেষ্ট ও নিশ্চেষ্ট আত্মসমর্পণে প্রভেদ কি ?

উ : সচেষ্ট আত্মসমর্পণ হচ্ছে তোমার ইচ্ছা ভাগবৎ-ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত করা, অদিব্য যা-কিছু সব পরিহার করা, ভাগবত যা-কিছু সব গ্রহণ করা। নিশ্চেষ্ট সমর্পণ হল সব-কিছু ভগবানের উপর একান্তভাবে ছেড়ে দেওয়া—অবশ্য অতি অল্প লোকই সত্যিকারের তা পারে, কারণ কার্যত দেখা যায় যে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের নাম করে লোকে নিম্ন-প্রকৃতির হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে।

প্র : 'সর্বাঙ্গীণ সমর্পণ' নামে যে-ফুল মা মাঝে মাঝে দেন, তার অর্থ কি ?

উ : ব্যক্তি-প্রকৃতির প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি অঙ্গ সমর্পণ।

প্র : এ-কথা কি সত্যি যে যতদিন সাধকের আন্তরিকতা ও আত্মসমর্পণ না পূর্ণ হচ্ছে, ততদিন তাকে বহু কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় ?

উ : যদি সে ঠিক পথটি ধরে চলে তবে কষ্ট না আসতে পারে, তবে বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতেই হবে।

প্র : "মায়ের আলাপ" নামক পুস্তকে মা বলেছেন যে যদি কেন্দ্রীয়-সত্তা সমর্পিত হয়, তবে মূল বিপদই দূর হয়। এই কেন্দ্রীয়-সত্তা কি ? চৈত্য-পুরুষ ?

উ : কেন্দ্রীয়-সত্তা হল 'পুরুষ'। তা যদি সমর্পিত হয়, তবে অন্যান্য সত্তাদেরও

ভগবানের কাছে সমর্পণ করা যায় এবং চৈত্য-পুরুষকে এনে ধরা যায় সম্মুখে।

প্র : এই যে 'পুরুষ'কে আপনি কেন্দ্রীয় সত্তা বলছেন, তার কাজ কি এবং কোথায় তার স্থান ?

উ : 'পুরুষ' হল সেই সচেতন সত্তা যা' প্রকৃতির সকল কর্মের অবলম্বন। তার নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই, তবে কেন্দ্রীয়-সত্তা হিসেবে সে রয়েছে আধারের উর্ধ্বে—সে-ই আধার মানসিক, প্রাণিক, শারীরিক ও চৈত্যিক সত্তার রূপ পরিগ্রহ করে।

প্র : 'পুরুষ'ই কি মানুষের অন্তরাত্মা ?

উ : না, চৈত্য-পুরুষই অন্তরাত্মা।

প্র : ভগবানের কাছে পুরুষের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে কত সময় লাগে ?

উ : কোন নির্দিষ্ট সময় নেই।

প্র : কি ক'রে সত্বর পুরুষকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করা যায় ?

উ : অভীপ্সা ও ভাগবত করুণার সাহায্যে।

প্র মায়ের শক্তি ও কর্মধারা এই পুরুষই কি স্বীকার করে নেয় সত্তার মধ্যে ?

উ : হ্যাঁ।

প্র সকল সত্তা (মানসিক, প্রাণিক, শারীরিক ও চৈত্যিক) কি এই পুরুষেরই অধীন ?

উ : মোটামুটিভাবে সকলের উপরই তার প্রভুত্ব।

প্র : মায়ের করুণা কার্যকরী হতে পুরুষ যদি সম্মতি না দেয়, তবে সে কি অন্যান্য সত্তাদেরও মায়ের রূপান্তরকারী করুণা গ্রহণ বা অনুভব করতে বাধা দেয় ?

উ : না। পুরুষ প্রায়শ নিজে পিছনে সরে গিয়ে তার স্থানে অন্যান্য সত্তাকে অনুভব করতে, সম্মতি জানাতে দেয়।

প্র : সাধক যখন অনুভব করে, মায়ের করুণা তার মধ্যে নেমে আসছে, তা' কি মায়েরই সম্মতির ফল ?

উ : সম্মতি বলতে কি বোঝায় ? মায়ের করুণা তাঁরই ইচ্ছাতে নেমে আসে। তবে পুরুষের আছে সে করুণা গ্রহণ বা বর্জন করার স্বাধীনতা।*

* 'Elements of Yoga' থেকে অনূদিত।

আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা সাধনা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আয়র্লণ্ডের যে স্বাধীনতা-সাধনা আজ সিদ্ধির দুয়ারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে আমরা দেখি আছে তিনটি সোপান। প্রথম হইতেছে ভাবে অর্থাৎ মনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সাধনা। দ্বিতীয় হইতেছে অর্থে অর্থাৎ জীবিকা বা প্রাণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-সাধনা। আর সর্ব্বশেষে হইতেছে শরীর ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাষ্ট্রে স্বাধীনতা-সাধনা। মানসিক, অর্থনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিক মুক্তি এই ক্রম অনুসরণ করিয়া আয়র্লণ্ড চলিয়াছে। প্রথমে ধর্ম্ম, তারপর অর্থ ও কাম, তারপরেই না মোক্ষ?

গোড়ায় চাই মনের মুক্তি—পরের মনের চাপ হইতে আপনার মনকে উদ্ধার করা, বিদেশীর ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া দেশের ধর্ম্মকে জানা ও চেনা। তাই স্বাধীনতা-সাধনার সঙ্কেতেই আয়র্লণ্ড স্থাপন করিল এই মন্ত্র—Sinn Fein অর্থাৎ আমরা আমরাই, আমরা নিজেরা। তাই প্রথমে আসিল কবির, সাহিত্যিকের ভাবুকের যুগ। আয়র্লণ্ডের দৃষ্টি পড়িল তাহার মাতৃভাষার (গেলিক) উপর—সে ভাষা ইংরাজীর দাপটে এক রকম লোপ পাইয়াই বসিয়াছিল। নিজের ভাষা ছাড়া মানুষ মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারে না, মনের কপাট আর কোন উপায়েই খোলে না। পরের ভাষায় ব্যক্ত হয় পরের ভাব, নিজের অন্তরের সত্য নিজের ভাষাতেই রূপ পায়। পরের ভাষায় আমরা যাহা বলি তাহা বুলি মাত্র, তাহা পরের কথার প্রতিধ্বনি; তাহা আমাদের মনের উপর পরের ভাবের মিথ্যা আরোপ, তাই আয়র্লণ্ড নিজের ভাষা দিয়া নিজের কথাকে ব্যক্ত করিতে চাহিল। তাই তাহার কবিকুল A. E., Yeats প্রাণের তাজা ভাবের জন্য চলিল দেশের অতীতের মধ্যে দেশের কথা ও কাহিনী, দেশের সনাতন ধর্ম্ম-কর্ম্মের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে করিতে। আয়র্লণ্ডের মনের কোষ ফুটিয়া উঠিল, সেখানে সে অনুভব করিল নিজের নিজত্ব, সৃষ্টি করিতে লাগিল নিজের সত্যকে—সেখানে উপ্ত হইল স্বাধীনতার বীজ। এই রকমে পুণ্য 'এরিন'-দেশে, সবুজ-দ্বীপে, আমাদের বৈদিক ঋষির কথায় আঁধার কাটিয়া চলিল, উদিল নবীন উষা, আসিল আশা ও সান্ত্বনা, মানুষ পাইল পুনর্জ্জন্ম।

কিন্তু ভাষা ও ভাব হইতেছে হাওয়ার জিনিষ। মনে ও মুখে—বাঙ্‌মনসি—মুক্তির আস্বাদ পাইলেও, এমন কি পূর্ণ মুক্ত হইলেও জীবনে মুক্তির জন্য অন্য সাধনা চাই। জীবিকার জন্য, প্রাণধারণের জন্য, এই দণ্ডোদরের জন্য—বিশেষ ব্যবস্থা চাই। পেটের দায় বড় দায়—এখানে যে স্বাধীন নয়, তাহার মনের স্বাধীনতা পঙ্গু, অথর্ব্ব। দুই একজন সৌভাগ্যবান বা মহাশক্তিমান পুরুষ হয়ত এ দায়কে উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণে, দেশের দশ জনার কাছে অর্থনীতিক স্বাধীনতাই আসল স্বাধীনতা। রাষ্টনীতিক স্বাধীনতা যে তাহারা চাহে বা সেজন্য যে তাহারা আত্মবলি দিয়া চলে, তাহার কারণ ভবিষ্যতের আশা,

এমন একদিনের প্রতীক্ষা যখন অভাবের কষ্টে আর তাহাদিগকে বা তাহাদিগের সন্তান-সন্ততিদিগকে কিষ্ট হইতে হইবে না।

মনের স্বাধীনতা প্রাণের জীবন্ত বস্তু হইয়া উঠে অর্থের স্বাধীনতায়। আয়র্লণ্ড তাই তাহার মনোযোগ দিল দেশের অভাব কিসে দূর হয়, কিসে দেশের ধনাগম হয়। তাহার দৈন্যের দারিদ্র্যের দুইটি কারণ ছিল, (১) বিদেশীর উৎপীড়ন (২) নিজেদের মধ্যে অবিল কলহ। প্রথমে সে দ্বিতীয় কারণটি দূর করিতে বসিয়া গেল। এই দ্বিতীয় কারণ দূর হইলে, প্রথম কারণ আপনা হইতেই দূর হইবে। অর্থনীতিক বিষয়ে গৃহ-কলহ কাহাকে বলি? তাহা হইতেছে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতিযোগিতা, প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে আপনার অভাব মিটাইতে চায়, ধনাহরণের চেষ্টা করে; প্রত্যেককেই তাই প্রত্যেকের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, প্রত্যেকের লক্ষ্য অপর সকলকে কোণঠেসা করিয়া নিজেকে জড়াইয়া তোলা। ফলে দ্বন্দ্বটা দারুণ হইয়া পড়ে, কেহই বড় হইতে পারে না, বেশীর ভাগ লোককেই কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করিয়া চলিতে হয়, অনেককে রোগ মহামারী মৃত্যুর কবলে কবলিত হইতে হয়।

আয়র্লণ্ড তাই তাহার অন্ন-সমস্যা, অর্থ-সমস্যা পূরণ করিতে চেষ্টা করিল সমবায়ের (Co-operative) সূত্র ধরিয়া। কৃষক মজুরকুলকে শিখাইল দল বাঁধিয়া জোট বাঁধিয়া কি রকমে কাজ করিতে হয়। পল্লীসংস্কার আরম্ভ করিল অর্থ-নীতির এই নূতন তন্ত্রের উপর। এই রকমেই গ্রামবাসী, দেশবাসী সকলে একটা বাস্তব স্বাধীনতার আস্বাদন পাইল। এই সমবায়ের শক্তিতেই আয়র্লণ্ডের আর্থিক চেহারা ফিরিতে লাগিল, লোকের আশা আশা সামর্থ্য একটা পাকা ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইল। কবি জর্জ রাসেল, প্লাঙ্কেট (Plunkett) প্রভৃতি এই পথের নেতা, এই সাধনার গুরু।

ইহার পরেই রাষ্ট্র-নীতিতে মুক্তির পথ খোলসা হইল। গ্রিফিৎ, ডি ভ্যালেরার কাজ আরম্ভ হইল। ইহার পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডের রাজনীতিক আন্দোলন আবদ্ধ ছিল জনকতকের মধ্যে, শিক্ষিতের স্বপ্নবিলাসীর, যুবকের মধ্যে। কিন্তু এইবার সারা দেশের লোক রাষ্ট্রীয় নেতাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। সমবায়ের পথে তাহাদের যে পেট ভরিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা নয়, আসিয়াছে একটা সঙ্ঘ-বুদ্ধি একটা একপ্রাণতা, একটা আদর্শনিষ্ঠা, কেন্দ্রে কেন্দ্রে গড়িয়া উঠিয়াছে জাতির জীবন-গতি। আয়র্লণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক অসহযোগই হউক আর সোজাসুজি বিপ্লবই হউক, এই অর্থনীতিক সংগঠনের পরেই তা প্রকৃতপক্ষে ফলপ্রসূ হইতে চলিল।

আমরা এমন বলিতেছি না যে এই তিনটি স্তর কাটাছাঁটা ভাবে একটির পর আর একটি আসিয়াছে, তিনটি কাজই যুগপৎ চলিয়াছে তিনটি ধারায়, এমন কি হয়ত কখন কখন ঝোঁক আসিয়া পড়িয়াছে পরের স্তরের উপরে, কিন্তু তবুও স্বাধীনতার সাধনার ভিতরের সূত্র হইতেছে ঐ তিনটি ক্রমের ধারা।

আমাদের ভারতের রাষ্ট্রনীতিক সাধনার মস্ত অভাব এই যে উহাকে আমরা রাষ্ট্রনীতিক করিয়াই রাখিয়াছি। রাষ্ট্রনীতির পিছনে আগে দরকার যে জাতির শক্তিকেন্দ্র গড়িয়া তোলা আর সেই শক্তিকেন্দ্র গড়িয়া তোলা যে সম্ভব যে নূতন অর্থ-নীতির ভিতর দিয়া এই কথাটির উপর আমরা জোর দিতেছি না, হয়ত বা মুখে মুখে জোর দিতেছি কিন্তু কার্য্যতঃ দিতেছি না। ভাবের মনের স্বাধীনতার সাধনায় আমাদের কবি সাহিত্যিক বক্তা প্রভৃতি অনেক সাহায্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সাধনাকে সরাসরি রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে চাহিতেছি —বাক্যের যে সাধনা শক্তিকে জমাট করিয়া আনে (crystallising power) তাহাকে এড়াইয়া চলিয়াছি।*

* বিজলী—১১ই জৈষ্ঠ, ১৩৩০ সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

অতিমানসকে মনের আওতায় ফেলা যায় কি না—

উত্তর এ আমি আগের থেকেই জানতাম, সেই ৩রা ফেব্রুয়ারির অনুভূতির কথা শোনবার পরে তোমরা এমনি খুঁড়ি খুঁড়ি প্রশ্ন করতে থাকবে, মনের দিকের ভাষাতে তার জবাব দিতে আমায় বাধ্য করবে।

তোমরা চাও যে গভীর অনুভূতির কথাগুলো এমন নতুন রকম কিছু সোজা ভাষাতে আমি ব্যাখ্যা করি যাতে অনায়াসেই তার থেকে নতুনতরো মনের ধারণা গড়ে নিয়ে তোমরা সে সম্বন্ধে জটলা পাকাতে বসে যাও।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমায় বলতে হচ্ছে যে তা হওয়া অসম্ভব। যে অনুভূতি সম্বন্ধে আমি বলেছি তা যদি প্রকৃতই বুঝতে চাও তাহ'লে ঐরকম অতিমানস চেতনা নিয়েই তা বুঝতে হবে।

আগেকার অভ্যস্ত ধারণাসূত্রের বদলে নতুন রকম কোনো ধারণাসূত্র ধরতে যাওয়াতেও কিছু বিপদ আছে। "আগে এক ভাবে বুঝতাম, এখন বোঝবার পক্ষে নতুন রাস্তা মিলে গেছে, এবার যা কিছু বুঝবো তা একেবারে অকাট্য সত্য হবে"—এমন মনোভাবকে শিকড় গড়তে দেওয়া খুব নিরাপদ নয়।

মনের দ্বারা গড়ে নেওয়া কোনো ধারণাই খাঁটি সত্য হয় না, আমি অমন জিনিসকে প্রশ্রয় দিতে মোটেই রাজি নই। সে সময়ে আমি সাধারণ ভাষাতেই কথাগুলো বলতে বাধ্য হয়েছিলাম বটে, কিন্তু যাতে তা নিতান্ত সাধারণ বিবৃতির মতো না হয় তার জন্য যথাসম্ভব ফাঁক রেখে একটু খাপছাড়া ভাবেই বলেছি। তোমরা যত কিছু প্রশ্ন করেছ আর চিঠিতেও যে সব প্রশ্ন করা হয়েছে তার ঐ একটাই জবাব, ও বিষয়ে আর কিছু প্রশ্ন করাই নিরর্থক।

তোমাদের সকলকে আমি একটাই উপদেশ দিচ্ছি "নিজেদের দিক থেকে চেষ্টা করো, খাটো নিজেরাই, খুলে ধরো নিজেদের, নবশক্তির হাতে সমর্পণ ক'রে দাও নিজেদের, তাহ'লে এমন একদিন আসবে যখন তোমরা নিজে নিজেই খাঁটি সত্যকে অনুভূতির মধ্যে পেয়ে যাবে।"

সে অনুভূতি এলে তখন দেখবে যে এই সব প্রশ্ন করা কত নিরর্থক।

* * *

প্রশ্ন সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে—

উত্তর : আমাদের এই যোগে অন্তত কিছু সৌন্দর্যবোধ থাকাই চাই। সেটুকু যদি একেবারে না থাকে, তাহ'লে এত বড়ো জগৎসৃষ্টির একটা আশ্চর্য দিককে একেবারে বাদ দেওয়া হলো।

জগতে সুন্দর তো আছেই, সৌন্দর্যবোধ থাকা আত্মার একটা সম্পদ। এ কথাটা আমি খুবই মানি। সুন্দর দেখে আমি মুগ্ধ হই, তার যথেষ্ট তারিফ করি।

হাঁ, আত্মার সৌন্দর্য মুখের উপরেই প্রকাশ পায়, সে তার ভিতরের মাধুর্য, চেতনার পূর্ণ উপলব্ধির ভিতরে বাহিরে একটা ঐকতান সঙ্গতি। নিজেকে যখন দেবমন্দিরে পরিণত করা হয়েছে, আর ভিতরকার আত্মার মহিমা বাইরের আকৃতিতে ফুটে উঠেছে, তখন তাতেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার অপরূপ সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, পবিত্রতা। যার চেহারাকে বাস্তবিক তেমন সুন্দর বলা যায় না, সেও তখন এক শাশ্বত সৌন্দর্যশ্রীতে পরম রমণীয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমি অনেক মুখেই দেখেছি, তার চেহারা একরকম থেকে মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ উল্টো রকমের হয়ে গেল। যার মুখে দেখা যাচ্ছে সৌন্দর্য, সঙ্গতি, দিব্য মহিমা, তার মনের মধ্যে যখন হঠাৎ কোনো খটকা, অপরাধবোধ, কিংবা হীনতা এসে ঢোকে—তখন তার বাহ্য রূপটা এমন বিকৃত হয়ে যায়, যেন সৌন্দর্যের রেখাগুলি চকিতে কোথায় মিলিয়ে গেল। অথচ সে একই ব্যক্তির একই মুখ। এ পরিবর্তন যেন বিদ্যুৎ চমকের মতো, কিন্তু খুবই সাংঘাতিক। ভিতরে যে পীড়ন চলছে তারই এই গ্লানি—অনেক ধর্মের ভাষাতে যাকে বলেছে "পাপের শাস্তি"—ওতেই মুখের চেহারায় কতটাই যে অদলবদল হয়ে যায়! সুন্দর মুখটাই বীভৎস হয়ে ওঠে। অথচ একই মানুষের সেই একই চেহারা দেখছি।

তখনই দেখতে পাই যে পাপবোধ জিনিসটা কত মারাত্মক, এ কত বড়ো একটা নিখাদ জগতের জিনিস।

*

প্রশ্ন : প্রকৃত অতিমানব সম্বন্ধে—

উত্তর এ বিষয়ে এখন আমরা একটা নিশ্চয়তায় পৌঁছেছি, ইতিমধ্যেই বাস্তব ফল দেখা দিতে শুরু করেছে। মানুষ যে কোনো কোনো অবস্থায় তার সাধারণ সীমাকে ছাড়িয়ে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে, অন্তত এমন কিছু নতুন রকমের চেতনা সে পেতে পারে, যাতে মনের গণ্ডীবদ্ধ অবস্থাকে ছাড়িয়ে তার পক্ষে অতিমানসযুক্ত সত্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত করা সম্ভব হয়, এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এখন নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে সাধারণ মানুষ আর অতিমানস সত্তাদের মাঝামাঝি এক জাতের মানুষ আমরা দেখতে পাবো, যাদের বলা যাবে এক ধরণের অতিমানব ; তাদের মধ্যে মানুষেরই মতো চরিত্র কতক কতক থাকবে, অর্থাৎ পশুপ্রকৃতির দরুন যে সব বাহ্য

লক্ষণ সেগুলি থাকবে, কিন্তু ভিতরকার চেতনা এতটাই বদলে যাবে যে তারা উদ্দেশ্য ও কর্ম-ধারার দিক দিয়ে গিয়ে পড়বে নতুন এক গোষ্ঠির—অতিমানব গোষ্ঠির—রাজ্যে।

সেই নবমানবদের বলা যেতে পারে এক মাঝামাঝি জাতের, কারণ তারা যে সব নতুন জীবের প্রজনন করবে তা হবে নতুন রকম পদ্ধতিতে, পশু জগতের মামুলী পদ্ধতিতে নয়, আর সত্যকার আধ্যাত্মিক পন্থায় জন্মলাভ করার দরুন তাদের থেকে ভবিষ্যতে আরো নতুনরকম জাতির সৃষ্টি হবে, যাদের বলা যাবে অতিমানসের জাতি।

সুতরাং অতিমানব তাদেরই বলা চলে যারা মামুলী প্রজনন-পদ্ধতির সঙ্গে আদিসত্রে সম্বন্ধযুক্ত থাকলেও পরে এতটাই উন্নতি করেছে যে সচেতন থেকে অতিমানস উপলব্ধির জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতে পারছে।

এখন প্রায় নিশ্চয় ক'রেই বলা যায় যে ঐ মাঝামাঝি অবস্থার জগৎটা যে উপাদানে গড়া হচ্ছে তা বর্তমান জগতের সাধারণ মনজাতীয় উপাদানের চেয়ে অনেক বেশি দামী, তা অনেক বেশি শক্তিগর্ভ, দীপ্তিগর্ভ, ঘাতসহ, গুণসমৃদ্ধ, অথচ অতি সূক্ষ্ম ও সর্বাভিসারি, বিশ্বসঙ্গতির সঙ্গে অনায়াসে অভিযুক্ত, সকল রকমের স্পন্দনকেই তা উদারভাবে গ্রহণ করতে পারবে, আর এখনকার সমস্ত ভেদাভেদ তার থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। এমন এক ধরণের সূক্ষ্ম স্পন্দনগ্রাহিতা আছে যাতে বিশ্বের বিরাট সর্বময় স্পন্দনকে স্বাভাবিক বলে সহজে নেওয়া যায়। সেই জিনিসের সাহায্যে ভেদাভেদ ও স্বাতন্ত্র্যবোধ আপনা হতে খসে পড়ে, সেই জিনিসই এখন পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

এ ব্যাপার জাগ্রত অবস্থাতেই টের পেতে পারো, যদি চেতনাকে কেন্দ্রীভূত ক'রে কিছুক্ষণ আত্মসমাহিত হয়ে থাকো, ক্রমাগত কৃত্রিমতা ও নিষ্প্রয়োজন বোঝা বাড়ানো বাহ্য ব্যস্ততাকে থামিয়ে ওর থেকে একটু সরে দাঁড়াও। এই বাহ্য ব্যস্ততা, যাকে নিতান্ত স্বাভাবিক বলে মনে করো, তা যে কতই মিথ্যা, কৃত্রিম, অবাস্তব, তা তখনই তুমি জানতে পারবে, যথার্থ যা সত্য ও বাস্তব তার সঙ্গে এর যে কোনোখানে মিল নেই তা দেখতে পাবে।

সেই বোধটাই ক্রমশ এখন ফুটে উঠছে, স্বাভাবিক হয়ে উঠছে, এমন কি কখনো বা ওর থেকে আগেকার অবস্থায় ফেরা কঠিন হচ্ছে, তা যেন অতীতের কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে—এমন বোধ হচ্ছে যে অতঃপর এ ভাব আর টিকবেই না।

অতএব আমরা ধরে নিতে পারি, পশুর মতো ভাবে জন্মানো দেহের মধ্যে বাস করেও সেই দেহী যখন এমন উচ্চ চেতনাতে অবস্থান করতে পারছে, তাতেই প্রমাণ হচ্ছে যে এ কোনো দৈব ব্যতিক্রম নয়—এ হলো বিশেষ এক অতীষ্টসিদ্ধির পূর্বাভাস। এমন পরিবর্তন সকলের মধ্যে না এলেও অনেকের মধ্যে আসবে, আর নতুন অনুভূতির সঙ্গেসঙ্গেই তারা জানবে যে তারা কেউই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি নয়, সবাই মিলে তারা সমগ্রভাবে এক।

সেই নতুন উপলব্ধি এখন খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে, কারণ প্রথম যখন অতিমানস বস্তু পৃথিবীর আবহাওয়াকে ভেদ ক'রে নেমে এলো, তখন থেকে এই আবহাওয়াকে প্রস্তুত

ক'রে নিয়ে তার পরিবর্তনের কাজ শুরু হতে আমাদের সাধারণ কালের মাপে মাত্র দুটি বছর পার হয়েছে, তার চেয়ে সামান্য কিছু বেশি।

এরই মধ্যে এই। এমনি দ্রুতগতিতে যদি তার কাজ এগিয়ে যেতে থাকে, তাহ'লে শ্রীঅরবিন্দ যে কথা তাঁর একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন সে কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে : "১৯৬৭ সালে অতিমানস চেতনা তার অভীপ্সিত শক্তির বাস্তব অভিব্যক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।"

* * *

প্রশ্ন দেহের মধ্যে বুঝতে পারা—

উত্তর : বিশ্ব বিবর্তনের ক্রমিক পরিণতির হিসাবে যখন অতিমানস জীবনের বিকাশ শুরু হয়ে গেছে, আপাতদৃষ্টিতে দেখা না গেলেও তা যখন অবিসংবাদী তখন ক্রমশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে সেই অতিমানস জীবনকে সত্য বলে মেনে নেওয়া সব চেয়ে কঠিন হচ্ছে বুদ্ধির দিক দিয়ে।

মনের বুদ্ধি দিয়ে অতিমানস জীবনের নাগাল পেলা খুবই কঠিন, চৈত্যের অন্তরাবেগের দিক দিয়ে সেখানে পৌঁছনো অনেক বেশি সহজ—অতিমানস চেতনার কাছে তা দেখা দেবে কতকটা আলো জ্বলে ওঠার মতো, জড়ের ভিতরকার কোনো দিব্য উপস্থিতির জ্যোতি-স্ফুরণের মতো। চরম রকমের বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারাও কোনো অতিমানসের স্পন্দনকে ধরা যায় না, কিন্তু ঐদিক দিয়ে অতিমানস চেতনার মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করা যায়। হয়তো কথার মারপ্যাঁচেই আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। হয়তো অতিমানস বলতেই আমরা ধরে নিই যে তা বুঝি এই মানসিকতারই পরাকাষ্ঠা, সুতরাং মনেরই চূড়ান্ত উৎকর্ষ করতে থাকলে ঐ জিনিস এসে যাবে, কিন্তু তা নয়, সে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। মনোবুদ্ধির তরফের সব চেয়ে উচ্চ, বিশুদ্ধ ও মহৎ ক্রিয়ার দ্বারা যেখানে গিয়ে পৌঁছবে তা হবে এক বিবিক্ত ও শক্তিহীন হিমজ্যোতি, যা একেবারে প্রাণহীন, প্রকৃত অতিমানসের অনুভূতি তার থেকে অনেকখানি দূরে।

মনের চেয়ে নতুন একটা জিনিস এখানে এসে কাজ করছে ও ক্রমশ বিস্তারলাভ করছে,—একটা কবোষ্ণতা, একটা শক্তি, এক তীব্র আনন্দ যার কাছে বুদ্ধির দীপ্তিকে মনে হবে নিরুত্তাপ ও নীরস। তাই ও জিনিস নিয়ে কথা যত কম বলা হয় ততই ভালো। ব্যাখ্যা যতই করো আর যতই শোনো, তার চেয়ে একটি মুহূর্ত, সুগভীর খাঁটি প্রেমের একটিমাত্র ঢেউ, এক মিনিটের জন্য ভগবৎকৃপার সঙ্গে একাত্মতা, এতেই সব-কিছুর চেয়ে লক্ষ্যের দিকে অনেক বেশি এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এমনও বলতে পারি যে সব চেয়ে নিপুণ ব্যাখ্যা যেখানে ব্যর্থ সেখানে একটি সূক্ষ্ম, সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল, গভীর হৃদয়স্পর্শী অনুভূতি ভিতর দুয়ার অনেক সহজে খুলে দেবে সেইরূপ অনুভূতিকে আমরা যদি আরো বাড়িয়ে যেতে থাকি তাহ'লে তার দ্বারা দেহেরও

রূপান্তর এসে যেতে পারবে। কতকগুলি দেহকোষ যখন অন্য কোষগুলির চেয়ে বেশি প্রস্তুত হয়েছে, অর্থাৎ বিশুদ্ধতর গ্রহণীয় ও সূক্ষ্মগ্রাহী হয়েছে, তখন তারাও এক প্রকারে বোধ করতে থাকে ভগবৎ-উপস্থিতি, ভগবৎ-ইচ্ছা, শক্তি ও জ্ঞানের স্পর্শ ; তাদের সেই জানা বুদ্ধির জানার মতো নয়, একেবারে একাত্ম হয়ে জানা ; এমনই যখন তুমি তোমার দেহ-কোষের মধ্যেও বোধ করতে থাকবে, তখনকার সে অনুভূতি এমন জীবন্ত, অনস্বীকার্য, অনির্বচনীয় ও বাস্তব হয়ে উঠবে যে তার তুলনায় অন্যান্য সকল রকমের অনুভূতিকেই অলীক তুচ্ছ স্বপ্নের মতো মনে হতে থাকবে।

এমনিভাবে ভিতর ও বাহির দুই দিক থেকে বৃত্তরেখাটি এসে যখন মিলে যাবে, দুই দিকের দুই প্রান্ত এক জায়গাতে এসে যখন ছোঁয়াছুঁয়ি হবে, সবার উপরের ইচ্ছা যখন সবার নীচেকার জড়ের মধ্যেও বিকাশ পাবে, তখনই তোমার অনুভূতি হবে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত।

এই কারণেই বলা হয় যে দেহের দিক দিয়ে অনুভব করলেই তা হবে সব চেয়ে সেরা সত্যিকার অনুভব।

* *

প্রশ্ন : আগুনের ছেঁকা দিয়ে শেখানো সম্বন্ধে—

উত্তর একটা যদি কোনো ভুল কাজ ক'রে ফেল, হয়তো অজ্ঞতা হেতু, আগের থেকে না জেনে এবং না বুঝে, তাহ'লে যেমনি তুমি তা জানতে পারলে অমনি তোমার অজ্ঞতাও ঘুচে গেল, পরে আর তুমি সে ভুল করতে যাও না, অবশ্য তোমার মনে যদি ভালো মতলব থাকে, —তাহ'লে যে অবস্থাতে তা ঘটেছিল তেমন অবস্থাকেই তুমি এড়িয়ে যাও। কিন্তু ভুল কাজ জেনেও তবু আবার যদি তা করতে থাকো, তার মানে এই হবে যে, তোমার নিজেরই মধ্যে কিছু গলদ আছে, তা জেনেশুনেই তোমাকে দিয়ে সেই অসঙ্গত কাজ করাচ্ছে, অথবা সেই ভাবে ভাবিত করাচ্ছে, কিংবা তোমাকে বিরুদ্ধ শক্তিদের দলে টানছে।

তুমি যদি বিরুদ্ধ শক্তির পক্ষে থাকাই পছন্দ করো কিংবা এতই দুর্বল ও অবাবস্থিত-চিত্ত হও যে তাদের প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান করতে অপারগ হচ্ছ, তাহ'লে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সে অবস্থা বিষম হয়ে ওঠে। তখন বুঝতে হয় যে তোমার নিজের মধ্যে কিছু বিকার আছে, হয়তো কোনো মন্দশক্তি সেখানে স্থায়ী রকমের দখল নিয়েছে, কিংবা তার দিকে তোমার সহানুভূতি আছে। অজ্ঞতাকে শোধরানোর চেয়ে এ জিনিসকে শোধরানো কঠিন।

অজ্ঞতা দূর করা মানেই ভিতরের অন্ধকার দূর করা, তুমি সেখানে একটি আলো জেলে দিলে তাই অন্ধকার ঘুচে গেল। কিন্তু অন্যায় হচ্ছে জেনেও যদি পুনঃপুনঃ তাই করতে থাকো, তার মানে আলো জ্বললেও আবার তাকে নিবিয়ে দিচ্ছ। ইচ্ছা করেই অন্ধকার করছ, দুর্বলতার যুক্তি এখানে অচল।

যারা নিজেদের শোধরাতে চাইবে, ভগবানের কৃপা তাদের সাহায্য করতে সব সময়েই

প্রস্তুত, অতএব এমন কথা তারা বলতে পারে না যে, "আমি বড়ই দুর্বল, নিজেকে শুধরে নেবার ক্ষমতা নেই।" বরং এই বলতে পারে যে শোধরাবার প্রকৃত সংকল্পই তারা করেনি। তাদের সত্তার মধ্যে এমন কোনো অংশ রয়েছে যা কিছুতেই ওতে রাজি হচ্ছে না। এ খুব গুরুতর অবস্থা।

দুর্বলতার যুক্তি একটা অজুহাত মাত্র। শোধরাবার যথার্থ ইচ্ছা যার থাকবে সে অনোঘ ভগবৎ-কৃপার সাহায্য পাবেই।

তাহ'লে সেখানে যা প্রতিবন্ধক দাঁড়াচ্ছে তা দুর্বলতা নয়, তা কপটতা। এই কপটতার সুযোগ নিয়েই বিরুদ্ধ শক্তিরা ভিতরে এসে ঢোকার খোলা দরজা পায়। সেখানে তার বিকৃত অংশের সঙ্গে গুপ্ত সহযোগিতা রয়েছে। এ খুব গুরুতর অবস্থা।

অন্ধতাকে দূর করার সোজা উপায় হলো আলো ফেলে দেওয়া, কিন্তু তাতেও যদি আবার তা দেখা দেয়, তখনকার উপায় হলো আগুনের ছেঁকা।

প্রশ্ন "মনের অকপটতা" এ কথার কি অর্থ?

উত্তর যে মন নিজেকে প্রতারণা করছে না। এর জন্য তার কোনো চেষ্টা করতে হচ্ছে না, অক্লেশে নিজের কাছে খাঁটি থাকছে।

মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গঠনই এমন যে সর্বক্ষণই সে যেন নিজের কাজের একটা কৈফিয়ৎ দিচ্ছে. প্রাণসত্তা ও কামনাসত্তার মধ্যে যা কিছু ঘটছে, মনের স্থূল অংশে ও দেহের সূক্ষ্ম অংশে যা হচ্ছে তার একটা যুক্তিযুক্ত কৈফিয়ৎ সে নিজের মধ্যে হাজির করছে।

সত্তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে এমনি একটা কৈফিয়ৎ তৈরি করার নতো যোগসাজশ আছে, যাতে আমরা নিজেদের কাজকে ন্যায়সঙ্গত বোধ ক'রে নিশ্চিন্ত হতে পারি, যদি কোনো ভুল বা অবাঞ্ছনীয় কাজ ক'রে ফেলি তার জন্য যেন মনে কষ্ট না পাই। যতক্ষণ পর্যন্ত মনকে ভালো ক'রে শিক্ষা দিয়ে তৈরি ক'রে না নিচ্ছ, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তোমার সকল কাজেরই একটা সঙ্গত যুক্তি দেখিয়ে দেবে, যাতে তোমাকে কোনো অস্বস্তি পেতে না হয়। কেবল যখন বাইরের দিক থেকে তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া বা খারাপ ফল বা অন্য কারো কাছ থেকে প্রতিবাদ আসবে, তখনই তার চাপে তোমার মধ্যে সন্দেহ জাগবে, নিজেকে তখন প্রশ্ন করবে যে ওর বদলে অন্যরকম করা উচিত ছিল কিনা।

প্রথমে আপনা হতেই তুমি নিজের কাজের ওজর ঠিক ক'রে রাখো, নিজের দোষকে খণ্ডন ক'রে রাখো। সঙ্গে সঙ্গে তুমি সতর্ক হয়ে যাও, নিজের কাছে প্রমাণ দেখিয়ে দাও যে যা কিছু করেছ তা ঠিক কাজই করেছ, এমন কি অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও, এই হলো জীবনের সাধারণ মনস্তত্ত্ব।

কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় নিজেরই কাছে। ঘটনাচক্রে বাধ্য হলে তবেই তুমি সে কৈফিয়ৎ অন্যকে শোনাতে যাও। কিন্তু তার আগে নিজেকে তুমি এই বলে খুশি করো "অমুকটা হয়েছিল বলেই বাধ্য হয়ে এমন করতে হলো, তা উচিত কাজই করা হয়েছে",—আর দোষটা সর্বদাই চাপাও অন্যের ঘাড়ে কিংবা ঘটনার উপরে। যদি আগের থেকে সমুচিত রকম ভাবতে নিজেকে শিক্ষা দিয়ে না রাখো, তাহ'লে এটুকু বুঝতে অনেক বেগ পেতে হবে যে তুমি যা মনে ভাবছ তা হয়তো ঠিক নয়, উচিত কাজটি করা হয় নি, যেমন প্রতিক্রিয়া আনা উচিত ছিল তা হয় নি,—আর যদিও মনের মধ্যে সে বোধ আসে, তবু তা প্রকাশ্যভাবে মেনে নিতে আরো বেশি বেগ পেতে হবে।

যখন দেখতে পাও যে একটা ভুল কাজ হয়ে গেছে, তখন মন তোমার প্রথমেই তাকে আড়াল দিয়ে পর্দা চাপা দিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, সে পর্দাটি হলো তোমার নিজের তরফের একটি জোরালো কৈফিয়ৎ; আর সে কৈফিয়ৎটি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ করতে রাজি না হও ততক্ষণ তাকে নিজের মধ্যে লুকিয়েই রাখো। একেই বলে কপটতা।

প্রথমত, অভ্যাসবশত নিজেকে তুমি প্রতারিত করছ, তারপর যদিও তার থেকে নিবৃত্ত হও, তবু প্রবৃত্তির দিক থেকে মনের মধ্যে তার কাজ হতে থাকবে, যাতে নিজের তরফে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারো। ভুল করেছি বোঝবার পরেও নিজের কাছে খোলাখুলি বলতে বাধবে যে "হাঁ, আমি ভুলই করেছি"।

এই সকল ব্যাপার নিতান্ত অভ্যাসের টানে এমনই আপনাআপনি হয়ে যায় যে নিজে তুমি তা লক্ষ্যই করো না। কিন্তু যখন সত্তার বিশুদ্ধি আনবার জন্য মনকে শাসনে রাখতে যাও তখনই এই সব আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কৃত হতে থাকে। তখনই সেদিকে নজর পড়ে যে নিত্যই তুমি কতখানি ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রতারণা ক'রে চলেছ; কিছুমাত্র না ভেবে নিজেকে তুমি ঠকাচ্ছ, নিজের কাজগুলির উপর মনোহর কিছু পর্দা চাপা দিয়ে রাখছো যাতে সত্যের চেহারাটা বেরিয়ে না পড়ে, অথচ খুবই সামান্য সামান্য ব্যাপারে, যার গুরুত্ব কিছু নেই। যদি তেমন গুরুতর কিছু হতো যা ধরা পড়ে গেলে জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর হবে—যেমন মনে করো নিজেকে রক্ষা করবার জন্য হঠাৎ বিপদের মুহূর্তে কিছু একটা অনুচিত ক'রে ফেলতে বাধ্য হলে—তাহ'লে সে অন্য কথা; কিন্তু এখানে তেমন কোনো প্রশ্নই নয়, নিতান্ত যা অকিঞ্চিৎ-কর তার সম্বন্ধেই ঐ আচরণ। এখানে বলা দরকার, "হাঁ, আমার ভুল হয়েছে"। কিন্তু নিজের কাছে এটুকু বলার জন্য, অর্থাৎ নিজের মনে অকপট হবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়, অনেক শাসনের দরকার হয়। যারা ধরা দিতে চায় না, ইচ্ছা করেই নির্লজ্জ মিথ্যা বলে, তাদের সম্বন্ধে বলছি না, কারণ তা যে অন্যায় সে কথা প্রত্যেকেই জানে।

এখানে বলছি নিজেরই মনের মধ্যে অকপট হওয়ার কথা,—নিরন্তর চেষ্টা ক'রে যেতে থাকলে তবেই সে জিনিস আসতে পারে।

তোমরা নিজেরাই তো অনেক সময় ধরে ফেল, নয় কি, হঠাৎ যেন টের পেয়ে যাও

যে মাথার মধ্যে কিংবা হৃদয়ের মধ্যে—হৃদয়ে হলে আরো সাংঘাতিক—এমন এক কৈফিয়ৎ এসে জোগালো যা তোমার আচরণের সপক্ষে যত্তান্ত অনুকূল। তখন যদি নিজেকে চেপে ধরো, সামনাসামনি জিজ্ঞাসা করো, "সবই কি ঠিক কাজ করা হয়েছে?" তার পরে এর সঠিক উত্তর পেতে যদি আরো জোরে চাপ দিতে থাকো, তাহ'লে শেষ পর্যন্ত নিজেই স্বীকার করবে: "হাঁ, এখন বুঝতে পারছি, ওটা ঠিক কাজ হয় নি।"

এই মনোভাবটি আনতে কখনো কখনো হয়তো অনেক বছর সময় লাগে। ওর জন্য যথেষ্ট সময়ই দিতে হবে, ধীরে ধীরে নিজেকে যথেষ্ট বদ্‌লে আনতে হবে, ভিতরকার দৃষ্টি-ভঙ্গীটাই বদ্‌লে ফেলতে হবে; ঘটনাগুলিকে দেখতে হবে আলাদা রকমের দৃষ্টিতে, যাতে প্রত্যেক বারেই দেখতে পাও নিজেকে কতখানি প্রতারিত করলে, এমন কি যখন খুব অকপট বোধ হচ্ছে তখনও।

পুরোপরি অকপটতা তখনই আসতে পারে যখন বর্তমান পার্থিব জীবনের মিথ্যার স্তরকে ছাড়িয়ে, এমন কি উচ্চমনকেও ছাড়িয়ে আরো উপরে উঠবে।

উচ্চতর অস্তিত্বের স্তরে উঠে যখন সত্যের জগতে প্রবেশ করবে, তখন সব কিছুকেই দেখবে তার সত্য রূপে, কাজেই তখন তুমি সত্যেরই মধ্যে অবস্থান করবে। তখন সকল মিথ্যা আপনা হতেই খসে পড়বে, কাজেই মিথ্যা আচরণের অভাবে কৈফিয়ৎ দেবারও কিছু থাকবে না।

সকল দিকই তখন পরিষ্কার হয়ে যাবে, ভুল কাজ করবার সম্ভাবনাও ঘুচে যাবে, সকল জিনিসের মধ্যে কেবল সত্যই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

* * *

প্রশ্ন আমরা ভালোর দিকে এগিয়ে যেতে যথেষ্ট চেষ্টা করছি, অথচ তাতে উন্নতির লক্ষণ একটুও দেখছি না, এতে হতাশা এসে পড়ে। তখন কি করা যায়?

উত্তর হতাশা কোনোমতেই আসতে দেবে না, এটাই সব চেয়ে বেশি দরকার। হতাশার তো ফল দেবার শক্তি নেই, এর দ্বারা কখনো কিছু লাভ হয় না। প্রথম কথা এই যে, আগেই নিজেকে এটুকু বুঝিয়ে রাখবে যে উন্নতি কিছু হচ্ছে কি না তা জানবার ক্ষমতা তোমার একেবারেই নেই, কারণ এমন প্রায়ই হয়ে থাকে যে তুমি যখন মনে করছ যে এক জায়গাতেই আট্‌কে রয়েছ তখন তোমার চলছে একটা সুদীর্ঘ প্রস্তুতির অবস্থা—সুদীর্ঘ হলেও তা যে কখনো ফুরোবে না এমন নয়—তার পরেই দেখবে তুমি লাফ দিয়ে এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

কখনো কখনো এমন হয় যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস দিন গুণে যেতে থাকলাম, তার পরে একদিন বেরিয়ে পড়ল ভিতরে যা প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন দেখা গেল ইতি-মধ্যে একসঙ্গে বহু দিক দিয়ে অনেক কিছু বদলেছে।

যোগের সকল কাজেরই এই নিয়ম যে চেষ্টার উৎসাহেই চেষ্টা ক'রে যেতে হবে, তার পক্ষে প্রয়াস ও আত্মপ্রসাদ আনন্দই যেন যথেষ্ট হয়, ফল হওয়ার প্রশ্নটা তার থেকে স্বতন্ত্র। যোগের কাজ যা করছ তা করবার আনন্দেই ক'রে যাচ্ছ, অমুক ফলটা মিলবে এই মনে ক'রে নয়। বস্তুত জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দেখবে যে কাজের ফল হওয়া আমাদের নিজেদের হাতে নেই। তাই সমুচিত মনোভাব এই হওয়া চাই যে তুমি যা করবার তা করবে, চিন্তা করবে, অনুভব করবে, চেষ্টা করবে, সব কিছু করবে স্বচ্ছন্দে, করবারই প্রয়োজনে, অমুক ফল পাবো এই বিশেষ ইচ্ছা নিয়ে নয়।

ফল পাবার কথা ভাবতে গেলেই যেন একটা বেচা-কেনার হিসাব তার মধ্যে এসে পড়ে, সেদিকে নজর থাকলে চেষ্টার একাগ্রতা তাতে নষ্ট হয়ে যায়। উন্নতির দিকে তুমি চেষ্টা করছ মানেই সেদিকে তোমার ঝোঁক এসেছে, সে ঝোঁক তোমার পক্ষে অনিবার্য—চেষ্টাটি নিত্য করতে থাকো ; এ চেষ্টা তুমি নিবেদন ক'রে দিচ্ছ তোমার অন্তরস্থ দিব্য চেতনার কাছে। তার কাছে এ তোমার ব্যক্তিত্বের কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য, সেখানে তার কোনো বাস্তব ফল হচ্ছে কিনা তা অবান্তর। তবে উন্নতি তোমার হবে যখন উপর থেকে তার সময় নির্ধারিত হবে, তুমি তা চেয়েছ বলে নয়।

কোনো বিশেষ উন্নতির যদি কামনা করতে থাকো, যেমন তুমি ইচ্ছা করলে যে আত্ম-কর্তৃত্ব লাভ করবে, নিজের দোষত্রুটি বা দুর্বলতা অপূর্ণতা সংশোধন ক'রে নেবে,—আর অল্পাধিক সময়ের মধ্যেই তোমার চেষ্টার ফল প্রত্যাশা করতে থাকো, তাহ'লে চেষ্টার মধ্যে প্রকৃত আন্তরিকতা রইল না, মূল্য দিয়ে জিনিস কেনার ভাবটি এসে গেল।

তাহ'লে দুটি কথা মনে রাখা চাই ' প্রথমত, কিসের ফল কি হবে তা বিচারের শক্তি আমাদের হাতে নেই। ভগবানে বিশ্বাস রেখে সে বিচারের ভার তাঁর হাতেই ছেড়ে দাও, নিজেকে এই কথা বলো "আমার সমস্তটাই আমি দিয়ে দিলাম, যা আমার সাধ্যের মধ্যে, যতদূর চেষ্টা আর ঐকান্তিকতা আমার পক্ষে সম্ভব, তার পর তিনিই বিচার করুন যে আমাকে কিছু দেবেন কিংবা মোটেই দেবেন না ; এ কাজের কি ফল হবে তা আমি নিজে কিছু জানি না।"

বস্তুত আমরা কিছুই কি জানি, নিজের মধ্যে স্পষ্ট রূপান্তর না আসা পর্যন্ত নিশ্চয় ক'রে কি জানতে পারি যে কোন পথে কোন দিক দিয়ে আমার মধ্যে কেমন রূপান্তর আসবে ? জানতে কিছুই পারি না, ধারণা করি মাত্র ; আর সে ধারণা প্রায়ই হয় সীমাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ ; যে ফল ফলতে পারে তাকে দেখি অনেক ছোটো ক'রে, ভাসা ভাসা ও আপেক্ষিক ভাবে। কি ফল হতে পারে বা হওয়া উচিত তা এখন জানবার কথাই নয়, জানবার কথা পরে। যখন তা উপস্থিত হবে, অর্থাৎ তোমার মধ্যে একটা স্পষ্ট পরিবর্তন আসবে, তখনই তুমি পিছনের দিকে ফিরে চেয়ে বলতে পারবে, "ও, এরই জন্য আমি এতদিন চেষ্টা করছিলাম,"—কিন্তু সেকথা তো আগে জানার নয়, পরেই জানার। তার আগে অনির্দিষ্ট রকমের কল্পনা করা

ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারেনা, প্রকৃত পক্ষে যে উন্নতি ও রূপান্তর আসে তার তুলনায় সেগুলি হয় খুবই তুচ্ছ ছেলেমানুষি ধারণা।

তাহ'লে, প্রথমে থাকবে শুধু আশা, তার ফল কি হবে কিছুই না জেনে। সে কথা জানবে কেবল উপরওয়ালা। দ্বিতীয়ত, তাঁকে যদি এমনকথা বলতে যাই : "আমার সমস্ত প্রয়াস আমি ঢেলে দিচ্ছি, কিন্তু তার বদলে উন্নতি কিছু হওয়াই চাই, নইলে এতখানি কষ্ট করতে যাচ্ছি কেন,"—তাহ'লে সেটা হয়ে দাঁড়াল পাটোয়ারি লেনদেনের কথা। বুঝতে পারলে তো?

প্রকৃত দান আছে কেবল সেই কাজেরই যা তুমি আপনা হতে করবে, একমাত্র করণীয় বলেই করবে, পরিণামে নির্লোভ মনে নিবেদনের ভাব নিয়ে করবে।

* *

প্রশ্ন : আমাদের মনের দ্বারা কি অন্য মানুষের আত্মাকে জানা যায়?

উত্তর : মুখে যেমন বলা যায়, বাস্তবে তেমন ছুরি দিয়ে বরফি কাটার মতো আলাদা আলাদা ভাগ করা থাকে না—তাই প্রচুর শিক্ষা ও পর্যবেক্ষণশক্তি না থাকলে সত্তার বিভিন্ন অংশগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে স্পষ্ট ক'রে দেখা এবং জানা খুবই কঠিন হয়। আত্মা আর মন, এমন কি দেহ আর প্রাণের মধ্যেও এমন কোনো দেয়াল দেওয়া পার্থক্য নেই। আত্মার সঙ্গে মন থাকে মেশামেশি হয়ে; কোনো কোনো মানুষের বেলা তা খুবই স্পষ্ট। মনের যে অংশ সূক্ষ্মভাবে চৈত্যের সঙ্গে মিলেছে তারই দ্বারা তারা অন্যের আত্মাকে জানে।

এ ক্ষমতা যাদের কিছু আছে তারা অন্যের চেতনার মধ্যে প্রবেশ ক'রে সরাসরি দেখতে পায়, সে ব্যক্তি পাঁচজনের আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে কোনরকম কথা ভাবছে, তার মনের মধ্যে কি কি কাজ হচ্ছে,—আর যারা মুখে কথা না বলেও তাদের বক্তব্য জানাবার ক্ষমতা রাখে তারা স্পষ্ট বুঝতে পারে যে কার আত্মা জাগ্রত আর কার আত্মা নিদ্রিত, দুই রকমের মধ্যে তফাৎটা তারা ধরে ফেলতে পারে। আত্মা সজাগ থাকলে তার মনের ক্রিয়াতে এক রকমের রং লাগে; সে মন হয় হাল্কা, সূক্ষ্মবোধী, অধিকতর দীপ্তিযুক্ত, দেখলেই তাকে জানতে পারা যায়। যেমন, কেউ কেউ অপরের চোখের দিকে চেয়েই বলে দিতে পারে যে তার আত্মা জীবন্ত, কিংবা আত্মার কোনো লক্ষণই তার মধ্যে নেই। এমন দৃষ্টি অনেকেরই আছে। তাদের মধ্যে অনেকখানি বিবর্তন ঘটেছে—এ কথা বলা যায়।

অবশ্য কার আত্মা কতখানি জেগেছে বা সক্রিয় হয়েছে, সত্তার উপরে সে কতটা দখল নিয়েছে, সে কথা জানতে হলে তার জন্য চৈত্য চেতনা প্রকট থাকা দরকার, সেই চেতনার দ্বারাই তা নিরূপিত হতে পারে। কিন্তু তা ছাড়াও অন্য ভাবে এমন আভ্যন্তরীণ সাড়া মিলে যাওয়া অসম্ভব নয়, যার থেকে তুমি বলতে পারো, "হ্যাঁ, এ লোকটির আত্মা সজাগ আছে।"

কিন্তু এখানে কথা এই যে সাধারণ লোকে প্রায়ই যাকে "আত্মা" বলে, তা হলো প্রাণ-চাঞ্চল্য। এমন সব ব্যক্তি যাদের প্রাণশক্তি দেহের ক্রিয়াকে ছাপিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে ও প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে ও সকল কিছুর সঙ্গেই যারা প্রাণের দিক থেকে তীব্র যোগাযোগ ও তার প্রতিক্রিয়া এনে ফেলে, কারো বা শিল্প সম্বন্ধে সকল রকম সৌন্দর্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে খুব উন্নত রুচি দেখা যাচ্ছে, এদের দেখলেই তোমার মনে নিশ্চিত প্রতীতি আসবে যে এ লোকটির আত্মা জীবন্ত; কিন্তু তা আত্মাই নয়, তার প্রাণসত্তাই দেহকে ঐভাবে ছাপিয়ে উঠছে। যারা সবেমাত্র বিকাশ পেতে শুরু করেছে, আর যারা এখনও জড়জীবনের তমসের মধ্যে ডুবে আছে, তাদের মধ্যে ওটাই হলো প্রথম প্রভেদের লক্ষণ। বিকাশের কাজ শুরু হলেই আগে তা চেহারায় ও আচরণে ফুটে ওঠে, সেই সব মানুষের মধ্যে এমন বেগবান স্পন্দন দেখা দেয় যাতে মনে হয় এর আত্মাই বুঝি জেগেছে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, প্রাণসত্তাই সেখানে ঐরূপ ভাবে বিকাশ পাচ্ছে; মুদ্রিত প্রাণসত্তাযুক্ত ব্যক্তিদের থেকে এদের একটা আলাদা বিশেষত্ব দেখা দেয়, তাতেই দেহের জড়তার চেয়ে প্রাণের শক্তি বড়ো হয়ে উঠে তার স্পন্দন ও ক্রিয়াকে অতিরিক্তভাবে প্রকট করে। এইরূপ প্রাণতৎপরতাকে আত্মার বিকাশ বলে প্রায়ই ভুল করা হয়। বস্তুত আমাদের সাধারণ চেতনার কাছে আত্মার স্পন্দনের চেয়ে প্রাণের স্পন্দনই বেশি স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

অভ্যন্তরস্থ আত্মাকে লক্ষ্য করতে সাধারণত মনকে যথেষ্ট স্থির ও প্রশান্ত করা দরকার, কারণ মন চঞ্চল থাকলে কেবল সে মনেরই স্পন্দন দেখবে, আত্মার স্পন্দন তার কাছে লক্ষিত হবে না।

যে ব্যক্তি তার আত্মাকে জেনে আত্মার মধ্যেই বাস করছে, তার চোখের দিকে চাইলে তোমার মনে হবে যে তুমি তার ভিতরের দিকে নেবে যাচ্ছ, ক্রমশ নামতে নামতে দূরে বহু-দূরে কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু অন্য লোকের বেলাতে তাদের চোখের দিকে চেয়ে সাধারণত দেখবে যে একটু দূর যেতে না যেতেই এমন জায়গাতে গিয়ে থামলে যেখানে বেশ কিছু স্পন্দন হচ্ছে, তোমার দৃষ্টির জবাব মিলছে, কিন্তু সেখানে গুহার মধ্যে তলিয়ে অনেক দূর নেমে যাবার মতো কোনো বোধ নেই —যেমন ওর বেলাতে হয় অনেক দূর নেবে গিয়ে হয়তো অতি মৃদু অতি প্রশান্ত কিছু সাড়া মিলল। অন্যথা তোমার দৃষ্টি প্রায়ই খানিকদূর পর্যন্ত ঢুকে যায়—সকলের চোখের পক্ষে নয়, কারণ কোনো কোনো চোখের দরজা আঁটা, তার মধ্যে ঢোকাই যায় না—কিন্তু অনেকেরই মধ্যে খোলা রাস্তা পেয়ে তুমি ঢুকে যেতে পারো, তার পর কিন্তু কিছু দূর যেতেই দেখতে পাও একটা স্পন্দন, কখনো বা জ্বলে উঠছে, কখনো বা ঝিকমিক করছে। তাই দেখেই তোমার মনে হয়, "এই তো দেখছি, এর জীবন্ত আত্মা," অথচ তা ঠিক নয়, সে হলো তার জীবন্ত প্রাণেরই স্পন্দন।

আত্মার সন্ধান পেতে হলে দ্রষ্টব্যের উপরতল থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে নিতে হবে, তার পরে ক্রমশ ভিতরের দিকে আরো ঢুকতে ঢুকতে নেবে যাবে অন্তস্তলের গভীরতম কূপের

মধ্যে, যেখানে সব কিছুই স্থির ও স্তব্ধ, সেখানে এমন কিছু রয়েছে যা নিস্তরঙ্গ কিন্তু উষ্ণ, চাঞ্চল্যের কোনো স্পন্দন নেই কিন্তু নিখর শান্তিতে ছাপাছাপি, সবটাই মাধুর্যে ভরা—সেই হলো আত্মা।

যদি নিজে সচেতন থেকে তুমি সেদিকে যাতো চেয়ে থাকো, তবে তার প্রাচুর্য দেখে তোমার মনে হবে যে সেখানে রয়েছে এক অতলস্পর্শ পূর্ণতা। তার মধ্যে যদি নেমে যেতে পারো তাহ'লে অনেক গোপন খবর তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে, স্থির জলে শাশ্বতের প্রতিফলিত ছবি দেখতে পাওয়ার মতো। তোমার কাছে কালের গণ্ডী তখন হারিয়ে যাবে।

নিজেরও তোমার বোধ হতে থাকবে যে তুমিও শাশ্বত, চিরকালই ছিলে এবং চিরকালই রয়েছ।

এমন ভাবটি আসবে যখন আত্মার কেন্দ্রকে তুমি স্পর্শ করবে।

চেতন অবস্থাতে যদি আত্মার সঙ্গে পুরো সংস্পর্শ নেলে, তাহ'লে তাতে বাহ্য আকৃতির সীমাবদ্ধ গণ্ডীর অধীনতা থেকে মুক্তিলাভ হয়, দেহ আছে বলেই তুমি আছো এ বোধটি আর থাকে না। নিজেদের সত্তা সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে আমাদের দেহের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ, তাই যখনই ভাবো "আমি" তখনই প্রকৃতপক্ষে ভেবে নাও "দেহ আমি"। তোমার ব্যক্তিত্বের যে বাস্তবতা তা হলো দেহেরই বাস্তবতা। কেবল যখন তুমি আভ্যন্তরীণ বিকাশের দিকে সচেষ্ট হয়ে আপন সত্তার মধ্যে এমন কিছু দেখতে পাও যা স্থায়ী ধরনের, তখনই প্রথম বোধ আসে যে সেটি তোমার স্থায়ী চেতনা, যা যুগের পর যুগ ও পরিবর্তনের পর পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে, এবং এই জিনিসটাই আসল "আমি"; কিন্তু এ বোধ আসবার জন্য প্রচুর চিন্তা ধ্যানের দরকার। নতুবা তুমি যখন ভাবো "এই কাজটি আমায় করতে হবে, এটি আমার পক্ষে দরকারী", তা হলো প্রকৃতপক্ষে তোমার দেহের বক্তব্য, তার সে ইচ্ছাটি জেগেছে নানারূপ সংবেদন ও তার আবেগজনিত প্রতিক্রিয়া থেকে, জটিল হতে জটিলতর নানা উদ্বেগজনিত চিন্তার ফলে; সবশুদ্ধ মিলিয়ে মিশিয়ে তার থেকে জাগে একটা ঝোঁক, একটা আকর্ষণ, একটা ইচ্ছা; তখনকার মতো সেই ভাবটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে "আমি", সব কিছুকে ছেড়ে সরাসরি "আমি" নয়, কারণ মাথা, ধড়, হাত, পা, যে সব অংশ নড়াচড়া করছে তাকে বাদ দিয়ে "আমি"কে ভাবাই যায় না সব কিছু একসঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা।

কেবল যখন তুমি এই নিয়ে অনেক ভেবে দেখবে, মন লাগিয়ে যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ করবে, তার পরেই তোমার ধারণা আসতে শুরু হবে যে এ-জিনিস ওগুলির উপর নির্ভর করছে না, এই যে চেতনা অন্তরালে রয়েছে এ ইচ্ছা করলে দেহকে নড়াতে কিংবা না-নড়াতেও পারে, দেহের অনুভব প্রভৃতির সঙ্গে এটি একাত্ম না হয়ে আলাদা থাকতেও পারে, সব থেকে সরে উপরে ভাসতেও পারে। কিন্তু এ বোধ আসার আগে যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ দরকার।

অতঃপর ওতে আরো লেগে থাকলে তখন দ্বিতীয় রকম বোধ আসবে, তখন দেখবে যে তোমার সক্রিয় ইচ্ছাও অন্য কারো দ্বারা চালিত হচ্ছে, সেই দেখছে, সেই বিচার ও মীমাংসা করছে, মীমাংসাকে সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে : এ-বোধ আসে অনেক পরে। আবার আরো পরে দেখবে যে কেবল ইচ্ছাকেই নয়, কিন্তু সমস্ত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, অনুভব ও বোধের উপর তার প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে, শেষ পর্যন্ত সত্তার সেই সব কিছু বিষয় দেখছে এবং করছে এবং সিদ্ধান্ত করছে, সত্তার সমস্ত কাজ চলেছে তারই নির্দেশে। মূল পরিচালক রয়েছে সেখানেই।

এর থেকে তুমি সূত্র পেয়ে যাবে, তখন ক্রমশ জানবে যে মূল কর্তৃত্বশক্তি রয়েছে সেই গোড়াতে।

আত্মদর্শন করা এইভাবে শিখতে হয়।

* * *

প্রশ্ন : একটা অনুভূতি আসবার পরেও কেন এবং কোন প্রকারে মনের ক্রিয়া তাকে বানচাল ক'রে দেয়, চেতনায় গিয়ে তার কাজ হওয়া অনেকটা নষ্ট ক'রে দেয়?

উত্তর যেমন মনে করো, তুমি কোনো একটি মন্দ অভ্যাসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে, ভগবৎ-কৃপার দিক থেকে তার জন্য শক্তিও এসে গেল, সেই শক্তি তোমার চেতনাতে কাজ করতে শুরু করলে। কিন্তু তখন যদি তুমি তাকে নিয়ে টানাটানি করো, নিজের মনের মতো গঠন দিতে চাও, তাহ'লে তুমি নিজেই তাকে কেন্দ্রচ্যুত ক'রে বানচাল ক'রে দেবে।

শুধু তাই নয় : সেই অনুভূতির কথাটি যখনই তুমি অন্য কাউকে শোনাতে যাবে, তখনই তার দিক থেকে একটা কিছু এসে ঢুকে পড়ার রাস্তা খুলে দেবে ; একটা কিছু আদান-প্রদান তখন হবেই। তার তরফের ঔৎসুক্য আছে, অজ্ঞানতা আছে, ভালো ইচ্ছার সঙ্গে এমন ক মন্দ ইচ্ছাও আছে, সেগুলি এসে তোমার জিনিসটিকে ভেঙেচুরে অন্যরকম ক'রে দেবে।

কিন্তু তুমি যদি সেই অনুভূতির কথা নিজের গুরুর কাছে বলো, আর তিনি তা শুনতেও চান, তাহ'লে তিনি তার সমুচিত সাফল্য আনতে আপন শক্তি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আরো যোগ করবেন, তাতে তোমার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্যই মিলবে।

এখানেও ভাষায় প্রকাশ করায় যে ক্ষতি তা থাকেই। থাকে, তবে গুরু তা শুধরে দেন।

*

প্রশ্ন: চিন্তার শক্তি সম্বন্ধে—

উত্তর : চিন্তাকে প্রকাশ করার পক্ষে বাক্য খুবই উপযুক্ত, এবং তা কাজেরও হতে

পারে, যদি সে বাক্য বিশেষ অনুকূল হয়ে বক্তব্য বিষয়টিকে তোমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারে, নতুবা বাক্যের এমনি কোনো দাম নেই।

আদর্শ অবস্থাটি অনেকে ঠিক বুঝে নিয়েছেন—তা হলো মূল ভাবটিকে সঞ্চারিত ক'রে দেওয়া, এমন কি ভাবের চেয়েও যা বড়ো জিনিস অর্থাৎ আসল চেতনাটিকে, জ্ঞানটিকে, অনুভবটিকে উপযুক্ত চেতনাস্পন্দনের দ্বারা অন্যের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া। যখন তুমি কোনো কিছু চিন্তা করো তখন তোমার চেতনার মধ্যে তা আকার নিয়ে মনের মধ্যে তারই উপযোগী একটা স্পন্দন জাগায়, আর অন্য কোনো লোকের মস্তিষ্ক তার সুরে বাঁধা থাকলে সেগুলি তার মধ্যে গিয়েও অনুরূপ স্পন্দন জাগাতে পারে।

বাক্যের কাজ এই যে তা উচ্চারিত হয়ে অন্যের চেতনা বা চেতনাকেন্দ্রকে সেদিকে কেবল আকর্ষণই করতে পারে, তখন সেদিকে মনোযোগ গেলে কেন্দ্র তার স্পন্দনগুলিকে গ্রহণ করে; কিন্তু মনোযোগের যদি অভাব হয়, চেতনা যদি নীরব থেকে তাকে নিতে অপারগ হয়, তাহ'লে বাক্যের দ্বারা যতই লম্বা লম্বা ব্যাখ্যা ক'রে যেতে থাকো, একবর্ণও তাকে বোঝাতে পারবে না। অন্যত্র এমনও হয় যে মস্তিষ্ক যার সক্রিয়ভাবে স্পন্দন ছড়তে পারে তার সে মস্তিষ্ক সুস্পষ্ট রকমের স্পন্দনকে ধরে নিতেও পারে, কিন্তু ওর বদলে যখন আসে মিশ্রিত রকমের ঘোলাটে জিনিস, যা ধোঁয়া ধোঁয়া রকমের অবোধ্য ও অস্পষ্ট, তার দ্বারা কোনো ভাবরূপ জন্মায় না। অথচ বাক্য যথেষ্টই বলা হচ্ছে, তুমি কান দিয়ে শব্দগুলি শুনেও যাচ্ছ, কিন্তু তাতে কোনো ফলই হচ্ছে না—কারণ এখানে তো শব্দ শোনার প্রশ্ন নয়, দরকার হলো স্পন্দনের সুনির্দিষ্টতা।

তোমার চিন্তাকে যদি তুমি বাক্যের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ফোটাতে পারো, তোমার চেতনা থেকে যদি তা জীবন্তরূপে নির্গত হয়ে অন্য চেতনাতে গিয়ে পৌঁছয়, বক্তব্যের দৃঢ়তায় তোমার চিন্তা সুস্পষ্ট হয়ে সেখানে পৌঁছে তারই অনুরূপ স্পন্দন তুলবে, সে স্পন্দন সেখানেও অনুরূপ ভাবকে জাগিয়ে তুলবে, তবেই তোমার বক্তব্য তার কাছে বোধগম্য হবে। কিন্তু তোমার ভিতর থেকে যা বেরিয়ে আসছে তা যদি পেঁজা তুলোর মতো এলোমেলো হয়, কি বলতে চাইছ তা নিজেই ভালো ক'রে জানো না, বলবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বুঝতে চেষ্টা করছ, শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষিত হয়নি কিংবা সে অন্যমনস্ক হয়ে অন্য কিছু ভাবছে, তাহ'লে ঘন্টার পর ঘন্টা বকলেও তা বৃথা হবে, আদৌ বোধগম্যই হবে না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই হয়ে থাকে। তুমি যদি কখনো দেখতে চাও যে তোমার কিছু বলার ফল অন্যের চেতনাতে গিয়ে কেমন দাঁড়িয়েছে, তাহ'লে প্রায়ই দেখতে পাবে যে অসমতল আয়নাতে মানুষের স্বাভাবিক চেহারাকে যেমন বিকৃত দেখায়, তোমার বক্তব্য বিষয় সেখানে তেমনি আকার নিয়েছে। তেমন ধরনের অসমতল আয়নাতে নিজের চেহারা কখনো কি দেখনি? কোনোটাতে তোমার চেহারা দেখাবে অস্বাভাবিক লম্বা, কোনোটাতে অস্বাভাবিক চওড়া, কোথাও অত্যন্ত মোটা, নিতান্তই হাস্যকর; এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়; তুমি দেখবে, যা

কিছু তুমি বলেছিলে তা অন্যের চেতনাতে অমনি হাসাকর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অথচ তোমার ধারণা ছিল যে তুমি সঠিকভাবে বোঝাতে পেরেছ, তোমার কথাগুলো তার কানে ঠিকই পৌঁছে দিয়েছ, কিন্তু ভিতরে ভাবটি পৌঁছে দিতে পারনি।

অন্যের মনের উপর তোমার বক্তব্যের সাফল্য যদি আনতে চাও, তাহ'লে আগে নিজে স্পষ্ট ক'রে ভাবতে শিখতে হবে—তা বাক্যের উপর নির্ভরশীল নয়, তা হবে বাক্যরিক্ত চিন্তা, বাক্যের সাহায্য না নিয়েও তা তোমার কাছে সুস্পষ্ট, একটি সত্যের মতো, চেতনার সত্য অথবা জ্ঞানের সত্য। বাক্য বাদ দিয়ে ভাবতে চেষ্টা ক'রে দেখ, তাহ'লেই বুঝতে পারবে।

অপরকে যা বোঝাতে চাইছ তা নিজে আগে পরিষ্কার ক'রে বুঝে নিলে। অন্তরে তা এক নির্দিষ্ট রকমের স্পন্দন তুলবে, মনের মধ্যে তা একটা বিশেষ আকার নেবে, তার পরে মনের অভ্যাসকে অনুসরণ ক'রে নীচের ভাণ্ডার থেকে কতকগুলি উপযোগী বাক্য টেনে এনে তাই দিয়ে তাকে সাজাবে, যাতে সেই চেতনা-স্পন্দন গ্রথিত বাক্যের আকৃতি নেয়, যদিও সে আকৃতি গৌণ। যেন তোমার চিন্তাধারাকে বাইরে দেখাবার মতো পোষাক পরানো।

চিন্তাশক্তির কেবল স্পন্দনের জোরেই নিজেকে অপরের বোধ্য করতে পারার গুণ আছে, আগে যাকে বলা হতো ভাষানুগর চিন্তা, তার দৃষ্টান্তও মিলতে পারে। এ জিনিস আগেও করা যেতো, এখনও করা যায়। বাক্যের দিকটা একেবারে বাদ দিয়ে তুমি কোনো একটা বিষয়ে চিন্তা করো, সেই চিন্তাকে সুনির্দিষ্ট একটা অন্তর্দৃষ্টিতে পরিণত করো, স্পন্দনের সাহায্যে তাকে বাইরে প্রক্ষেপ করার শক্তি অর্জন করো, তার পর এমন কতকগুলি মানুষের (তারা সংখ্যায় বেশিই হোক বা কমই হোক) সামনে গিয়ে দাঁড়াও যারা বিভিন্ন রকমের ভাষা-ভাষী, তারা আপন আপন স্বতন্ত্র ভাষায় চিন্তা করতে অভ্যস্ত অর্থাৎ যে যেমন শিক্ষা পেয়েছে, —তাদেরই কাছে তোমার সেই চেতনা বা অনুভূতি বা অন্তর্দৃষ্টিকে স্পন্দনের সাহায্যে প্রক্ষেপ করতে থাকো। অবশ্য তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তুমি সেখানে একটা কোনো ভাষা ব্যবহার করবে, যে ভাষাতে নিজে তুমি অভ্যস্ত, কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমার অন্তর্দৃষ্টি ও তার সঞ্চারণ সেখানে এমনই জোরালো হবে যে তা সরাসরি তাদের মস্তিষ্ক বা হৃদয়ের মধ্যে পৌঁছে যাবে, তাদের মাথার মধ্যে আপন আপন ভাষাতে তা আপনা হতেই তর্জমা হয়ে যাবে। তুমি হয়তো ইংরেজীতে বা ফরাসীতে বললে, কিন্তু তারা বুঝবে তাদের নিজের ভাষাতে। এ-কথা অলৌকিক মনে হতে পারে, কিন্তু বস্তুত তা নয়; এটা অনায়াসেই বোঝা যায়, চিন্তার বাসমহলে ঢুকতে পারলে দেখবে এ প্রায় মৌলিক জিনিস। এখানে আমি অতিমানসের কথা টেনে আনছি না, এ খাঁটি চিন্তারাজ্যেরই ব্যাপার, যদি তেমন ভাবে তুমি চিন্তার কাজ শুরু করো।

আর তোমার শ্রোতারাও যদি ঐভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত থাকে, তাহ'লে এ কাজ আপনা হতেই হবে, কিন্তু কম লোকেই তেমনভাবে চিন্তা করে। কিন্তু এ শক্তি অর্জন করলে

অনুভূতির পক্ষে অনেক স্থূল বাধা আপনি ঘুচে যায়। সে শক্তি যত বাড়ে তত উচ্চতর বোধ-শক্তি আসে, তখন অনায়াসে বক্তার ভাষা শ্রোতার আপন ভাষাতে রূপ নেয়। তখন এই ধরনের প্রত্যেক শ্রোতাই নিজের আন্তরিক অনুভূতিতে বলে "উনি তো এই ভাষাতেই বললেন"। আবার তৃতীয় শ্রোতা বলে : "তা কেন, উনি এই ভাষায় বললেন।" মিথ্যা কেউ বলছেই না, অথচ বক্তা ওদের কারো ভাষায় বলেনি, সে বলেছে তার সাধারণ ভাষায়। তবু এই জিনিসই হয়, স্পন্দনগুলি উপরের দিকে উঠে গিয়ে রেডিওর স্পন্দনের মতো প্রত্যেকের মর্মে গিয়ে নামে।

*

প্রশ্ন ধম্মপদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে—

উত্তর : ধম্মপদের মধ্যে রয়েছে চারটি সত্য আর আটটি মার্গ, এগুলিকে অনুসরণ করলে সর্বপ্রকার দুঃখ নিবারিত হবে।

শ্রেষ্ঠ সত্য চারটি হলো

(১) জীবন দুঃখময়, অর্থাৎ সাধারণ অজ্ঞানময় অনিত্য জীবন দুঃখের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। দুঃখ দেহের, দুঃখ মনের।

(২) দুঃখের উৎপত্তি কামনাতে, যা আসে স্বাতন্ত্র্যচেতা প্রকৃতির অজ্ঞতা থেকে।

(৩) এই দুঃখকে এড়িয়ে যাবার উপায় আছে।

(৪) অষ্টাঙ্গ মার্গ অনুসরণ করলে অজ্ঞতা ঘুচে গিয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান আসবে, তাতেই দুঃখ দূর হবে। চতুর্থ সত্য এই অষ্টাঙ্গ মার্গের মধ্যে নিহিত।

সেই অষ্টাঙ্গ শ্রেষ্ঠ মার্গে আটরকম শিক্ষার অঙ্গ বা বিভাগ রয়েছে—

(১) সম্যক দৃষ্টি। সব কিছুকে সত্য দৃষ্টিতে নির্ভুল ও নির্মল সর্বোত্তম দৃষ্টিতে দেখতে শেখা।

ধম্মপদে বলা হয়েছে যে অস্তিত্বের তিন অবস্থা (ক) দুঃখবোধ, (খ) নশ্বরতা, (গ) দৃঢ়মূল অহংয়ের লোপ। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়, ওকে অস্থায়ী ব্যক্তিত্বই বলা উচিত, যার মনস্তাত্ত্বিক গঠন স্থায়ী ও একভাবের নয়, একই ব্যক্তিচেতনা ধারাবাহিক হয়ে আসছে না ; তাই সাধারণত আগেকার অস্তিত্বের বা যে সব অস্তিত্বকে অতিক্রম ক'রে আসা হয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু স্মরণ থাকে না।

তাহ'লে প্রথম কথা হলো সঠিক দৃষ্টি নিয়ে দেখতে শেখা, অর্থাৎ এই সত্যটি দেখা যে জীবন দুঃখময়, সকলই অস্থায়ী, আর আপন ব্যক্তির চেতনারও পূর্ব-পরে ধারাবাহিকতা নেই।

(২) সম্যক সংকল্প। এখানে সংকল্প বা ইচ্ছা কথাটি না বলাই উচিত, কারণ আমাদের শেখানো হয়েছে যে কোনো ইচ্ছাই থাকবে না, থাকবে কেবল আস্পৃহা। এখানে তাই ইচ্ছার বদলে আস্পৃহা বলা দরকার।

"সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সর্ব সত্তার প্রতি অনুকম্পা বোধ করবে।" তার মানে সকল সময়ে সকলের প্রতি একটা দাক্ষিণ্যের ভাব নিয়ে থাকা। সকলেরই মঙ্গল হোক, সর্বদা এই কামনাই করা।

(৩) সম্যক বাক্য। তোমার বাক্যে কেউ যেন আঘাত না পায়। বৃথা বাক্য উচ্চারণ করবে না, অসূয়াজনক বাক্য সযত্নে পরিহার করবে।

(৪) সম্যক আচরণ। শান্ত অকপট ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে, কেবল বাহ্য আচরণে নয়, কিন্তু নৈতিক হিসাবে মনে মনেও। মনে অকপট হওয়াই সর্বাপেক্ষা কঠিন।

(৫) সম্যক জীবিকা। এমন ভাবে থাকা যাতে কোনো প্রাণীর ক্ষতি না করা হয়। এ কথা বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু কেউ কেউ অবিবেচনায় এ আদর্শকে বরনে নিয়ে যায়, যেমন কেউ হয়তো মুখে কাপড় চাপা দিয়ে থাকে পাছে মুখের মধ্যে কোনো জীবাণু ঢোকে আর তাকে গিলে ফেলা হয়, কিংবা কেউ কেউ সামনে ঝাঁট দিতে দিতে রাস্তা চলে পাছে কোনো পোকাকে মাড়িয়ে ফেলা হয়। এটা খুবই বাড়াবাড়ি করা হলো, কারণ জীবন রাখতে কিছু জীবন নষ্ট করতেই হয়। বাস্তবের দিক থেকে যদি বুঝে দেখ তাহ'লে ও কথার অর্থ হবে এই যে অন্যের অনিষ্ট করা বাঁচিয়ে যেতে হবে, ইচ্ছা ক'রে কোনো জীবের ক্ষতি করবে না। সকল রকম প্রাণীকেই এ তালিকার অন্তর্গত ক'রে নিতে পারো, সকল প্রাণীর প্রতিই যদি দয়াশীল হও তাতে অন্তরের বিকাশ হবে।

(৬) সম্যক ব্যায়াম। অর্থাৎ প্রয়াস। অনাবশ্যক ব্যাপারে অনাবশ্যক প্রয়াস করতে যাবে না, সকল শক্তিকে সংহত রাখবে অজ্ঞান দূর করবার জন্য, অসত্য থেকে মুক্তির জন্য; এ প্রয়াসের কোনো শেষ নেই।

(৭) সম্যক স্মৃতি। এটি হলো ষষ্ঠ মার্গেরই আরো কিছু প্রামাণ্য বিস্তার—সম্যক স্মৃতি মানে অন্তরে সর্বদা সজাগ সতর্কতা থাকবে। অর্ধচেতন ও অর্ধ-অচেতন অবস্থায় থাকা নয়। জীবনে যা হবার তা হয়ে যাক বলে নিজেকে তুমি ছেড়ে দিয়েছ, সবাই তাই করছে। ওর থেকে মাঝে মাঝে ওঠো জেগে, তখন হঁশ আসে যে বৃথা সময় নষ্ট হয়ে গেছে, অমনি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে লাগো, কিন্তু মিনিটখানেক পরেই আবার ডুবে যাও জড়তায়। এমন হলে চলবে না, উগ্র রকমের উৎসাহ না হলেও অল্প উৎসাহ নিয়ে নিত্য স্মরণ রাখা চাই।

(৮) সম্যক সমাধি। এটি হলো শেষ কথা। চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করা। অহং-ভাব বর্জিত হয়ে মুক্ত চিন্তাকে নিকর্ষ সদ্‌বস্তুর উপর কেন্দ্রীভূত করতে হবে, যা সব চেয়ে ভিতর-কার সত্য ও সর্বশেষ লক্ষ্য তার প্রতি ধ্যান রাখতে হবে।

জীবনে কর্তব্যর এক শূন্যতা এসে উঁকি দেয়, যখন কোনো কাজ করবার নেই, হয়তো মাত্র কয়েক মিনিটের কিংবা তার চেয়েও কিছু বেশি সময়ের জন্য। সে সময়টা কেমন ক'রে কাটাও? হয়তো অন্যমনস্ক হবার জন্য তখনই মাথার মধ্যে কোনো বোকামির খেয়াল উদ্ভাবনা করতে থাকো। এই হলো সাধারণ রীতি। ছেলে বুড়ো সকলেই

এমনভাবে সময় কাটাতে চায় যাতে অবসাদ না এসে পড়ে। এই বিনা কাজের অস্বিরতার ভাবটা মানুষের পক্ষে বিভীষিকা, এর হাত এড়াতে লোকে কতই বোকামি করে।

কিন্তু ওর চেয়ে এক উৎকৃষ্ট উপায় আছে, স্মরণ করা। যখনই কিছু সময়ের ফাঁক পাবে, এক ঘন্টাই হোক বা কয়েক মিনিটই হোক, নিজের মনকে তখন বলবে "যাক বাপু, মনকে নিজের কাজে লাগাবার একটু ফুরসৎ পেয়ে গেছি, এখন সব-কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আপন অস্তিত্বের মূলে চলে যেতে পারি, যা সত্য যা চিরন্তন তার কাছে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে নিবেদন করতে পারি।" এই ভাবটি যদি মনের মধ্যে আনতে শুরু করো, তাহ'লে যতবার ঘটনাচক্রে নিজেকে বিপন্ন বোধ করবে, ততবারই দেখতে পাবে যে ঐ উপায়ে তাড়াতাড়ি খানিকটা ক'রে এগিয়ে যেতে পারছ। বৃথা বাক্যালাপে সময় নষ্ট না ক'রে, বৃথা কাজে চেতনাকে নীচের দিকে না নামিয়ে—এখানে নিকৃষ্ট রকমের বাজে কাজের কথা বাদ দিয়ে অতি উৎকৃষ্ট রকমের বাজে কাজের কথাই বলছি—নিজেকে সংবৃত করবে। বাজে কাজে নিজেকে বিক্ষিপ্ত ক'রে ফেলা হয়, একসময় দেখতে পাও যে তোমার সংকীর্ণ সময়টুকু আরো সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছে দেখ যে সময়ের যতটুকু সুযোগ তুমি পেয়েছিলে তার তিন ভাগ বৃথা নষ্ট হয়ে গেছে; তখন তাড়াতাড়ি ডবল মাত্রাতে এই দিকের কাজে লাগো, কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয় না। তাই বলছি, ওর বদলে বরং তুমি মন্থরগামী হও, স্থির ধীর সংযত হও, ধৈর্য হারিওনা, আর যখন যেটুকু সময় পাও তার সুযোগ ছেড়ো না, এক মিনিটেরও ফুরসৎ পেলে তার সদ্ব্যবহার ক'রে নাও।

যখন করবার কিছু নেই তখন তোমরা অস্থির হও, এদিকে ওদিকে ছোটো, বন্ধুবান্ধবের কাছে যাও, এমনি ঘুরে বেড়াও,—আরো যে সব নিষিদ্ধ কাজ আছে তার সম্বন্ধে কিছু না বলে নির্দোষ কাজগুলির কথাই বললাম—কিন্তু ওর বদলে মুক্ত আকাশের সামনে অথবা সমুদ্রতীরে কিংবা কোনো গাছের তলায়, যেখানে যেমন সম্ভব গিয়ে নির্জনে একটু স্থির হয়ে বোসো—সেখানে তোমার মনের খোরাক সব-কিছু নিলবে; সেখানে বসে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করবে, বুঝতে চেষ্টা করবে যে কেন আমি বেঁচে আছি, কি ভাবে বাঁচা দরকার, কি কাজ আমার করবার আছে আর কি কাজ করা উচিত,—অজ্ঞানতা দূর করবার জন্য, অসত্য ও দুঃখভোগ থেকে নিষ্কৃতির জন্য, সব চেয়ে ভালো কোন উপায়টি আছে।

* *

প্রশ্ন: দুঃখকষ্টবিহীন জীবনধারণ সম্বন্ধে—

উত্তর: মানুষদের একটা বিশেষত্ব এই যে তাদের মনের এমন ক্ষমতা আছে যাতে তারা নিজেদের জীবনকে পিছু ফিরে দেখতে পায়। অন্য সব প্রাণী পরম নিশ্চিন্তে কেবল বর্তমানের জীবন যাপন করতে থাকে, তাদের জীবন্তপ্রাণী বলে যেটুকু জ্ঞান তা অতি সামান্য, এই কারণে জীবন তাদের শান্তিপূর্ণ, নিজেকে নিয়ে কোনো দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয় না।

কষ্ট যখন কিছু আসে, যেমন কোনো আঘাত পেয়ে কিংবা পীড়িত হয়ে, সে কষ্টের মাত্রা অনেক কম, কারণ তাই নিয়ে তারা মনে মনে চিন্তাও করে না কিংবা ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তাকে টেনেও নিয়ে যায় না, কতটা আঘাত পেয়েছে বা কতখানি অসুস্থ হয়েছে তার কোনো ধারণা গড়তেও বসে না।

কেবল মানুষের বেলাতেই এটি এসেছে, কি হবে কি হবে এই কথাই তারা সর্বক্ষণ ভাবতে থাকে, তাদের এত দুঃখকষ্টের এই হলো মূল কারণ। এই চেতনাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে যত উদ্বেগ, ব্যথার কল্পনা, ভাবনাচিন্তা, মনের পাড়ন, ভবিষ্যৎ সর্বনাশ যেন আসন্ন আর তাই নিয়ে অধিকাংশ মানুষ—বিশেষত যারা অল্পচেতনের বদলে অতিচেতন—তারা সর্বক্ষণের জন্যই একটা যন্ত্রণাদায়ক জীবন যাপন করতে থাকে। মানুষ এমনি চেতনা-কাতর যে এগুলিকে তারা তুচ্ছ করতে পারে না, অথচ এতখানি চেতনা নেই যাতে কিসের পরিণামে কি হবে তা জানতে পারবে। এ কথা একেবারেই মিথ্যা নয় যে জগতের সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে মানুষের দুর্গতিই সব চেয়ে বেশি। এতেই মানুষ আদিম কাল থেকে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, পুরুষপরম্পরায় তাই চলে আসছে, কিন্তু এ যে খুবই দুর্গতির জীবন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় আধ্যাত্মিক শক্তির জোরে নিজেকে এর চেয়ে উচ্চতর স্তরে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া, পশুস্তরের অচেতনার জায়গাতে একটা আধ্যাত্মিক অতিচেতনা এনে ফেলা, যার দ্বারা সে জীবনের লক্ষ্য ও আত্মপ্রয়াসের রাস্তা দেখতে পাবে, অধিকন্তু এক আধ্যাত্মিক উচ্চতর শক্তির উপর নিঃসন্দেহ নির্ভরতা আসবে, তখন তারই হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিতে পারা যাবে, জীবনের ও ভবিষ্যতের সব-কিছু ভার তারই হাতে ছেড়ে দিয়ে সমস্ত ভাবনাচিন্তা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

আবার যে সেই আগেকার পশুজীবনে ফিরে যাওয়া, তা এখন মানুষের পক্ষে অসম্ভব, যে চেতনার স্তরে সে এসে পৌঁছেছে তাকে ছেড়ে দিয়ে সে নীচে নামতে পারে না। সুতরাং তার পক্ষে কেবল একটি রাস্তাই খোলা রয়েছে, দুর্গতির হাত এড়িয়ে যাবার—এই একটিমাত্র উপায়, এর চেয়ে আরো উচ্চতর অবস্থাতে উঠে যাওয়া সেখানে ভাবনাচিন্তার বদলে এসে যাবে সনির্ভর সমর্পণ আর এক জ্যোতির্ময় পরিণতি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা—অর্থাৎ এখনকার এই চেতনা তখন সম্পূর্ণই বদলে যাবে।

সত্য কথা বলতে কি, এমন এক জীবনধারণের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেওয়া যার সমস্যা-গুলির সমাধানের কোনো চাবিকাঠি আমার হাতে নেই, একটা জটিল প্রশ্ন এসে পড়লে তার উত্তর পাবার কোনো সূত্র মিলবে না, এর মতো দুর্ভোগ আর কিছুই নেই। পশুদের কোনো সমস্যাই নেই, তারা শুধু জীবনযাপন করে চলে। প্রবৃত্তি যেদিকে টানে সেইদিকে যায়, একটা সমষ্টিচেতনা নিয়ে তারা চলে, সেই সমষ্টি চেতনার অন্তর্নিহিত জ্ঞান তাদের ছাড়িয়ে যায়; ওদের সকল কাজই সোজাসুজি, বিচার ক'রে বা চেষ্টা ক'রে নয় কিন্তু স্বভাবতই ক'রে ফেলা; জীবনের কোনো দায়িত্বই ওদের নেই, তাই জীবন নিয়ে কোনো উৎকণ্ঠাও

নেই। কেবল মানুষের মধ্যেই এসে পড়েছে এই ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ, নিজের উপর নির্ভর ক'রে বাঁচতে হবে এ ভাবনাটি তাদের মধ্যে ঢুকে গেছে; অথচ তদুপযুক্ত জ্ঞান তাদের নেই, এরই জন্য মানুষকে অবিরাম যন্ত্রণা পেতে হয়। এ যন্ত্রণা কেবল তখনই থামবে যখন সে নিজের চেয়ে বড়ো কোনো চেতনার উপর সমস্ত ভার সঁপে দিতে পারবে, পূর্ণ নির্ভরতার সঙ্গে নিজেকে তারই হাতে ছেড়ে দেবে, সকল দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণভার সেখানেই অর্পণ করবে।

যে সমস্যার সমাধান তোমার নিজের জানা নেই তার সম্বন্ধে কিই বা তুমি করতে পারো? অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে মানুষ মনে করে তার নিজের সব-কিছুর ব্যবস্থা তার নিজেকেই করতে হবে, যদিও সে বিষয়ে তেমন জ্ঞান তার নেই। এর থেকেই যা-কিছু যন্ত্রণাভোগের শুরু। "কি করি, কি করি?" এই হলো তার মনের সারাক্ষণের প্রশ্ন। ওর সঙ্গে আরো এক তীব্র রকমের দুর্ভাবনার প্রশ্ন যোগ করা হয়, "এর পর কি হবে?" অথচ এ প্রশ্নের উত্তর দেবার কোনো শক্তিই নেই।

এই কারণে সকল রকম আধ্যাত্মিক শিক্ষার গোড়ার কথাই হলো সকল দায়িত্ব ত্যাগ, উপরের সত্তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা, তা ছাড়া প্রকৃত শান্তি আসে না।

কিন্তু মানুষের চেতনাকে এ ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে যাতে সে এর চেয়ে আরো আগে যেতে পারে, তার কাছে যা অজ্ঞাত তাকে সে আবিষ্কার করতে পারে, আজও যা তার হওয়া হয়নি তাও সে হয়ে উঠতে পারে। অতএব বলা যায় যে সর্বত্যাগী অচল নিষ্ক্রিয় এক শান্তির অবস্থার চেয়েও আরো উচ্চতর অবস্থা আছে; সেই দৃঢ়প্রত্যয় থেকেই আসবে আরো আগে চলবার ইচ্ছার জোর, সেই ইচ্ছা হবে নিরুদ্বিগ্ন, সাফল্য সম্বন্ধে চিন্তাবর্জিত। যাকে বলা চলে "শান্তিকামী" প্রণালী, কর্মমাত্রকেই এড়িয়ে আভ্যন্তরীণ নিশ্চলতা ও স্থিরতার মধ্যে ডুবে থাকা, জীবন ব্যাপারকে বাদ দিয়ে চলা কারণ গোড়াতেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে শান্তি ছাড়া কোনো উপলব্ধি আসে না, ঐ প্রণালীর তুলনায় এতে হবে আরো এক ধাপ উঠে যাওয়া। প্রথম অবস্থাতে স্বভাবতই ঐটুকু বুঝেছিলে যে বাহ্য বিষয়ে ব্যাপৃত থাকলে শান্তি আসে না, যে সমস্যার কোনো উপায় জানা নেই তা নিয়ে লেগে থাকলে কেবলই উৎকণ্ঠা, কারণ তার সমাধান তোমার হাতে নেই।

ওর পরের ধাপ হলো সেই সব সমস্যার সম্মুখীন হওয়া, কিন্তু অচঞ্চল দৃঢ়তার সঙ্গে, পূর্ণ নির্ভরতা নিয়ে সেই পরমা শক্তির উপর যে শক্তি সব-কিছুই জানে আর তোমাকে যে ঠিক রাস্তায় চালাতেও পারে। এ অবস্থাতে তাহ'লে কোনো কাজকেই এড়িয়ে যাবার দরকার হবে না, সবল ও সক্রিয় এক উচ্চতর শান্তিকে সম্বল ক'রে কর্মই করবে।

একে বলা যেতে পারে জীবনের ক্ষেত্রে দিব্যের সাহায্য আসার একটা নতুন দিক, অস্তিত্বের ব্যাপারে দিব্যের এক নবতর তৎপরতা, আরো নতুন রকমের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি।

* * *

প্রশ্ন : জগতের বর্তমান সংকট সমস্যা সম্বন্ধে—

উত্তর : এ জিনিসটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর মানবজাতির মধ্যে দেখা দিয়েছে এক সর্বজনীন সংশয় ব্যাকুলতা—তাদের সকল প্রয়াসেও সংশয়, কর্মেও সংশয়, এমন কি দৈনন্দিন জীবনেও সংশয়,—আর সকলেই এমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে, অস্থিরতা এমন সর্বব্যাপী, যে দেখলে মনে হয় সমগ্র মানবজাতি একটা সীমান্তে এসে পৌঁছেছে, এর পরেই হয়তো তারা বাঁধ ভেঙে এক নতুন চেতনায় উত্তীর্ণ হবে, কিংবা পিছনে হটে আবার অন্ধকার ও জড়তার তলে তলিয়ে যাবে।

উদ্বেগের ভাবটি এমনই সর্বব্যাপী যে এর পর একটা-কিছু ভাঙন আসা অপরিহার্য। চিরদিন এমন চলতে পারে না। জগতের এই বর্তমান অবস্থা থেকে নিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে যে শক্তি তেজ ও চেতনার কোনো নতুন ধারা এই জড়জগতের তলে তলে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, তারই আভ্যন্তরীণ চাপে এমন চরম অবস্থা এসে পড়েছে। বাইরের থেকে মনে হতে পারে যে প্রকৃতি এই জগতের ধারার মধ্যে নতুন-কিছুর অবতারণা করতে আগে আগে যে উপায় প্রয়োগ করতো এবারেও তাই করছে। কিন্তু এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে আরো এক নতুন রকমের লক্ষণ—যদিও অল্প কয়েকজন যারা জ্ঞানদীপ্ত তারাই তা দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু এই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। সে লক্ষণ কেবল এক জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে না, জগতের কেবল একটি অংশে নয়, সকল দেশেই তার নিদর্শন মিলবে : সে জিনিস হলো এক ঊর্ধ্বমুখী ইচ্ছার গতি, নতুন কোনো উচ্চতর সমাধানের ভূমি আবিষ্কারের জন্য সেই ইচ্ছা আরো ব্যাপক ও পূর্ণতর পরিণতিতে উপনীত হবার একটা চেষ্টা।

এ কথাও বলা যেতে পারে যে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত সনাতন ধরনের ভাবধারা ক্রমশ বিকাশ পাচ্ছে এবং জগতের মধ্যে তা ক্রিয়া করছে। দুই রকমের সম্ভাবনাই একত্রে পাল্লা দিয়ে চলেছে. এক প্রলয়ংকরী মহা বিপর্যয়ের সম্ভাবনা, অর্থাৎ এমন এক সর্বব্যাপী ধ্বংসলীলা দেখা দিতে পারে যেমন জগতে কখনই হয়নি ; অপরপক্ষে এমন উদার ও উচ্চতর ভাবধারার এবং ইচ্ছাশক্তির জন্ম ও অভিব্যক্তি হতে পারে যা মানুষের বুদ্ধিসীমার মধ্যে প্রবেশ ক'রে তাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ত ও পরিণত ক'রে দিয়ে সব-কিছু জটিল সমস্যার একটা পাকাপাকি মীমাংসা ক'রে আনবে।

এই দুই রকম তরফের দুই শক্তির দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম উত্তরোত্তর প্রবল ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। এক দিকে প্রবল ধ্বংসশক্তি, যার থেকে হতে পারে সমূহ বিনাশ ও বিলোপ, যে উন্মাদ শক্তি সকল শাসনের বাইরে,—আর এক দিকে উত্তাননুখী বিবর্তনের অমোঘ নিষিৎসাশক্তি, যার বিজয়ের ফলে হবে পূর্ণতর ভাগবতসিদ্ধি ; দুই শক্তিতে যেন দৌড়ের প্রতিযোগিতা চলেছে, কে আগে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। মনে হচ্ছে যেন দিব্যের বিরোধী সকল অদিব্য শক্তি বা প্রাণজগতের শক্তিরা একজোট হয়ে এখানে নেমে এসেছে, একেই ক'রে তুলেছে

তাদের বীর্য আস্ফালনের ক্ষেত্র, আবার সেই সঙ্গে সর্বোচ্চ ও পরম আধ্যাত্মিক শক্তিও এখানে নেমে এসেছে, তার উদ্দিষ্ট এক নবতর জীবন এখানে এনে ফেলতে। সেই কারণেই সংগ্রাম এতখানি চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু আশা করা যায় যে এর একটা হেস্তনেস্ত হবেই, শীঘ্রই এর একটা চরম মীমাংসা হয়ে যাবে।

খুব বেশি আগেকার কথা নয়, এক সময় মানুষ আস্পৃহা করতো নীরব নিষ্ক্রিয় থেকে শান্তিলাভের জন্য, জগতের সকল বিষয়ে নিরাসক্ত হয়ে জীবন ব্যাপারকে এড়াবার জন্য, যাতে কোনো পার্থিব সংগ্রামে লিপ্ত হতে না হয়, সকল প্রচেষ্টা থেকে মুক্ত হয়ে সকল বিশ্ব বিরোধের উপরে ওঠা যায়, এমন এক আধ্যাত্মিক শান্তি পাওয়া যায় যাতে সংঘর্ষ বা উদ্বেগের কোনো সম্ভাবনাই নেই, দুঃখকষ্টও কিছু নেই,—এই অবস্থাকেই প্রকৃত আধ্যাত্মিক সিদ্ধি ও দিব্যজীবন বলা হতো। একে বলা হতো ভগবৎ-কৃপা, ভগবানের দান,—এমন কি বর্তমান উদ্বিগ্নতার যুগেও এমনি কৃপালব্ধ শান্তির অবস্থাকে সব চেয়ে কাম্য বলা হয়, এই ধরনের মুক্তির জন্য আকিঞ্চন করা হয়, অনেকের মতে এ হলো যথার্থ ঈশ্বরানুগ্রহ।

অবশ্য যেমন ধরনেরই সিদ্ধি লাভ করতে চাও, তার জন্য ঐরূপ অটল শান্তি এনেই কাজ শুরু করতে হবে। এরই ভিত্তিতে সকল-কিছু গড়ে তোলা যায়। কিন্তু যখন শান্তির অবস্থাতে পৌঁছে সেখানেই থেমে যাওয়া নয়, যদি তুমি অন্য সব উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে কেবল নিজের মুক্তিটুকুই না চাও।

ভগবৎ-কৃপার আরো এক দিক আছে, যা অগ্রগতির দিক, সকল বাধাবিঘ্নের উপর বিজয়লাভ করার দিক, যাতে মানবজাতিকে একটা নূতন উপলব্ধিতে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে, যাতে নব জগতের সিংহদ্বার খুলে যায়, কেবল মুষ্টিমেয় কয়েক জনেরই সিদ্ধিলাভের সৌভাগ্য নয়, কিন্তু এমন অবস্থা এনে ফেলা যাতে এদের প্রভাবে ও দৃষ্টান্তে ও শক্তিক্রিয়াতে সকল মানুষই উন্নত হয়ে উঠতে পারে।

এই উপায়েই ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ খুলে যেতে পারে, পূর্বপ্রত্যাশিত সম্ভাবনাগুলি সফল হয়ে আসতে পারে, মানবজাতির একটা সম্পূর্ণ অংশ—অর্থাৎ যারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যাশিত নবশক্তির দিকে নিজেদের উন্মীলিত ক'রে দিয়েছে তারা—অপেক্ষাকৃত সহজে সুষ্ঠু ও সুপরিণত উচ্চতর জীবনে উন্নীত হতে পারে। সকলের ব্যক্তিগত রূপান্তর ঘটা যদিই সম্ভব না হয়, তবু সর্বজনের অন্ততপক্ষে একটা সাধারণ উন্নয়ন হবেই; সমগ্রের মধ্যে এমন এক সঙ্গতি আসবে যাতে মানব-জগতে নতুন ধারার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে, আর অব্যবস্থা হেতু দুঃখ ও দ্বন্দ্বের অবস্থা গিয়ে শান্তিসুখের যুগ এসে পড়বে।

তবে যাদের উন্নয়ন কোনোমতে আনা যায় না, যারা অগ্রসর হতে নারাজ, তারা স্বতঃই চেতনার অবনতিতে ফিরে চলে যাবে মনুষ্যেতর স্তরে।

আমার এক স্বচক্ষে দেখা অনুভূতির দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, তার থেকেই আমার বক্তব্য বুঝতে পারবে। আমার সেই তরা ফেব্রুয়ারির অনুভূতির দিনকয়েক পরের কথা, তখনও আমি

এমন অবস্থায় রয়েছি যাতে স্থূল জগতের সকল বিষয়কেই বহুদূরের অসঙ্গত ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। ঐ সময়ে একদল যাত্রী এখানে এসে আমাকে প্রণাম করবার অনুমতি নিলে, তারা সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হলো খেলার মাঠে। তারা বেশ ধনী লোক, অর্থাৎ প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক বেশি অর্থের তারা মালিক। তাদের মধ্যে ছিল একটি মহিলা, শাড়ি-পরা। মহিলাটি অতিরিক্ত স্থূলাঙ্গী, সেই স্থূলতাকে ঢাকা দেবার জন্য শাড়িটি সর্বাঙ্গে জড়িয়েছে। কিন্তু আশীর্বাদ গ্রহণ করতে যখন সে দেহ নত করলে তখন শাড়ির একটা প্রান্ত সরে গিয়ে উদরের প্রকাণ্ড বেদপিণ্ড বেরিয়ে পড়ল। তাই দেখে আমি যেন তড়িৎস্পৃষ্ট হলাম। মোটা মানুষ এমন অনেক আছে যাদের দেখে তেমন বিসদৃশ মনে হয় না। কিন্তু একে দেখে আমার মনে হতে লাগল যেন ঐ বেদপিণ্ডের আড়ালে রয়েছে এক মস্ত বিস্ফোটক, কদর্য লোভের ক্লিন্ন ক্লেদে পরিপূর্ণ, অন্তরালে লুকিয়ে আছে এমন বিকৃত রুচি ও হীন লালসা যা পশুদের মধ্যেও নেই, যার ইঙ্গিত পর্যন্ত অশ্লীল ও বিকারময়। আমার ভিতর থেকে বোধের প্রার্থনার মতো এই প্রার্থনা উঠে এলো "হে প্রভু, এ নয়, এ নয়, এ জিনিস যেন লুপ্ত হয়"।

এ পর্যন্ত অনায়াসেই বোঝা যায় যে পার্থিব দুঃখদুর্গতি, অর্থের অসম বণ্টন, এই সবের পরিবর্তন আনা অসাধ্য নয়, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা এগুলিকে ঘোচানো যেতে পারে, কিন্তু যে দুর্গতি মনের ভিতরকার, যে বিকার প্রাণের ভিতরকার, তাকে বদলাতে পারা অসাধ্য, এ-জিনিস কিছুতেই বদলাতে চায় না। যারা এমনি বিকারপ্রাপ্ত মানুষ তাদের পর্বনির্দিষ্ট নিয়তি ক্ষয়নাশ—বস্তুত পাপ কথাটির মানেই তাই বিকারের শুরু সেখানে মনেরই মধ্যে।

মানবজাতির, মানবচেতনার যে অংশ নিজেকে মুক্ত করে অতিমানসে পৌঁছতে সক্ষম, সে অংশের পুরোপুরি রূপান্তর ঘটবে; সে অংশ অগ্রসর হয়ে চলেছে এমন এক পরিণতির দিকে যা আজ পর্যন্ত জগতে বাহ্য আকারে দেখা যায়নি; আর যে অংশ নগ্ন স্থূল পশুত্বের খুব কাছাকাছি রয়ে গেছে, প্রকৃতিই তাকে পুনর্গ্রাস ক'রে নেবে, জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে। মানবচেতনার এই বিকারপ্রাপ্ত অংশ, যা মনের অপব্যবহারেই এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, শেষ পর্যন্ত তার ছাঁটাই হয়ে যাবে।

এমন ধরনের মানুষ হলো সৃষ্টিকার্যের নিষ্ফল পরীক্ষার নিদর্শন, এরা বাদ হয়ে যাবে,—জগতের ইতিহাসে যেমন দেখা গেছে আগেকার কালে কত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু তারা টিঁকে থাকার অনুপযুক্ত হওয়াতে এখন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আগেকার যুগের ভবিষ্যৎদ্রষ্টারা অনেকে তাঁদের দৈবদৃষ্টিতে এ জিনিস দেখেছিলেন, কিন্তু তার পরে যেমন হয়ে থাকে, সেই দৃষ্টিশক্তি মিলিয়ে যেতেই সব মেশামিশি হয়ে গেল, জড়জগতের রূপান্তর আনার মতো অতিমানসের আবির্ভাব হয়ে মানবজাতির উৎকৃষ্ট অংশের উত্তরণের সম্ভাবনা তাঁরা আর দেখতে পেলেন না। তাই যারা বিকারের মধ্যে জন্মেছে তাদের

তাঁরা এই আশা দিলেন যে শ্রদ্ধাকে আশ্রয় করলেই পাপমোচন ও মুক্তিলাভ হবে। ভগবানের উপর অটল শ্রদ্ধা নিয়ে থাকলে পরজগতে গিয়ে তারা আপনা হতেই উদ্ধার হয়ে যাবে। কেবল শ্রদ্ধাই যথেষ্ট, বুদ্ধির কোনো দরকার নেই, বোঝবার কিছু দরকার নেই। অতিমানস জগৎ তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়নি বলে এটিও তাঁরা দেখেননি যে ভগবান নিজেকে জড়ের মধ্যে নিবর্তিত ক'রে রেখেছেন, শেষ পর্যন্ত সেখান থেকেই তাঁর বিবর্তন ও বিকাশ হবে।

জড়ের মধ্যে মন প্রবেশ করাতে যে সব বিকৃতি ও বৈকল্যের জন্ম হয়েছে, যার ফলে মানুষের এত জ্বালা যন্ত্রণা, নৈতিক অবনতি, যার ফলে মিথ্যা ও লোকমিতে সারা জগৎ ছেয়ে গেছে, মানবজীবনের একটা দিক বীভৎস হয়ে উঠেছে, অতিমানসের জগতে এগুলি থাকবে না। এগুলি দূর হওয়াই দরকার, এরই জন্য মানুষ অনেক বিষয়ে সরল পশুদের চেয়ে নিকৃষ্ট নীচু স্তরের হয়েও তারা সরল ও স্বাভাবিক, তাদের মধ্যে অনেক ত্রুটি থাকলেও সঙ্গতির অভাব নেই।

মানবজাতির একটা বিপুল অংশ তাদের মনকে একান্তভাবে অহংতোষণের কাজে লাগিয়ে লাগিয়ে এমনই বিকৃত ক'রে এনেছে যে সে-কারণেই তারা নিত্য দুর্গতি ভোগ করছে, পশুদেরও দুর্দশা এমন নয়।

উপরে উঠে যেতে হবে, আলোর দিকে ও সঙ্গতির দিকে, আর তা নইলে নেমে যেতে হবে পশুদের সরল স্বাস্থ্যকর জীবনের দিকে, যার মধ্যে অন্তত বিকৃতি কিছু নেই।

* *

প্রশ্ন : অবতার সম্বন্ধে—

উত্তর আজ আমাকে অবতার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ এই নিয়ে অনেক লিখেছেন, প্রশ্নকারকের পক্ষে সেগুলি সব পড়ে দেখলে ভালো হয়। আমি সেদিক দিয়ে কিছু বলতে চাই না।

কিন্তু তোমাদের আমি শোনাতে পারি এক প্রাচীন প্রবাদ কাহিনী, যা আধ্যাত্মিক ও গুপ্তবিদ্যার মতবাদের চেয়েও প্রাচীন, সে হলো বৈদিক ও চাল্‌দিয় (Chaldean) প্রবাদ, তার থেকেই ঐ দুই রকমের মত গড়ে উঠেছে। সেই প্রবাদে বলেছে যে একসময় যখন বিরুদ্ধ-শক্তিদের, অর্থাৎ ভারতীয় ভাষায় অসুরদের দাপটে জগৎ আলোকে ও চেতনায় ফুটে ওঠার বদলে তামসিকতা, অজ্ঞানতা ও অচেতনায় ছেয়ে গেল, যেমন এখন হয়েছে, তখন স্রষ্টাশক্তি আদি পরমসত্তার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলে, এমন কিছু নতুন উপায় করা হোক যাতে বিশ্ব এই দুর্গতি থেকে রক্ষা পায়। সেই প্রার্থনার ফলে পরমসত্তা থেকে জন্মগ্রহণ করলো আরো এক বিশেষ সত্তা, করুণায় ও চেতনায় পরিপূর্ণ ; তাকে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করা হলো নিশ্চেতন জড়ের মধ্যে, সেখানে মৌলিক চেতনা ও প্রেম জাগিয়ে তুলতে হবে।

প্রাচীন কাহিনীতে এই সত্তাটির এরূপ বর্ণনা আছে—সে কোনো এক অন্ধকার গুহাতলে গভীর নিদ্রায় শায়িত, তার থেকে তির্যক জ্যোতিরশ্মি নির্গত হয়ে নিশ্চেতনের জগতে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা প্রবেশ করছে, যাতে সেখানে পুনর্জাগরণ শুরু হয়ে যায়।

তোমরা যদি তোমাদের চেতনাকে নিয়ে সেই নিশ্চেতনার মধ্যে প্রবেশ করতে পারো, তাহ'লে এখনও দেখতে পাবে সেই অনির্বচনীয় সত্তাকে, তেমনি অকাতরে সে ঘুমিয়ে আছে, তেমনি ভাবেই তার জ্যোতি বিকিরণ করছে ; এই রকমই চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চেতনার নিশ্চৈতন্য না ঘোচে, জগৎ থেকে সকল তমস দূর হয়ে এই সৃষ্টি অতিমানস চেতনায় জেগে না ওঠে।

আশ্চর্যের কথা এই যে আমি একদিন অন্তর্দৃষ্টিতে যে ব্যক্তিকে দেখেছিলাম এই অনির্বচনীয় সত্তা ঠিক তারই মতো দেখতে,—সে যেন রয়েছে এক প্রত্যন্তদেশে, সাকার নিরাকারের সীমান্তে। কিন্তু আমি দেখেছিলাম সে স্বর্ণাভ লোহিত আভায় সমুজ্জ্বল, আর এই ঘুমন্ত সত্তা হলো হীরকশুভ্র, তার থেকে যে রশ্মি আসছে তা শুক্লির মতো শুভ্র।

ইনিই হলেন সকল অবতারের মূল সত্তা। সকল বিশ্বের ইনি প্রথম অবতার, ক্রমে ক্রমে চেতন রূপগুলি ধারণ করেছেন, আর প্রকাশ্যে অভিব্যক্ত হয়ে এখানে নেমে এসে জগতের প্রস্তুতির কাজ ক্রমশ সম্পূর্ণ করেছেন, জগৎ যাতে অতিমানসের জ্যোতিকে ধারণ ক'রে তাকে অভিব্যক্ত করতে পারে।

প্রত্যেক দেশের বিবিধ প্রবাদে এই সত্যকে বিভিন্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তার বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা ও নিরূপাদির নির্দেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে ব্যক্তিগত বিশেষত্বও আছে, কিন্তু সকল কাহিনীর মূলে সেই একই কথা, সেই ভগবৎ-সত্তা সরাসরি এখানকার তমসাবৃত জড়ের মধ্যে নেমে এসে তাকে দিব্যশক্তিলাভের আশ্বাসে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে।

যতই বেশি দিন পার হয়ে যাচ্ছে ততই বিভিন্ন অবতারের আবির্ভাবের অন্তর্বর্তীকাল কমে আসছে, জড়কে যত শীঘ্র সম্ভব তারা প্রস্তুত ক'রে আনতে চায়, যাতে কাজটা আরো তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়ে যায়, উত্তরোত্তর অধিকতর চেতনার স্ফুরণ ঘটতে পারে, পরিণতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

এই কাজ যতদিন আরো সজোরে চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই জগৎটাই ভগবানের পূর্ণ অবতারে পরিণত না হয়ে ওঠে।*

* অনুবাদক—শ্রীগুপতি ভট্টাচার্য

চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

শ্রীঅরবিন্দ

জ্ঞান

মানুষের মধ্যে দুটি সম্মিলিত শক্তি রয়েছে—জ্ঞান আর প্রজ্ঞা। জ্ঞান হল সত্যের ততটুকু যতটুকু মন ধরতে পেরেছে হাতড়ে হাতড়ে, দেখেছে একটা বিকৃত আবেষ্টনের ভিতর দিয়ে। প্রজ্ঞা হল দিব্যদৃষ্টি দিয়ে চক্ষু যা দেখে অধ্যাত্মের মধ্যে।

* * *

অন্তঃপ্রেরণা হল বৃহৎ ও সনাতন জ্ঞান হতে উৎসারিত দীপ্তির এক ক্ষীণ ধারা।

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে বুদ্ধি যতখানি ছাড়িয়ে না যায়, তার চেয়ে বেশি বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায় অন্তঃপ্রেরণা।

* * *

আমি যখন কথা বলি, বুদ্ধি ভাবে, "এই কথা বলব আমি"—কিন্তু ভগবান আমার মুখ থেকে কথা তুলে নেন, জিহ্বা বলে এমন কিছু বুদ্ধি যাতে ভয়ে কাঁপে।

* * *

আমি জ্ঞানী নই, কারণ আমার কোনই জ্ঞান নাই—আছে ততটুকু জ্ঞান যতটুকু তিনি দেন তাঁর কর্মের জন্য। কেমন করে জানব আমি, যা আমি দেখছি তা হল সুবুদ্ধি না মূঢ়তা? না, দুটির একটিও তা নয়; কারণ যা আমি দেখছি তা হল সত্যমাত্র, তা মূঢ়তাও নয়, সুবুদ্ধিও নয়।

* * *

মানুষ যদি পলকের জন্য দেখতে পায় কি অসীম ভোগ, কত পূর্ণ সিদ্ধশক্তি কত স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের জ্যোতির্ময় প্রসার, আমাদের সত্তার কত বৃহৎ প্রশান্তি আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে এক নিভৃত লোকে, পশুপ্রকৃতির বিবর্তনে এখনো তাদের জয় করা হয় নাই—তা হলে মানুষ সব দূরে ফেলে দেবে, শান্ত হয়ে থাকবে না, যতদিন এই সব সম্পদ সে অধিকার না করে। কিন্তু পথ সঙ্কীর্ণ, দুয়ার খুলে ধরাও কঠিন, ভয় সংশয় অবিশ্বাস রয়েছে পথে—প্রকৃতির অঙ্গুশ সব অসাধারণের ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়াবার অন্তরায় যত।

* * *

আমার শিখতে কিছু বিলম্ব হল যে বুদ্ধির যখন মৃত্যু প্রজ্ঞার তখন জন্ম—এই মুক্তি-লাভের পূর্ব্বে আমার ছিল শুধু জ্ঞান।

* * *

মানুষ যাকে জ্ঞান বলে তা হল মিথ্যা বাহ্যরূপকে যুক্তির সাহায্যে স্বীকার করা। প্রজ্ঞা আবরণের পিছনে দৃষ্টি দেয় ও সাক্ষাৎ দেখে। যুক্তি সবিস্তারে সব স্থির করে ধরে, দেখায় সে-সকলের বৈসাদৃশ্য। যুক্তি করে বিযুক্ত, কিন্তু প্রজ্ঞা সকল বৈসাদৃশ্যকে অভিন্ন সামঞ্জস্যে সংযুক্ত করে।

* * *

হয় কেবল নিজের বিশ্বাসকেই জ্ঞান, আর অন্য সকলের বিশ্বাসকে প্রমাদ অজ্ঞান ভণ্ডামী নাম দিও না, আর না হয় সাম্প্রদায়িক সব মতবাদকে আর তাদের অসহিষ্ণুতাকে বিদ্রূপ করো না।

* * *

অন্তঃপুরুষ যা দেখেছে, উপলব্ধি করেছে, তাই সে জানতে পেরেছে: বাকী সব হল আপাতবোধ, বিমোহ আর সংস্কার।

* * *

আমার অন্তঃপুরুষ জানে সে অমর—কিন্তু তুমি একটা মৃতদেহকে খণ্ডবিখণ্ড করছ আর বিজয়দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করছ, "কোথায় তোমার অন্তঃপুরুষ, কোথায় তোমার অমরত্ব?"

* * *

অমরত্ব মৃত্যুর পরে মনোময় ব্যক্তিসত্তায় উত্তর্ত্তন নয়—যদিও এ জিনিষও সত্য। অমরত্ব হল জন্মহীন মৃত্যুহীন আত্মায় জাগ্রত স্থিতি—দেহ সে আত্মার যন্ত্রমাত্র ছায়ামাত্র।

* * *

তারা অকাট্য যুক্তি দিয়ে আমার কাছে প্রমাণ করে দিলে যে ভগবান নাই, আমি বিশ্বাস করলাম তাদের কথা। পরে আমি স্বচক্ষে দেখলাম ভগবানকে, তিনি এলেন, আমায় আলিঙ্গন দিলেন। এখন তাহলে কোনটি বিশ্বাস করি, অন্যের যুক্তি না আমার নিজের উপলব্ধি?

* * *

তারা বললে, "এ সব দৃষ্টি-বিভ্রম"। আমি জানতে চাইলাম দৃষ্টি-বিভ্রম কাকে বলে—শেষ দেখলাম এর অর্থ সেই সব অনুভবের বা অন্তশ্চেতনার অভিজ্ঞতা যার অনুরূপ বাহ্য বা স্থূল বাস্তব কিছু নাই। আমি তখন বসে বসে তাত্ত্বিক করি মানুষী বুদ্ধির কি ঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি।

যে সব সত্যকে আমাদের বাহ্য-বৃত্তি সরিয়ে দিয়ে ঢেকে রেখেছে তাদের বিক্ষিপ্ত হঠাৎ-দর্শনের নাম বিজ্ঞানে দেয় দৃষ্টি-বিভ্রম—আর আকস্মিক যোগাযোগ বলে নাম দেয় সেই সব অদ্ভুত শিল্পীসুলভ তুলির টান যা দেখা যায় সর্ব্বগত পরম প্রজ্ঞা যখন তাঁর আপন চিন্ময় সত্তার পটে জগৎকে সাজিয়ে ফুটিয়ে তোলেন।

* * *

মানুষ যাকে বলে দৃষ্টি-বিভ্রম তা হল মনের ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমাদের সাধারণ মানস ও ইন্দ্রিয়জ প্রত্যয়ের উর্দ্ধে যে বস্তু তার প্রতিফলন, প্রাপ্ত-জ্ঞান আগে মন যখন এ সকল প্রতিফলনের কদর্থ করে। এ ছাড়া অন্য দৃষ্টি-বিভ্রম নাই।

* * *

আধুনিক বহু তর্কবাগীশ যেমন করে, তেমন বাগাড়ম্বরের নীচে ফেলে সুচিন্তাকে নিষ্পিষ্ট করো না কিম্বা বাঁধা-গৎ আর চলতি বুলির কুহক দিয়ে জিজ্ঞাসাবৃত্তিকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলো না। সদাসর্ব্বদা অন্বেষণ করে চলো। ত্বরিত দৃষ্টিতে যা মনে হয় আকস্মিক যোগাযোগ বা চোখের বিভ্রম তার হেতু আবিষ্কার কর।

* * *

কে একজন নিয়ম করে দিতে চাইলে, ভগবান এই রকম কি ঐ রকম হবেনই, নতুবা তিনি ভগবানই হতে পারেন না। আমার কিন্তু মনে হল আমি জানতে পারি কেবল ভগবান হন যা তাই, তাঁর কি হওয়া উচিত তা আমি তাঁকে বলি কি রকমে? কোন বিধি অনুসারে তাঁকে আমরা বিচার করব? এ ধরণের বিচার আমাদের অহমিকার ধৃষ্টতা মাত্র।

* * *

আকস্মিকতা বলে বিশ্বে কিছু নাই—মায়ার ধারণাও হল মায়া। মানুষের মনে কখন এমন কিছু মায়াভ্রান্তি থাকতে পারে না যা একটা সত্যেরই বিকৃতি বা আবরণ নয়।

* * *

আমার যখন ছিল ভেদবুদ্ধি তখন অনেক জিনিষের উপর আমার ছিল জুগুপ্সা। কিন্তু ভেদবুদ্ধি আমি হারিয়েছি সাক্ষাৎ দৃষ্টির মধ্যে; সারা জগৎ খুঁজে আমি বের করতে চাইলাম কুৎসিত আর ঘৃণ্যকে, কিন্তু কোথাও সাক্ষাৎ পেলাম না তাদের।

* * *

ভগবান আমার দৃষ্টি খুলে দিলেন—আমি দেখলাম হেয়ের শ্রেয়ত্ব, ঘৃণ্যের লাবণ্য, অঙ্গহীনের পূর্ণাঙ্গতা আর কদর্য্যের সৌন্দর্য্য।

* * *

খৃষ্টানেরা আর বৈষ্ণবেরা ক্ষমাকে প্রশংসা করে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, কি আমাকে ক্ষমা করতে হবে, কাকেই বা করতে হবে?

মানুষের হাত দিয়ে ভগবান আমাকে আঘাত করলেন ; তখন আমি বলব কি,"ভগবান, তোমার ঔদ্ধত্যকে আমি মার্জনা করলাম" ?

* * *

আঘাত দিয়ে ভগবান আমার এক মঙ্গল সাধন করলেন। আমি কি তাঁকে বলব : "হে সর্ব্বশক্তিময়! তোমার এই অপকর্ম্ম, এই নিষ্ঠুরতা আমি ক্ষমা করলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে এ রকমটি আর করবে না" ?

* * *

দু:খে কষ্টে পড়ে যখন পরিতাপ করি,—বলি," এ হল অশুভ"—কিম্বা যখন হয়ে পড়ি ঈর্ষান্বিত, আশাহত, তখন আমি জানি আমার মধ্যে সনাতন নির্ব্বোধটি জেগে উঠেছে।

* * *

অপরের দুর্ভোগ যখন দেখি আমি, তখন আমি বোধ করি কি দুর্ভাগা আমার—কিন্তু এক প্রজ্ঞা আছে যা আমার নয়, সে দেখে ভবিষ্য-মঙ্গলকে আর দেয় তার সম্মতি।

* * *

ফাঁসীর আসামীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখে সার ফিলিপ সিডনী (Sir Philip Sydney) বলে উঠলেন—"এই দেখ যায় সার ফিলিপ, তবে ভগবৎ-করুণা বঞ্চিত"। না, জ্ঞানীর কথা হত যদি তিনি বলতেন—"এই ভগবৎকরুণা সমন্বিত যায় সার ফিলিপ"।

* * *

ভগবান হয়েছেন নিষ্ঠুর, মহা-উৎপীড়ক—কারণ, তিনি ভালবাসেন। তুমি তা বুঝতে পার না, কারণ, তুমি কৃষ্ণকে দেখনি, তাঁর সঙ্গে খেলাও করনি।

* * *

নেপোলিয়ন হলেন অত্যাচারী, সম্রাটরূপে—কেউ বলেছেন। কিন্তু আমি দেখেছি সাদুষ ভগবান ইউরোপের উপর দিয়ে সবেগে ধেয়ে চলেছেন।

* * *

আমি ভুলে গিয়েছি পাপ কি, পুণ্য কি। আমি শুধু দেখতে পারি ভগবানকে, জগতের মধ্যে তাঁর লীলাকে, মানুষের মধ্যে তাঁর ইচ্ছাকে।

* * *

আমি দেখলাম এক দেব-শিশু কাদায় লুটোপুটি করছে, তাকেই আবার দেখলাম তার মা ধুয়ে মুছে উজ্জ্বল করে ধরেছে—কিন্তু উভয়ত্রই শিশুর পরম নির্ম্মলতা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি।

বাসবদত্তা

[অনুবাদ]

শ্রীঅরবিন্দ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অবন্তীর রাজপ্রাসাদে একটি কক্ষ
চণ্ড মহাসেণ্ড উপবিষ্ট। গোপালক।

মহাসেণ্ড। আমার সৌভাগ্য প্রতিহত করে বৎস উদয়ন।
আমাদের সৈন্যসামন্ত এক বিলাসী বালকের কাছে পরাজিত হয়ে
ফিরে আসে।
শত্রুব্যূহের মধ্যে দিয়ে অক্লেশে সে চলে যায়,

গোপালক। রণাঙ্গণে দেখেছি আমি তাকে, দেখে মুগ্ধ হয়েছি।
তার তুলনা হাস্যকলস্বনা সুন্দরীর চন্দ্রালোক দিয়ে গড়া চরণযুগল
যাদের অপর্যাপ্ত সৌন্দর্যের আড়ালে প্রচ্ছন্ন
এক দ্রুত নৃত্যের গাঢ় ছন্দ।

মহাসেণ্ড। এই প্রত্যূষ
যদি আমাদের দ্বারে এনে উপস্থিত করে কুলক্ষণ প্রভাত,
তবে আমাদের সূর্য-সৌভাগ্যেরও ইতি।
তবু সাধের স্বপ্ন ছিল আমার।
অযোধ্যা আর কৌশাম্বী সেখানে দুই দীর্ঘ চিত্রখচিত দুয়ার ;
সিংহগতি গঙ্গা, গোদাবরী ও নর্মদা শিশিরপাতের মতো
তাদের পবিত্র জলকণা দিয়ে সিঞ্চিত করবে
আমার যতো প্রমোদ-উদ্যানের চন্দ্রিকাস্নাত যুঁথির শুভ্র বিস্তার।

গোপালক। সে-সব স্বপ্ন জীবনে সফল করে তুলবারও
উপযুক্ত মহাবীর নন আপনি ?

মহাসেণ্ড। বৎস, পৃথিবীতে একটি মহৎ কাজ সম্পন্ন হবার আগে
অনেক প্রয়াস করেছে অনেক দুঃসাহসী,
অনেকে মেনেছে পরাজয়;
কে তাই বলতে পারে যে সে-ই হবে জয়ী?
এক যুগ স্বপ্ন দেখে, অন্য যুগ পায় তারে!

গোপালক। ওই দেখুন, গিরিমালার চূড়ায় দাঁড়িয়ে রুদ্রদেব,
তাঁর ভয়ঙ্কর ত্রিশূল পূর্বদিকের প্রতি উদ্যত।
দেববৃক্ষ-স্থাপিত বিঘ্নের সারি দেখে ভীত হবেন না।
বীরাগ্রগণ্য যে, সে কেন তার অন্তরাত্মাকে অল্পের মধ্যে বেঁধে রাখবে?
করায়ত্ত করবার জন্য প্রসারিত করুন আপনার হাত,
পদদলিত করবার জন্য করুন পদক্ষেপ,
অসুরের বিক্রমে।

মহাসেণ্ড। বহু উর্ধ্বে উড়ে চলেছ এখন তুমি,
কিন্তু আগত ঝড়ের দিকে চোখ তোমার অন্ধ।

গোপালক। অবশেষে শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করতে চান
এই দারুন যুদ্ধের অবসান প্রার্থনা করে?

মহাসেণ্ড। অসম্ভব তা। বালকের পতন চাই।

গোপালক। তরুণ, মহৎ, কন্দর্পকান্তি এবং অসমসাহসী সে,
তবু তার পতন হোক।
আমরা পরাজয় গ্রহণ করব না।

মহাসেণ্ড। বৎস, কীরূপে পতন সম্ভব তার?
দেবপূজ্য রুদ্র যেমন অক্ষয়বর্মে আবৃত রেখেছেন আমার দূরদর্শী
দুর্ধার ভাগ্যদেবতাকে,
তেমনি অনেক দেবতা তার জন্মলগ্নে বর্ষণ করেছেন
সস্মিত আশীর্বাদ।

লক্ষ্মী এনেছেন সৌভাগ্যভরা দিনগুলি,
বিষ্ণু তাঁর সম্মতির জ্যোতিধারা ঢেলে দিয়েছেন আকাশ ব্যাপ্ত করে—
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মর্তের পৃষ্ঠে তাঁর বিশাল পদক্ষেপের,
যাদুকরী সরস্বতী তার করকমলে এনে ধরেছেন
নিজস্ব সৃষ্টির শতদলখানি।

গোপালক। স্নেহপ্রবণ কুলদেবতাদের চেয়ে দারুণ কঠিন দেবতারা
অনেক বেশি সাহায্য করতে সমর্থ।
তার সে-মহত্ব সাধারণ মানুষের করায়ত্ত নয়।
ক্লেশমুক্ত-গতি, জন্মসিদ্ধ ঊর্ধ্বচারী বর্ণিল বিহঙ্গ
ধরিত্রীর কাছে কাছে ফেরে।
তার অপূর্ব মুহূর্তগুলি নভোনীলিমায় আত্মবিস্মৃত সঞ্চরণে।
বৎসের অবরুদ্ধ অন্তরাত্মাকে শান্তিময় দিনগুলি
সুরা সংগীত আর নৃত্য দিয়ে ঘিরে ধরে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে,
মহৎ হবার মহান অবকাশ খুঁজে পায় না সে।

মহাসেণ্ড। সেইখানেই তো আমাদের আশা।
বৎস, খুঁজে দেখ কতো তোমার শত্রুর বিক্রম,
কতো তার ধনরত্ন এবং সৈন্যসামন্ত।
তোমার দৃষ্টি জানুক কোথায় বিপক্ষের দুর্বলতা,
তারপর তোমার হাত হানুক সেখানে আঘাত।

গোপালক। আঘাত হানবার কোনো উপায় স্থির করেছেন আপনি?

মহাসেণ্ড। করেছি, তবে শরধনুর্ধর যুদ্ধের পথের মতো মহৎ তা নয়।

গোপালক। গ্রহণ করুন সে-পথ; চলুন, সোজা যাই আমাদের লক্ষ্যে।

মহাসেণ্ড। তোমার বাহুর সাহায্য চাই।

গোপালক। এ-বাহুযুগল আপনারই আজ্ঞাধীন।

মহাসেণ্ড। এক অলংঘনীয় কৌশল উদ্ভাবন কর,
তাকে নিয়ে এস আমাদের কাছে—
রাখো উজ্জয়িনীর সোনালী কুয়ে বন্দীরূপে।
এখানে কি পাবে না সে তার হৃদয়ের বন্দীকর্ত্রী,
তার সর্বরহস্যের চাবি যে দোলাবে আপন অঞ্চলে?
তারপর আনন্দের কারাগারে
বন্দী দিনগুলি তার কেটে যাবে
সুন্দরীর পাশে পাশে—তার ভৃত্যরূপে,
আমাদেরও ভৃত্যসম।

গোপালক। ঈগলপক্ষীর নীড়ে ঈগল-শাবকের জন্য যেমন
তেমনি একে দিতে চান বাসবদত্তার কাছে তার ঈপ্সিত বস্তু বলে?
মহারাজ, পন্থা আপনার অনবদ্য।
নিদ্রিত শিশু-অজগরকে গরুড় যেমন অকস্মাৎ বিদ্ধ করে
তেমনি স্বর্গ হতে নেমে
আচম্বিতে তার অসহায় তনু তুলে নিয়ে যাব
আমাদের সুদূর সুউচ্চ চূড়ায়।
এ-কৌশল অতর্কিত, অভিনব, অভেদ্য—
কিন্তু চমৎকার।
ধরে রাখুন, ইতিমধ্যেই আঘাত হেনেছি আমি,
আর আপনার শত্রু হয়েছে বন্দী ও শৃঙ্খলিত।

মহাসেণ্ড। তোমার ক্ষিপ্রতা, তোমার লক্ষ্যনিবদ্ধ অব্যর্থ প্রবেগ আমি জানি।
একটিবার মাত্র এখানে।
আর তার সকল অনুভূতি হবে প্রেমবশ ভৃত্য
প্রতি সুন্দরের স্পর্শ পেয়ে।
তারপর আর বীর নয়,
হবে খেলাচ্ছলে ব্যস্ত বালকের প্রায়,
মদির-নয়ন, হাস্যকলোচ্ছল, বিলাসী তরুণকে আকর্ষণ করবে
যত সুধামাখা ধ্বনি, যত মনোরম দৃশ্য

এক অকৃত্রিম আনন্দে।
কঠিন লৌহশৃঙ্খলের চেয়ে দৃঢ়
আসব-সংগীত-পুষ্প ও রমণী-আননের প্রভাতী হাস্যের মৃদুল বসন্ত-রাখী
তাকে বাঁধবে কঠোরতর বন্ধনে।
তার শক্তির শেষ জানিয়ে দেবে দুটি অধরের চুম্বনচিহ্ন,
তার সকল কর্মের অধীশ্বর হবে দুই দুর্ধর্ষ জ্যোতিষ্কের মতো
দুটি নয়ন।

গোপালক। আপনার কাছে একটি মাত্র সাহায্য চাই।
মহারাজ, আপনার রাজ্য থেকে নির্বাসন দিন আমাকে।

মহাসেণ। গোপালক, বৎস, নির্বাসিত করলাম তোমাকে।
আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না করে ফিরে এসো না।

ক্রমশঃ

জগতের বর্তমান অবস্থা দেখে আর তার অনিবার্য ভবিষ্যতের কথা অনুমান ক'রে মানুষের বুদ্ধি শেষ পর্যন্ত এই রায় দিয়েছে,—এমন জগৎ সৃষ্টি করা ভগবানের ভুল কাজ হয়েছে; তাঁর কামনার ফলেই এমনতরো সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি ঘটতে পেরেছে, কামনা মানে তাঁর আত্ম-নিরূপণের, আত্মবিকাশের, আত্মসম্ভোগের কামনা; এখন আমাদের একমাত্র উচিত কাজ হলো যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর কামনার ভুলটিকে ভেঙে দেওয়া, অর্থাৎ কামনা জিনিসটাকেই একেবারে লুপ্ত ক'রে দেওয়া, যাতে তার কুফলও কিছু ঘটতে না পারে।

কিন্তু পরম প্রভু এর জবাবে বলছেন,—"একটু সবুর করো বাপু, এই বিলনান্ত নাটকের সম্পূর্ণ অভিনয় এখনও বাকি রয়েছে, আগে শেষ অঙ্কটি আসতে দাও, তখন হয়তো এ মত তোমাদের বদলে যাবে।"

শ্রীনা

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

[প্রথম পাদ—দিব্যকর্মযোগ]

৬

যজ্ঞভাবনার উদয়ন (খ)

প্রেমের কর্ম—প্রাণের কর্ম

প্রজ্ঞার সাধনা প্রেমের সাধনা আর প্রাণের বা কর্মের সাধনা—এই তিনটিতে জীবন-যজ্ঞের পূর্ণতা। আমাদের গুহাহিত চৈত্যপুরুষ সে-যজ্ঞের পুরোহিত, আর যজ্ঞেশ্বর পুরুষোত্তম তার ভোক্তা। তিনটি সাধনার মাঝে প্রজ্ঞার সাধনাকেই স্বভাবতঃ মনে হয় সবার চাইতে বড়। কেননা, তাঁর কাছে আমার আকাশবৎ প্রভাস্বর নির্মল চেতনার নৈবেদ্য যখন বয়ে আনি, তখন ভাবি এই বুঝি আমার সর্বোত্তম উপচার যার মাঝে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁরই আত্মস্বরূপের নিরঞ্জন পরমসাম্যের প্রদ্যোত। কিন্তু সমস্ত-হৃদয়-লুটিয়ে-দেওয়া যে প্রেমের নৈবেদ্য, সেও তো তার চাইতে এক তিল ছোট নয়। আমার প্রেম যে তাঁরই আনন্দের ইন্দ্রধনুচ্ছটা। আলো হয়ে তিনি আমায় জড়িয়ে ধরেন, আনন্দ হয়ে আমার জীবনবালঞ্চে ফোটান বসন্তের ফুল। সব দিয়ে যেমন তাঁকে পাই বোধিতে, তেমনি পাই হৃদয়ে। প্রশান্ত পরিব্যাপ্ত অনুভব ভালবাসায় আরও নিবিড় হয়, সত্তার অণুতে-অণুতে জাগায় রোমাঞ্চ। তিনি এসে ধরা দেন আমার সব-কিছুতে।

তখন, তাঁকে ভালবাসি বলেই সবাইকে ভালবাসি। সে-ভালবাসা আকাশের মত প্রশান্ত স্বচ্ছ এবং নির্মল। দেহ-প্রাণ-মনের বুভুক্ষা তার মাঝে নাই, আছে আত্মায়-আত্মায় যেন বিদ্যুতে-বিদ্যুতে মেশামেশি। সবার মাঝেই যে তিনি, তাই সবাই আমার আপন। সবার প্রাণেই আমার প্রাণের ঠাকুর, বাইরের মুখোস সরিয়ে ফেলে সবার মাঝেই যে দেখছি তাঁরই মুখ!

'যারে বলি ভালবাসা, তারই নাম পূজা।' ভালবাসা মাত্রেই বৃহতের আরতি। ভালবাসার পাত্র যত তুচ্ছই হ'ক না কেন, তার ভিতর দিয়েই তো আমি বৃহতের স্পর্শ পাচ্ছি, হৃদয়ের রুদ্ধ বাতায়ন খুলে গিয়ে সহসা সে অনিবার্য আকাশকে আবরণ করে আনছে আমার চেতনায়। যার ভালবাসা স্পষ্টতই পূজার রূপ ধরে উঠেছে, তার মাঝে যত খাদই থাকুক না কেন, তবুও জানতে হবে, ভালবাসার পাত্রের মাঝে অসীমের একটু-না-একটু আভাস

সে পেয়েছে বলেই আজ তার শিখা ঊর্ধ্বমুখ হয়ে জ্বলছে। পথের শেষ এখনও বহুদূরে, তবুও এই তার শুরু। কে না জানে এই পূজারতির ক্ষণে-ক্ষণে মনের আকাশে অলখের বিদ্যুৎ চমকে যায়, মাটির পুতুলের মাঝ থেকে হঠাৎ উঁকি দেয় চিন্ময়ী প্রতিমার মুখ। সব পূজাই সেই অনন্তের পূজা—হ'ক সে দেবপূজা মূর্তিপূজা বা মানুষপূজা। তাই কারও পূজার মূর্তি ভাঙতে নাই। অসীমকে মানুষ ধরতে পারে না বলেই সীমার মাঝে তাঁকে খোঁজে। এখানে ঐ খোঁজাটুকু ঐ প্রাণের আকুতিটুকুই হল বড় কথা। তাতেই মৃন্ময়ী প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, পাষাণী প্রত্যক্ষনাহেশ্বরী হয়ে দেখা দেন 'ভবতারিণী'র রূপে।

লোকোত্তর পরমভাবরূপে তাঁকে ভালবাসতে হয়, নইলে সীমার সংস্কার হতে চেতনার মুক্তি হয় না। আবার তাঁকে ভালবাসতে হয় সর্বান্তর্যামী ভূতমহেশ্বররূপে, নইলে চেতনার বৈপুল্য বাস্তব হয় না। তার পর 'মানুষীং তনুমাশ্রিতং' তাঁকেও ভালবাসতে হয়, নইলে চিন্ময়ে-মৃন্ময়ে একাকার হয়ে প্রেমের অদ্বৈত-সিদ্ধি হয় না। আঁখি আছে বলেই আমার 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে' অঙ্গ আছে বলেই 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর'। রূপের সাধনায় বন্ধনের আশঙ্কা আছে সত্য, কিন্তু একান্তভাবে অরূপের সাধনাতেও কি একদেশ-দর্শিতা নাই? বস্তুত যেমন তিনি অরূপে, তেমনি আবার রূপেও। তিনি অবিগ্রহ আর সবিগ্রহ দুইই। রূপ সত্য হয়, যখন অরূপকে সে পায় অধিষ্ঠানরূপে; আবার অরূপের উল্লাস পূর্ণ হয় রূপের স্ফূর্তিতে। রূপ হতে ভাবে, আবার ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা চলছেই—একমাত্র প্রেমই সেকথা জানে। তাঁকে ভালবেসেই জানতে পারি, তাঁর সব ভাবের মূলে যেমন এক পরমভাব, তেমনি সব রূপের মূলে এক কল্যাণতম রূপ। ভাব আর রূপ একই আবিঃ-স্বরূপের এপিঠ আর ওপিঠ।

যেমন ভালবাসি তাঁর পরমবিগ্রহকে, তেমনি ভালবাসি তার বিশ্বরূপ বিভূতিকেও। তিনি অরূপ, তিনি স্বরূপ, আবার তিনি বিশ্বরূপ। প্রেমের দৃষ্টি তো কোথাও ব্যাহত হয় না। চোখ বুজে অন্তরে যাঁকে দেখি, চোখ মেলে তাঁকেই দেখি বাইরে—দেখি সব ঘটে, দেখি সব ঘটনায়। 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।' কাকে বলব, এ তো তুমি নও! এ যে তাঁরই চোখ দিয়ে তাঁকে দেখা, তাঁরই হৃদয় দিয়ে সর্বত্র তাঁর হৃদয়ের ছোঁওয়া পাওয়া। এ-অনুভবে যেমন মুক্তির পূর্ণতা, তেমনি শক্তিরও পূর্ণতা। এ শুধু তটস্থ থেকে স্বপ্নচ্ছবির দর্শন নয়, এ তাঁর ভালবাসায় জরজর তনু-প্রাণ-মন নিয়ে বিশ্বজোড়া তাঁর রাসচক্রে ঝাঁপিয়ে পড়া। প্রেমের অনির্বচনীয় রসায়নে তখন যে বিষও অমৃত হয়ে ওঠে, বেদনাও রূপান্তরিত হয় আনন্দে। তখন 'কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়!'

* * *

কিন্তু প্রেম তো শুধু অন্তরের রসোল্লাস নয়, সে আবার সেবার মাধুরীও। সেবা হল প্রেমের কর্মরূপ। আগেই বলেছি, সেবার দুটি আদর্শ আছে—সংসার থেকে দূরে সরে গিয়ে একান্তে ঠাকুরের সেবা, আবার সংসারের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে নরনারায়ণের সেবা। আজকাল

এই শেষের আদর্শটিকেই বড় বলে প্রচার করবার একটা রীতি দাঁড়িয়ে গেছে। পূর্ণযোগের সাধক দুটি আদর্শকেই বড় বলে মানবেন ; কিন্তু তবুও তিনি বলবেন, এদের কোনটিই সেবার সর্বজনীন সহজ রূপ নয়। কর্ম জীবনের আদি-অন্ত জুড়ে আছে। সব কর্মকেই সেবাতে রূপান্তরিত করতে হবে। শুধু সচেতন ইচ্ছার প্রেরণাতেই যে আমরা কর্ম করি তা নয়—নিশ্বাস-প্রশ্বাস থেকে শুরু করে ভাবনা-চিন্তা পর্যন্ত দেহ-প্রাণ-মনের সমস্ত স্বাভাবিক স্পন্দন-গুলিও তো কর্ম। এসবই যে তাঁকে দিতে হবে। আমি বেঁচে আছি তাঁরই মাঝে তাঁরই জন্যে—জীবনের প্রতিমুহূর্তে তাঁরই আলোয় তাঁরই আনন্দে সঞ্জীবিত হয়ে। আমার জীবন-স্পন্দনে তাঁরই হৃদয়ের স্পন্দন, আমার কর্ম তাঁরই কর্ম। তাঁরই আনন্দ সুধায় নির্ঝর হয়ে আমার হৃদয়ে নেমে এসে ধরছে প্রেমের রূপ। সেই প্রেমের অভিষেকে জীবনের সকল কর্মই রূপান্তরিত হচ্ছে সেবায়। প্রবৃত্তিরূপে কর্মের উৎসও যেমন তিনি, তেমনি ফলরূপে তার সাগরসঙ্গমও তিনি। নরনারায়ণের সেবাতেও নর উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য সেই নারায়ণই।

কর্মের যা বাহ্য-পরিণাম, তার চাইতে বড় হল তার মূলে যে ভাবের প্রেরণা রয়েছে, তা-ই। ভাব যদি শুদ্ধ হয়, তবেই কর্ম সেবা হয়ে ওঠে। বলা যেতে পারে, প্রত্যেক কর্মের তিনটি অংশ আছে—একটি তার স্থূল বাস্তবরূপ, অপরটি তার প্রতীকধর্ম, আর তৃতীয়টি হল তার ভিতর দিয়ে যে-ভাবের অভিব্যক্তি ঘটছে তা-ই। ধরা যাক, ফুলচন্দন দিয়ে দেবতার অর্চনা করছি। এই অর্চনার মূল ভাবটি হল আত্মনিবেদনের দ্বারা দেবতার সঙ্গে সাযুজ্য-লাভের আকূতি। অর্চনার প্রতীকের ভিতর দিয়ে সে-আকূতিকে আমি প্রকাশ করছি। এ ছাড়া অর্চনারূপী একটা বাহ্যিক ব্যাপারও আছে। বাহ্যিক ব্যাপারটা নিরর্থক হয়ে যায়, যদি তা অন্তরের কোনও নিগূঢ় ভাবের প্রতীক না হয়।

সেবায় সমস্ত কর্মই হয়ে ওঠে ভালবাসার প্রতীক। ভালবাসায় চেতনার যে-উল্লাস, প্রতীককে আশ্রয় করে তা শোভন এবং সহজরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অর্চনার মূলেও এই কথা। দেবতাকে ভালবাসি, হৃদয়নন্দনরূপে তাঁকে অনুভব করি—তাই পুষ্প-চন্দন দিয়ে তাঁকে সাজাই, ধূপ-দীপ দিয়ে তাঁর আরতি করি। অন্তরের চারুতাকে এমনি করে বাইরের কর্ম দিয়ে রূপায়িত করি। এ-সাধনা রসের সাধনা, এর একটা একান্ত সার্থকতা আছে। যে-কোনও অর্চনাই মানুষকে সুন্দর করে তোলে, যদি তার গভীরে ভাবের উল্লাস থাকে। কিন্তু বিপদ ঘটে তখন, যখন অর্চনা প্রথানাত্র হয়ে ওঠে। তখন তার মাঝে বাহ্য-কর্মের খোলসটাই শুধু থাকে—না থাকে প্রতীকধর্ম, না থাকে ভাব। আচারসর্বস্বতা তখন চেতনার উপরে 'ভারসম চেপে থাকে আড়ষ্ট কঠিন'। এই আড়ষ্টতাকে দূর করতে হলে অর্চনার ভাবনাকে প্রসারিত করতে হবে। একটা সময়ে কোনও-একটা মন্দিরেই বাইরের উপচার দিয়ে তাঁর অর্চনা নয় শুধু, অহরহ বিশ্বমন্দিরে জীবনের উপচার দিয়ে চলবে তাঁর অর্চনা। আমার চলন-বলন ভাবনা-চিন্তা সবই ফুলের মত সুন্দর দীপের মত উজ্জ্বল চন্দনের মত সুরভি হয়ে আত্মনিবেদনের ধূপারতিতে তাঁর মাঝে মিলিয়ে যাবে। সমস্তটা জীবনই

হবে তাঁর আনন্দের আর আমার ভালবাসার প্রতীক। প্রেম আর জীবন যখন একাকার হয়ে যাবে, তখনই প্রেমের কর্ম সহজ হবে, সুন্দর হবে।

প্রেম শুধু নিষ্ক্রিয় সম্ভোগ নয়, তা সৃষ্টিধর্মীও বটে। প্রেম স্বভাবতই প্রকৃতিকে পরিশুদ্ধ করে, চিন্ময় করে, সুন্দর করে। আমার মাঝে যা প্রেম, তাঁর মাঝে তা-ই আনন্দ। আত্মারাম পুরুষের আনন্দ, আর সূর্যমুখী প্রকৃতির প্রেম—তাইতে জগৎ সুন্দর হয়েছে। আনন্দ প্রেম আর সৌন্দর্যের মাঝে একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে। পুরুষের আনন্দ প্রতিফলিত হয় প্রকৃতির প্রেমে—এক যখন দুই হন; আর সেই প্রেমের মাঝে চলে বহু-বিচিত্র জগৎকে সুন্দর করে তোলবার তপস্যা। আনন্দ ও প্রেম তাই সৃষ্টির আদিতেও, অন্তেও। মাঝখানকার এই-যে অজ্ঞান বৈষম্য আর কুশ্রীতা—এ থাকবে না। পরম-পুরুষের প্রশান্ত আনন্দের সৌরদীপ্তি অবিরাম ঝরে পড়ছে এর 'পরে, আর পরমা-প্রকৃতির মাতৃহৃদয়ের সৌন্দর্যমাধুরী একে জড়িয়ে আছে, সঞ্জীবিত করছে। সেই আনন্দ আর প্রেমই আমার জীবনের রসায়ন। আমার কর্মের মূলে উৎসর্গ-নির্মল প্রেমের প্রেরণা, আর প্রশান্ত-সুঘন আনন্দে তার অবসান।

একটা তীব্র সংবেগ নিয়ে লক্ষ্যের পানে আমরা এগিয়ে চলি যখন, তখন প্রায়শ প্রেমকে দূরে সরিয়ে রাখি, কর্মকে মনে করি পথের বাধা। অসঙ্গ বৈরাগ্যের বজ্রমুষ্টি হৃদয়কে তখন চেপে ধরে, হৃদয় কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু এটা সাধনার উদ্যোগপর্ব মাত্র। বৃহতের স্পর্শে একদিন সে-মুষ্টি শিথিল হয়, কঠিন হয় কোমল, দুরূহ হয় সহজ। অনিবার্য মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য যোগচেতনায় আনে প্রসন্নতা, আনে প্রেম—সেই পরমের প্রতি, এই জগতের প্রতি। কর্ম তখন আর জঞ্জাল নয়—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই তা সহজ, প্রজ্ঞার প্রশান্তিতে বিধৃত, আত্মসমর্পণের মাধুরীতে নন্দিত।

প্রেমে আধার-শুদ্ধি যত সহজে হয়, এমন আর-কিছুতেই নয়। প্রেম পরমা-প্রকৃতির স্বরূপশক্তি; তাই তার বীর্য অনায়াসে আধারের সর্বত্র সঞ্চারিত হতে পারে। আমরা যখন ভালবাসি, তখন দেহ-প্রাণ-মন দিয়েই ভালবাসি। সে-ভালবাসা যদি শুদ্ধ হয়, তাহলে তা আধারের সবখানিকেই শুদ্ধ করে তোলে, কোনও-কিছুকেই পাশ কাটিয়ে যায় না। আবার শূন্যে-শূন্যে প্রেম হয় না। ভালবাসতে গেলেই তার একটি পাত্র চাই, তার চিদ্‌বিলাসের একটা জগৎ চাই। সবটুকু দিয়ে সবাইকে নিয়েই তো ভালবাসা। তাঁকে যখন ভালবাসি, তখন আধারের সবটুকু দিয়ে সবাইকে নিয়েই ভালবাসি। এই প্রেমাবৃত্তির ভাব যখন সত্য-ধর্মরূপে পৃথিবীতে সংস্থাপিত হবে, তখনই সব মানুষ এক হবে, তাঁর আনন্দ-বৃন্দাবনের স্বপ্ন সফল হবে—তার আগে নয়।

প্রাকৃত-জীব তাঁকে ভালবাসে না। সে ভালবাসে নিজেকে। অথচ এই প্রাকৃত-জীবেরই গভীরে গুহাহিত হয়ে আছে যে-চৈত্যসত্তা যে-সত্যজীব, সে তাঁকে ভালবাসে। সেই কিশোরীর প্রেমই জীবের স্বধর্ম। এই নিকষিত হেমতুল্য প্রেম যতটুকু জীবনে ফোটে,

ততটুকুই তার সার্থকতা। কিন্তু কোটার কত-যে বাধা। অপরা-প্রকৃতির বাধা তো আছেই—যা কিছুতেই গতানুগতিকতার বৃত্ত আবর্তনের বাইরে যেতে চায় না, আলোকে অস্বীকার করাই যার স্বভাব। কিন্তু আলোকে স্বীকার করেও দেবতার প্রসাদ পেয়েও মোহের ঘোর কাটতে চায় না। সে-প্রসাদকে মানুষ খাটায় আত্মতর্পণের প্রয়োজনে। সাধনার ফলে আলো আসে, আনন্দ আসে, শক্তি আসে; কিন্তু সাধক আত্মসমর্পণের বিনম্র মাধুরী দিয়ে তাদের অভিনন্দিত না করে নিজের অহমিকাকে ফাঁপিয়ে তোলে তাদের দিয়ে, তাদের লাগায় অন্ধ প্রাণবাসনার পরিতর্পণে। অনেক উঁচুতে উঠেও মোহের ঘোর অনেকসময় কাটে না—এই তো বিপদ। তাছাড়া ভালবাসার মাঝে একটা তীব্র মাদকশক্তি আছে। তাকে শাসনে না রাখতে পারলে ভাববিহ্বলতার পিচ্ছিল পথে সাধক সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়তর্পণের দিকে গড়িয়ে যেতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে যায়ও। এইজন্যই প্রাচীন যোগীরা 'রসাস্বাদ'কে যোগ-বিঘ্ন বলে বর্ণনা করেছেন এবং সাধককে তার সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছেন। সোজাকথায় ভাবের সাধনায় সিদ্ধ হতে হলে ভাব চাপতে শিখতে হয়, তাহলেই তার শক্তি বাড়ে। 'অগাধ-জলসঞ্চারী বিকারী নৈব রোহিতঃ।' কিন্তু 'গণ্ডূষজলনাত্রেণ শফরী ফর্‌ফরায়তে।' অনেক ভাবুকেরই এই দশা। উত্তালতা যেমন আনন্দ নয়, তেমনি ভাবাপ্লুতার মাতলামিও প্রেম নয়। কিশোরীর প্রেম অপ্রগল্‌ভ স্নিগ্ধ অথচ প্রভাতের সৌরচ্ছটার মতই প্রোজ্জ্বলতার অধৃষ্য। রসসান্দ্রতা চৈত্যসত্তার স্বভাবধর্ম হলেও তা প্রজ্ঞা এবং ঈশনা হতে বিযুক্ত নয়—এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

সাধনা অনন্তেরই সাধনা, অনন্তকেই আমাদের পেতে হবে। অনন্তকে পেতে গিয়ে সান্তকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, একথা বলছি না; কিন্তু অনন্তকে পরিপূর্ণরূপে না জানলে সান্তের রহস্যও তো বোঝা যায় না। অবিগ্রহের তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেই তবে বিগ্রহের মাঝে তাঁর অবতরণকে পুরাপুরি আস্বাদন করা সম্ভব হয়। লোকোত্তরই লৌকিকের উৎস, একথা ভুললে বিপদ আছে। মন লৌকিকের উপর লোকোত্তরের খানিকটা আরোপ করে তাকে নবীয়ান্ করে তুলতে পারে, কিন্তু তাতেই কি লোকোত্তরের স্বরূপের পরিচয় মেলে? আগে স্বরূপজ্ঞান হওয়া চাই, তবেই আরোপ সিদ্ধ হতে পারে। তাঁকে জেনে সব জানা, তাঁকে পেয়ে সব পাওয়া, তাঁর আনন্দে সবকিছুকে নন্দিত করা—এই হল সাধনার সত্য ধারা। কবি যতই বলুন না কেন, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি আর না করি, যোগাসনে কিন্তু সবাইকে বসতে হবে, মনের উজান ঠেলে অতিমানসের দিকে অভিযান চালাতেই হবে। নইলে দৃশ্যে-গন্ধে-গানে প্রাকৃত-মনের আনন্দটুকুই ফিরে পাব, তাঁর আনন্দকে নয়।

যে-আনন্দ তাঁর আনন্দ, যে-প্রেম তাঁর আদিত্যহৃদয়ের হিরণ্যচ্ছটা, অতিমানস বিজ্ঞান-ভূমিতেই তা নিরূঢ়। আগেই বলেছি, যোগিচিত্তের ভালবাসাই সত্যকার ভালবাসা। তাতে তামসিক মূঢ়তা নাই, রাজসিক ক্ষিপ্ততা নাই, সত্ত্বের বিক্ষেপও নাই। অথচ শুদ্ধসত্ত্বের রসোল্লাস তাতে আছে। একাগ্রভূমিক প্রভাস্বর ধ্যানচিত্ত তার প্রতিষ্ঠা, নিরোধের

সুনীল শূন্যতা তার পটভূমিকা। সে-প্রেম অবন্ধন থেকেই অদৃশ্য বাহুবন্ধনে সবাইকে হৃদয়ে বাঁধে, সমস্ত সম্বন্ধের অতীত থেকেই বিচিত্র সম্বন্ধের পরিবেষ্টনীতে ধরা দেয় সবার মাঝে, অক্ষরের অতল নৈঃশব্দ্য হতে হৃদয়ে-হৃদয়ে ঝঙ্কৃত করে চলে অশ্রুত সুরের গুঞ্জন। সে-প্রেম অরূপকে দেয় রূপ, রূপের ঘটায় রূপান্তর। তার দৃষ্টিসৃষ্টির বীর্য বহুর অন্তরে ঘোলায় একেরই হোমশিখা। বিশ্ব আর বিশ্বাতীতের মাঝে সে প্রেম হলাদিনীর সেতু।

* * *

জীবন-যজ্ঞানলের দুটি শিখার কথা বলা হল—প্রজ্ঞার শিখা আর প্রেমের শিখা। এইবার প্রাণের শিখার কথা বলি।

প্রজ্ঞার কারবার ভাব নিয়ে। প্রেম বস্তুকে আশ্রয় করলেও ভাবই তার স্বরূপ—বস্তু আর ভাবের মাঝে সে যোগসূত্র। কিন্তু প্রাণের কারবার বস্তুকে নিয়ে, যার উপরে জীবনের ভিত্তি। জীবন যেন একটা বনস্পতির মত। তার চূড়ায়-চূড়ায় প্রজ্ঞার আলোঝলমল আকাশে ফুটছে প্রেমের বিচিত্র ফুল। কিন্তু প্রাণ সেই বনস্পতির কাণ্ড শাখা-প্রশাখা পল্লব; গুহাসঞ্চারী অগুনতি শিকড় দিয়ে মাটির বুক থেকে সে রস টানছে, পত্রপুট দিয়ে আলোবাতাস হতে শক্তি আহরণ করছে। সে ফুল নয়, কিন্তু সে না থাকলে ফুলও তো ফুটত না।

অধ্যাত্মসাধকের যত বিপদ এই প্রাণকে নিয়ে। মাটিঘেঁষা বলেই প্রজ্ঞা আর প্রেমের নির্মলতার মাঝে মালিন্য ছড়ায় সে-ই। মানুষ আকাশে উড়তে চায়; কিন্তু নাধ্যাকর্ষণের টানে প্রাণ তাকে আবার মাটিতে নামিয়ে আনে। তাই বৈরাগী বলেন, ওর সঙ্গে অসহযোগ কর, নইলে আর উপায় নাই। অনুরাগী বলেন, কিছুদিন ওকে সইতে রাজি আছি; কিন্তু চিরকাল ওর বোঝা বইতে আমি পারব না, একদিন ওকে ছেড়ে যেতেই হবে।

প্রাণের বাধা যে আছে, একথা অস্বীকার করে লাভ নাই। দেহের জড়ত্ব, বাসনার উত্তালতা, মনের বিক্ষেপ—এগুলি কার মাঝে নাই? এই নিয়েই তো ব্যক্তির জীবন, সমাজের জীবন। অভাবনীয়ের 'ক্বচিৎ-কিরণে' মন যদিই-বা দীপ্ত হয়, সে-দীপ্তির কতক্ষণ আয়ু? আবার আসে চাঞ্চল্য, নামে অবসাদ। এই আবর্তন চলছে জীবনভোর। এ যেন সেই কুকুরের লেজ—যতই তাকে সিধা করে ধরে রাখ না কেন, ছেড়ে দিলেই যেই-কে-সেই। তবে আর মিছামিছি ও-চেষ্টায় গলদঘর্ম হওয়া কেন? লেজটা যদি কেটে ফেলা যায়, তাহলেই তো আপদ কাটে।

কিন্তু এসবই হল রাগের কথা, ঝামেলা যে সইতে নারাজ তার কথা। একথা মনে রাখতে হবে, বাধাটা জীবনে কেবল লোকসানই নয়, তার একটা লাভের দিকও আছে। বাধার সঙ্গে লড়তে গিয়ে শক্তি বাড়ে, জীবনের দাম বাড়ে। আর সে-শক্তির যোগান আসে ঐ প্রাণ থেকেই। প্রাণের মাঝেই প্রাণের সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। তার জন্য তার স্বরূপের জ্ঞান হওয়া দরকার। প্রাণ যখন বিশ্বব্যাপারের অঙ্গীভূত, তখন কোথাও-না-

কোথাও তার একটা সার্থকতা আছেই। যদি তার স্বরূপের সন্ধান পাই, তাহলে তার সার্থকতারও সন্ধান পাব।

প্রাণের স্বরূপ হল শক্তি। শক্তি নিজে ভালও নয়, মন্দও নয়—তাকে ভাল বা মন্দ বলি লক্ষ্যের বিচারে। ভাল কাজে যদি শক্তির প্রয়োগ করি তাহলে সে ভাল ; মন্দ কাজে প্রয়োগ করলে মন্দ। যে-শক্তি মানুষকে নামায়, সেই শক্তিই আবার তাকে উপরের দিকে টেনে তোলে। তান্ত্রিক বলেন, যে-মা বাঁধেন, সেই মা-ই আবার বাঁধন খোলেন। বন্ধন থেকে মুক্তির দিকে চেতনার অভিযান চলছে—এই হল বিশ্বলীলার তাৎপর্য। এর সমস্তটাই শক্তির ব্যাপার, কি না প্রাণের ব্যাপার। অজ্ঞানে বন্ধন, জ্ঞানে মুক্তি ; স্বার্থপরতায় বন্ধন, পরার্থপরতায় বা প্রেমে মুক্তি। প্রাণই সেই মুক্তি আনে। প্রাকৃতভূমিতে দেখছি, প্রাণ আমাদের বন্ধনের জালে জড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু এটা সাময়িকভাবেই সত্য, নিত্যসত্য নয়। জড় হতে চেতনার উন্মেষের কতকগুলি ধাপ আছে—তার একটা ধাপে বন্ধন থাকবেই। আসক্তিই বন্ধন। কিন্তু চেতনাকে একটা ধাপে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে আসক্তিরও তো দরকার হয়। শাস্ত্রে তাকে বলে অভিনিবেশ। অভিনিবেশে একটা অন্ধতা আছে সত্য, কিন্তু তার মধ্যে নিজের ঘর গুছিয়ে নেবার একটা তাগিদও আছে। গোছানোর কাজ শেষ হলেই প্রাণ বলে, আর নয়, এইবার বেরিয়ে পড় নতুন প্রতিষ্ঠার খোঁজে। এমনি করে প্রাণের শক্তিতেই জীবচেতনা ধাপে-ধাপে এগিয়ে চলেছে। এই এগিয়ে চলার শক্তিটাই হল প্রাণের আসল শক্তি।

এগিয়ে চলার দুটা ধারা হতে পারে। এক, চেতনাকে বিবিক্ত অন্তর্মুখ সূক্ষ্ম এবং একাগ্র করে এগিয়ে চলা। স্বভাবতই জগৎ তখন আমাদের হিসাব থেকে বাদ পড়ে। আরেকটা ধারা হল, চেতনাকে সমস্ত অবরোধ থেকে মুক্ত করে আকাশ-জোড়া আলোর মত সবার উপরে ছড়িয়ে দেওয়া। জগৎ তখন বাদ পড়ে না। দুটি ধারাকে মিলিয়ে নিতে পারলে সাধনা পূর্ণাঙ্গ হয়। বস্তুর মূলে ভাব ; অন্তরে ডুবি সেই ভাবকে ধরবার জন্য। কিন্তু ভাবকে পেয়ে যদি সেখানেই থেকে যাই, তাহলে পাওয়া পূর্ণ বা সুপ্রতিষ্ঠিত হল না। ঘুম থেকে জেগে ওঠার মত সমাধির পর ব্যুত্থান স্বভাবের নিয়মেই হয়। ঘুমের বিশ্রান্ত এবং তৃপ্তি যেমন জাগরণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, তাকে সমর্থ করে, তেমনি সমাধির প্রশান্তিও ব্যুত্থানের মাঝে আলো আনন্দ আর বীর্যের সঞ্চার করতে পারে। বারবার এমনিতর সমাধিজ-শক্তির অভিষেকে ব্যুত্থানও ক্রমে সমাধিধর্মা হয়ে ওঠে। তাকেই গীতায় বলা হয়েছে স্থিতপ্রজ্ঞের জাগ্রৎ-সমাধি। সহজীয়ারা বলেন সহজ সমাধি। প্রজ্ঞা আর প্রেমের বীর্য তখন প্রাণকেও জাগ্রত করে। পুরুষোত্তমকে তখন পাই শুধু অন্তরে নয়, বাইরেও। দেখি, তিনিই সব-কিছু হয়েছেন। অন্তরের গহনে তিনি সুপ্তিনিথর শান্তির পারাবার, ভাবলোকে আলোয় উচ্ছল, বহির্লোকে বিচিত্র শক্তিস্পন্দে স্পন্দিত। এই প্রাণস্পন্দটুকু বাদ দিয়ে তাঁকে পাওয়া পূর্ণ হয় না। বহির্মুখ চেতনার অশুদ্ধ প্রাণের প্রমত্ততা—এও যেমন

উপাদেয় নয়, তেমনি অন্তর্মুখ চেতনার নিরালোক গহনে বা প্রভাস্বর লোকে প্রাণের স্তুতনকে একনাত্র সত্য বলে জানা—একেও তো উপাদেয় বলতে পারি না। শিবের তপোবীর্যে শক্তি শুদ্ধ হবে, আর সেই পরিশুদ্ধ শক্তির সঙ্গে ঘটবে শিবের সাযুজ্য—তবেই জীবনে আসবে সিদ্ধির পূর্ণতা।

প্রজ্ঞা প্রেম আর প্রাণের সাধনা চলবে অঙ্গাঙ্গী হয়ে, কেননা জীবনেও তারা অঙ্গাঙ্গী হয়েই আছে। প্রজ্ঞা আর প্রেম নিঃসন্দেহে মানুষের পরম পুরুষার্থ; কিন্তু শক্তিও কি তার পুরুষার্থ নয়? শক্তির অপপ্রয়োগ সম্ভব বলেই কি আমরা শক্তির সাধনা করব না? আসুরিক শক্তি অন্ধ নিষ্করুণ প্রমত্ত। কিন্তু দেবতার শক্তি তার উপর বিজয়ী হোক—এই নিগূঢ় অনুভূতিই কি চিরকাল ধরে মানুষের প্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত করে আসছে না? প্রজ্ঞা আর প্রেমকে শক্তির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তুরীয়চেতনার নিরাপদ লোকে প্রতিষ্ঠিত করলেই কি তাদের চরম সার্থকতা? রূপান্তর ঘটানোর যুযুৎসু বীর্য হতে কি তারা বঞ্চিত? বুদ্ধের প্রজ্ঞা আর গৌরাঙ্গের প্রেম কি জগতের মূঢ় আত্মরতিপরায়ণ চেতনায় বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে চায়নি? ব্রহ্ম যেমন চিৎস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ, তেমনি তিনি শক্তিস্বরূপও। বিসৃষ্টির ধারা ধরে তাঁর শক্তি যেমন চিৎ হতে জড় পর্যন্ত নেমে এসেছে, তেমনি আবার চিৎস্ফুরণের প্রবেগে জড় হতে উত্তরায়ণের ধারা ধরে উজিয়েও চলেছে। এই উত্তরায়ণই দিব্যকর্ম এবং প্রাণের তপস্যা। প্রজ্ঞা আর প্রেমেরও তা-ই স্বধর্ম। প্রজ্ঞা প্রেম আর প্রাণ—এ তিনের মাঝে মৌলিক কোনও বিরোধ নাই।

প্রাণের উদয়নে সঙ্কট দেখা দেয় কামনা হতে। কামনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ক্ষুদ্র অহন্তা। সে চায় আত্মতর্পণ, আত্মোৎসর্গ নয়। যজ্ঞভাবনা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ধর্ম-কর্মই বল আর জগৎসেবাই বল, আমাদের সব-কিছুর মূলে সূক্ষ্মভাবে রয়ে গেছে অহমিকার তর্পণ। সঙ্কীর্ণ অহং যে শুধু বৃহতের উদার স্পর্শ হতেই বঞ্চিত তা নয়, সে-ই জগৎজোড়া যত বিরোধ আর সঙ্ঘর্ষের মূল। এই অহংকে বলতে পারি কামপুরুষ। জীবন যতক্ষণ তার শাসন মেনে চলবে, ততক্ষণ কোথাও সোয়াস্তি নাই। কিন্তু মানুষ তা বুঝতে পারে না—এই তার দুর্ভাগ্য। অথচ এই কামপুরুষেরই আড়ালে রয়েছেন চৈত্যপুরুষ—যাঁকে বলতে পারি বৃহতের একটি কলা। তিনিই দিব্যপ্রাণ, পরমপুরুষের দিব্যসঙ্কল্পের বাহন তিনি। কলায়-কলায় এই চিন্ময়-প্রাণের উপচয়ই আমাদের জীবনের পরম তাৎপর্য। সে-উপচয় ঘটে বৃহতের সঙ্গে যোগযুক্ত আত্মনিবেদনে, 'অসীম আমার সব ছেয়ে আছেন, আমার জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে তাঁরই ইচ্ছা তরঙ্গিত হয়ে চলেছে'—এই পরম আশ্বাসে এবং অকুণ্ঠ প্রত্যয়ে। যে-আমি তাঁরই চিৎকণ তাঁরই স্ফুলিঙ্গ, সেই আমিই সত্যকার আমি। তার উপচয় তাঁরই চেতনার আনন্দের এবং শক্তির উপচয়। আর এই উপচয়েই প্রাণের সার্থকতা। আমার কামনা (Desire) রূপান্তরিত হবে তাঁর সঙ্কল্পে (Will), আমি সম্পূর্ণভাবে তাঁর হব, তবেই জীবন হবে সর্বতোভদ্র এবং শতচ্ছন্দ। জীবনের এই দিব্য-রূপান্তরই প্রাণের কর্ম—যা অখণ্ড যজ্ঞভাবনার তৃতীয় পর্ব।

*

জীবনের উচ্ছেদ নয়, তার দিব্যরূপান্তরই হল পূর্ণযোগের লক্ষ্য। এই রূপান্তর-সিদ্ধির তিনটি শর্ত। প্রথমেই চাই, জীবনের নিয়ন্তা হ'ক আমার কামনা নয়, তাঁর সঙ্কল্প। আমার আধারে ওহাহিত চৈত্যপুরুষকেই জীবনের পুরোধা করতে হবে—এই হল দ্বিতীয় শর্ত। চৈত্যপুরুষ হবেন আমার প্রাণ-মনের দিশারী। আমার ঘুনাচ্ছন্ন প্রমত্ত অহং এই চৈত্যপুরুষকে এখন আড়াল করে রেখেছে। অতএব ভাবনায় বেদনায় কর্মে অহংবুদ্ধির সম্পূর্ণ নিরাকরণ হল সিদ্ধির তৃতীয় শর্ত। আমি গেলে তবে তিনি আসবেন। আর এই তিনিই তো আমার সত্যকার আমি।

প্রথম শর্তটি আমাদের সুপরিচিত। সমস্ত অধ্যাত্মসাধনারই এটি হল আসল বনিয়াদ। গীতায় আছে, কর্ম করবে কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা করবে না, তবেই কামনার উচ্ছেদ সহজ হবে। আর আছে সমত্বের উপদেশ—সুখ-দুঃখ শুভাশুভ জয়-পরাজয় সব-কিছুতেই সমভাব, ছোট-বড় শত্রু-মিত্র সবার প্রতি সমদৃষ্টি। আগেই বলেছি, এ-সমত্ব শুধু তিতিক্ষা বা ঔদাসীন্য নয়। এ হচ্ছে জীবনের গভীরে জগতের পিছনে এমন-একটা শাশ্বত অবিচল বৃহৎ সত্তাকে আবিষ্কার করা, যার নৈস্পন্দ্য হতেই এই প্রাণস্পন্দের বিচ্ছুরণ—প্রশান্ত আকাশের গভীর হতে আলোর প্রচ্ছটার মত। এই বৃহতের কামনা নাই, আছে সঙ্কল্প; কেননা কামনা হল অজ্ঞান এবং অশক্তির ধর্ম, আর সঙ্কল্প হল অবদ্ধ্য আত্মশক্তির অভিক্ষেপ। এই বৃহতের সঙ্কল্পকে যখন জীবনে রূপ ধরতে দেখি, তখন আর আমার কামনা থাকে না। তখন কর্ম হয় প্রাকৃত-অহংএর কামসঙ্কল্পের প্ররোচনায় নয়, দিব্যপুরুষের সত্যসঙ্কল্পের প্রেরণায়। আমি তখন একদিকে অকর্তা, আরেকদিকে তাঁর নিমিত্তমাত্র। আমি অকাম এবং সর্বত্র সমদর্শন, তাই অকর্তা। আমার সেই শূন্যতায় জ্বলে ওঠে তাঁরই চিৎশক্তির সৌরদীপ্তি, ধরে আমার প্রভাস্বর প্রাণময়পুরুষের রূপ। সেই পুরুষই তাঁর নিমিত্ত।

এই প্রাণময়পুরুষের প্রোজ্জ্বল চেতনাকে আশ্রয় করে আধারে ঘটে চৈত্যপুরুষের আবির্ভাব। প্রাণময়পুরুষ নিমিত্ত, কিন্তু চৈত্যপুরুষ দিশারী—যদিও চরম দেশনার ভার তাঁর হাতে নাই। তিনি দিশারী—পরমপুরুষের প্রতিভূরূপে। ধ্রুবজ্যোতির ইশারায় চেতনাকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে আসাই তাঁর কাজ। তাঁর আবেশে জীবন হয় সত্যসন্ধ। প্রাণকে তখন হাতড়ে-হাতড়ে পথ চলতে হয় না, অব্যভিচারী সত্যের অমোঘ প্রেরণায় তখন তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ হয় নিয়ন্ত্রিত। চিত্তে আর তখন সংশয়ের ঘোর থাকে না, কর্মে থাকে না দ্বিধা। বস্তুর স্বরূপজ্ঞানের জন্য বুদ্ধিকে তখন আর অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয় না, বোধিজাত আন্তর-প্রত্যক্ষ তখন বাহ্য-প্রত্যক্ষের মতই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আত্মপ্রকৃতি তখন হয় মনস্তের আহ্বানে জ্যোতিরাভিসারিণী, প্রতি মুহূর্তে আত্মোৎসর্গের মাধুরীতে সুনন্দিতা।

এই হল সাধনার দ্বিতীয় পর্ব। তারপর চৈত্যপুরুষের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে আধার যখন শুদ্ধসত্ত্ব হয়, তখন তাতে ঘটে দিব্যপুরুষের আবির্ভাব। তখন আর চাওয়া

থাকে না, থাকে অনিঃশেষে শুধু পাওয়া। তখন আর আমার সাধনা নয়, তাঁর সিদ্ধির অনায়াস উন্মেষ। আমার 'এতদিনের আকাশ চাওয়া' তখন বিগলিত হয়ে যায় পলে-পলে যুগে-যুগে তাঁরই হওয়ার অফুরন্ত উল্লাসে। আমার সবটুকুই তখন তিনি। এই হল তৃতীয় পর্ব।

কামনার উচ্ছেদ, সত্ত্ব, প্রাণপুরুষের উদয়ন, চৈত্যপুরুষের অনুশাসন এবং দিব্যপুরুষের আবেশ—এই ক্রম ধরে জীবনের দিব্য রূপান্তর ঘটে। কিন্তু এ-ক্রম সবসময় বজায় থাকে না, কেননা মানুষের স্বভাব সংস্কার এবং অধিকার বিচিত্র। এমনও হতে পারে, আধারের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ না হতেই সাধকের তীব্রসংবেগের ফলে দিব্যপুরুষের আবেশ চকিতের মত নেমে এল। এল কিন্তু থাকল না, বিদ্যুল্লেখার মত নিমেষেই আবার সে মিলিয়ে গেল। তারপর শুরু হল 'বিষাদ্বৃতে একত্র করিয়া' অন্তররবণনের দীর্ঘ পর্ব। এই দিন এই রাত, এই তিনি সামনে এই তিনি আড়ালে, এই অনায়াস অনুভবের আশ্বাস এই আবার গুপ্তশত্রুর অতর্কিত অভিঘাত —এ-নাগরদোলার যেন আর বিরাম রইল না। সাধককে তখন ধৈর্য ধরে থাকতে হয়। 'একবার চকিতের দেখা যাঁর পেয়েছি, জীবন ভরে তাঁকে একদিন পাবই'—এই গভীর প্রত্যয় নিয়ে অতন্দ্র থাকতে হয়। যোগীরা বলেন, দীর্ঘকাল নিরন্তর সংস্কারের ফলে যোগ দৃঢ়ভূমি হয়। বাধা তো থাকবেই। এমন-কি চারদিক গুছিয়ে নিয়ে ক্রম অনুসারে যে সাধনা করছে, তারও পথের বাধা কি কিছু কম? কিন্তু তাবলে হাল ছাড়তে নাই। 'নিশ্চয়েন যোক্তব্যোঽনির্বিণ্ণেন চেতসা।'—দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে মননরত ভাবকে একদম আমল না দিয়ে সাধনা করে যেতে হবে। জানি, মা আমার সহায়, সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, হতাশা আমারই মনের মায়া। চারদিক অন্ধকার ভাবলেই অন্ধকার, আর আলো ভাবলেই আলো।

নিজেকে জানা জগৎকে জানা আর ব্রহ্মকে জানা—এই নিয়ে জানার পূর্ণতা। আর জগৎকে জানা বা ব্রহ্মকে জানা সত্য হয় নিজের জানার ভিতর দিয়েই। সেই নিজেকে আমরা কতটুকু জানি? বলতে গেলে কিছুই নয়। যতক্ষণ জেগে আছি ততক্ষণই আমাদের জানাজানির কারবার। কিন্তু সে-জানাও তো একটা উপর-ভাসা জানা মাত্র। কথায় বলে, 'পরচিত্ত অন্ধকার।' কিন্তু নিজের চিত্তও কি তা-ই নয়? বাইরের জগতের নাড়া খেয়ে সাড়া দিয়ে চলেছি, সাড়া দিতে গিয়ে বাইরেই ছিটকে পড়ছি, নিজের ভিতরের দিকে তাকাচ্ছি কোথায়? যদি তাকাতাম, তাহলে দেখতে পেতাম, যাকে আমরা জাগ্রৎ-চেতনা বলি, সে আমাদের সমষ্টি-চৈতন্যের একটা ভগ্নাংশ মাত্র। উত্তর-সমুদ্রে বরফের পাহাড় ভেসে চলে। তার চূড়াটুকুই জলের উপর জেগে থাকে, জলের তলায় থাকে এক বিশাল বিস্তার। আমাদেরও তেমনি চেতনার নীচে আছে অবচেতনা (subconscious), আর অধি-চেতনা (subliminal consciousness), যাদের কোনও খবরই আমরা রাখি না। অথচ তাদের অলঙ্ঘ্য শাসনেই আমাদের বাইরের চেতনা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অবচেতনা থেকে জাগছে বাসনা, স্মৃতি আর সংস্কার তলিয়ে যাচ্ছে ওরই অতলে, আবার

স্থান থেকে নতুন বাসনা হয়ে উপরে উঠে আসছে। তখানে কি করে যে কি হচ্ছে, তার কোনও খবর কি আমরা রাখি? অবচেতনার তলায় রয়েছে অধিচেতনার বিশাল বিস্তার, যার মাধ্যমে বিশ্বের সঙ্গে আমার যোগাযোগ। সেখানে শুধু ইহজন্মের বা ইহলোকের নয়,—জন্মজন্মান্তরের লোক-লোকান্তরের বাসনা সংস্কার আর শক্তির খেলা চলছে। আমার বাইরের চেতনা তার কোনও খবরই রাখে না, অথচ অন্তশ্চেতনার সঙ্গে রয়েছে তার অপরোক্ষ যোগ। অবচেতনাকে জানলে যেমন ব্যষ্টিপ্রকৃতির মূলকে জানা যায়, এই অধি-চেতনাকে জানলেও তেমনি জানা যায় বিশ্বপ্রকৃতির মূলকে। অধিচেতনার ভিতর দিয়েই বিশ্বচেতনায় পৌঁছবার পথ। কিন্তু এতেই জানা শেষ হয় না। বরফের পাহাড়ের নীচে সমুদ্র, উপরে আকাশ—অথবা তাকে ঘিরে উপরে-নীচে আকাশবৎ অনন্তের বিস্তার। ঐ-আকাশকেও জানতে হবে। আকাশ হল অতিচেতনা (superconscient)—মানসোত্তর চিৎশক্তিস্রাজির যা স্বভাব। অতিচেতনার তুঙ্গতা হতে অধিচেতনার ব্যাপ্তি আর অবচেতনার গহনতম দেশ পর্যন্ত যখন আত্মচৈতন্যের দীপ্তি প্রসারিত হবে, তখনই আমাদের জানা পূর্ণ হবে।

পুরুষের এই অখণ্ড সম্যক্-জ্ঞানেই (integral knowledge) প্রকৃতির শক্তির মুক্তি ঘটে। এখন আমাদের চেতনা দেহনির্ভর, আর তা দিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাইরের জগতে নিতান্ত উপরভাসারকমে নিজেকে যতটুকু জানছি। এ-জানায় আত্মশক্তি আর কতটুকু ছাড়া পাচ্ছে? কিন্তু এই জানাকেই গভীর বিপুল এবং উদ্ভুঙ্গ করতে হবে। মহাশক্তি তখন লাগবেন অবরুদ্ধ চেতনার চারদিককার দেয়াল ভাঙার কাজে। প্রথমেই তিনি ভাঙবেন দেহের দেয়াল। এখন দেহের মাঝে চৈতন্য বন্দী হয়ে আছে—যেন মাটির হাঁড়িতে প্রদীপের মত। তার আলো বাইরে ছড়াতে পারছে না। দেহের বাইরে যে-জগৎ, সেটা আমাদের কাছে অনাত্মজগৎ। সে চিরকাল আমাদের বাইরেই পড়ে থাকে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ দিয়েও তাকে আমরা আপন করে নিতে পারি না। কিন্তু হাঁড়ির দেয়ালটা যদি ক্রমে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে? যদি সেটা মাটি থেকে কাচ হয়, এমন-কি কাচ থেকে আলো হয়ে যায়? তাহলে বাইরের আলো আর ভিতরের আলোয় কোনও ব্যবধান থাকে না। ভাণ্ডের বিজ্ঞান তখন পরিণত হয় ব্রহ্মাণ্ডের বিজ্ঞানে। বৈজ্ঞানিক আজ যেমন জড়শক্তি নিয়ে খেলা করছেন, যোগী তখন বিশ্বশক্তি নিয়ে তেমনি খেলা করতে পারেন। বিশ্বশক্তি স্বরূপত চিৎশক্তি—তারই অভিব্যক্তি মনঃশক্তি প্রাণশক্তি এবং জড়শক্তিতে। তিনটি শক্তি সম্পুটিত হয়ে আছে জীবশক্তিতে। যোগীর কারবার এই জীবশক্তিকে নিয়ে। তাই জড়কে তিনি জড়রূপেই শুধু দেখেন না, দেখেন চেতনার বাহনরূপে। সুতরাং জড়শক্তির উপর তিনি কাজ করেন আত্মচৈতন্যের আবেশ দিয়ে। এইখানেই বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তাঁর তফাত। যোগীর বেলায় শক্তির কাজ চলে বিশ্বচৈতন্যকে আশ্রয় করে বিশ্বমন ও বিশ্বপ্রাণের ভিতর দিয়ে বিশ্বজড়ের উপর, যাতে জড়ও ক্রমে স্বচ্ছ হয়ে তার অন্তর্গূঢ় চৈতন্যের স্ফুরণের আধার হতে

পারে। আত্মগত ধাতুপ্রসাদ (transparency of substance) বিশ্বগত ধাতু-প্রসাদের প্রযোজক হবে, যেমন কাঠের একটা অংশে আগুন ধরলে পরে সে-আগুন ক্রমে সমস্ত কাঠটায় ছড়িয়ে পড়ে তেমনি করে—এই হল যোগীর সাধনা।

এ-সাধনা সিদ্ধ হতে পারে অতিমানস শক্তির অবতরণে এবং আবেশে। সে-আবেশ হবে শুধু মনে এবং প্রাণে নয়—জড়েও, শুধু ব্যক্তিতে নয়—বিশ্বেও। ঐ কাঠের উপমা দিয়েই বলা চলে, আগুন ধরতে পারে কাঠটার উপরে-উপরে, একেবারে তার বহুভায় প্রবেশ নাও করতে পারে; কিংবা কাঠের একটা অংশই আগুন হয়ে উঠল, বাকিটা তাতল তবু জ্বলল না। কিন্তু আগুনের যদি জোর থাকে, তাহলে কাঠটা আগাগোড়া একেবারে ভিতর পর্যন্ত আগুন হয়ে উঠবে। এই জোর হল প্রাণের জোর। চিৎশক্তিকে বিশ্বজড় পর্যন্ত সমাবিষ্ট করাই হল প্রাণের কর্ম। জড় এবং চৈতন্যের মাঝে প্রাণ সেতু বলেই তা সম্ভব।

* * *

দিব্যজীবনের উপযোগী ক্রিয়াযোগের মূলসূত্রগুলি কি, তা দেখলাম। এখন যোগের সঙ্গে জীবনের কি সম্পর্ক, সেকথা আবার খতিয়ে দেখতে পারি।

স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, বাইরের জীবনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে কেবল অন্তরে তলিয়ে থাকা পূর্ণযোগের লক্ষ্য নয়। তবে সাময়িকভাবে এমনতর তলিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনও যে কখনও হতে পারে, সেকথাও অস্বীকার করা হচ্ছে না। কিন্তু তলিয়ে যাওয়াটা উপায়ই, লক্ষ্য নয়।

কর্ম যোগযুক্ত হলে হয় সেবা। কিন্তু শুধু দেবসেবা বা জনসেবাই যে যোগীর কর্তব্য, তা নয়। সব কর্মের ভিতর দিয়েই ভগবৎসেবা করে যেতে হবে—এই হল যোগীর আদর্শ। কোন্ কর্ম হেয় আর কোন্ কর্ম উপাদেয়—তার নির্দেশ পাব অন্তর্যামীর কাছ থেকে, মানুষের কাছ থেকে নয়। আমার কোনও আসক্তি থাকবে না—এই হল আসল কথা। আমি সবই করতে পারি, আবার কিছু না-ও করতে পারি: তিনি যেমন করান, আমি তা-ই করি।

তারপর, যোগের পথে কোনও রফা চলবে না। জীবনের খানিকটা আধ্যাত্মিক হবে আর খানিকটা হবে লৌকিক—এ হলে হয় না। বর্ষচোরা আমের উপমাটাও এক্ষেত্রে অচল। ভিতরে যদি রসের পরিপাক হয়ে থাকে তো খোসা পর্যন্ত তার আভা ফেটে বেরবে। সমস্তটা জীবন নিয়েই যোগ, আর সে-যোগ রূপান্তরের যোগ—এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

দুটি দিকে খেয়াল থাকা চাই। অহংকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই চলবে না। সে চায় প্রাণবাসনার তর্পণ, আর তার জন্য মনবুদ্ধিকে দাঁড় করিয়ে দেয় তার উকিল করে। এইখানে হুঁশিয়ার হতে হবে। সব চাওয়া শেষ করে দিতে হবে। সব ছাড়লেই তবে সব পাওয়া যায়—এই হল সত্য।

আর, ডুবতে হবে নিজের গভীরে 'আমি কান পেতে রই আপন হৃদয়-গহনদ্বারে।' সেইখানে শুনি তাঁর বাণী, আর তারই আলোতে পথ চলি। বাণী আসে অগম শূন্য হতে, যেখানে আমার চাওয়া-পাওয়ার সমাধি। তাই তার আলোও রংচুট।

[ক্রমশঃ]

পৃথিবীর যা দুর্দশা আর এই যে-অবস্থা থেকে তার মুক্তি নেই মনে হয় তা দেখে মানুষী বুদ্ধি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করে বসে—এই বিশ্ব ভগবানের একটা ভুল, এই প্রকাশ বা সৃষ্টি নিশ্চয় একটা বাসনার ফল—আত্মপ্রকাশ, আত্মোপলব্ধি, আত্মরতি কামনার ফল। তাই যদি হয় তবে একমাত্র কর্ত্তব্য দাঁড়ায় যত শীঘ্র সম্ভব এই ভুলের শেষ করা—বাসনা ও তার দারুণ পরিণামের শেষ।

কিন্তু পরমেশ্বর উত্তর দিলেন যে মিলনাত্মক নাটকের এই শেষ নয়। তিনি বললেন, "শেষ অঙ্ক পর্যন্ত অপেক্ষা কর, পরে মত বদলাতে হবে তোমার।"

শ্রীমা

*

এই ভ্রান্তি-গ্রস্থ মানুষের গোষ্ঠী সর্ব্বদা স্বপ্ন দেখে যে শাসনব্যবস্থার, সমাজের যন্ত্রপাতি দিয়ে তার পারিপার্শ্বিককে সে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তুলবে। কিন্তু অন্তঃস্থ চৈত্যপুরুষের সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্যই বাহিরের পারিপার্শ্বিককে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে পারে। ভিতরে তুমি যা, বাহিরে তুমি তাই ভোগ করবে—কোন যন্ত্রপাতি তোমাকে তোমার অন্তঃসত্তার ধর্ম্ম হতে উদ্ধার করতে পারে না।

শ্রীঅরবিন্দ

প্রাণের সন্ধানে জগদীশচন্দ্র বসু

শ্রীঅরবিন্দ

শ্বাস-প্রশ্বাস হৃৎস্পন্দন ইত্যাদিকে প্রাণলীলার সঙ্গে অবিচ্ছেদে জড়িত বলে জানি আমরা ; অথচ এসব ক্রিয়াকে সাময়িক স্তম্ভিত রেখেও মানুষ এই দেহেই বাঁচতে পারে, এবং তাও পুরোপুরি সজ্ঞানে—এরও তো চাক্ষুষ প্রমাণ আছে। এমন-কি, উদ্ভিদের মাঝে পশুর মত চেতনার সাড়া আজও প্রত্যক্ষগোচর না হলেও তাদের শারীরক্রিয়া যে আমাদেরই সগোত্র, আপাত পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মূল গড়ন যে একই, বিচিত্র তথ্যের সমাহারে এ-তত্ত্বও সপ্রমাণ হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন যুগের বিচারহীন মিথ্যা সংস্কার ঝেঁটিয়ে বিদায় করবার পক্ষে এ-ত্রটি প্রমাণই যথেষ্ট নয়। তার জন্য বহিরঙ্গ লক্ষণের স্থূল যবনিকা ভেদ করে আমাদের পৌঁছতে হবে প্রাণতত্ত্বের গোড়ার কথায়।

এ-যুগের কোন-কোনও আবিষ্কার হতে যে-তত্ত্বের সন্ধান মেলে, তার দীপ্ত আলোকে জড়াশ্রিত প্রাণের রহস্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অনেকখানি। এদেশেরই একজন প্রখ্যাত জড়বিজ্ঞানী, অভিঘাতে সাড়া দেওয়াই যে প্রাণ-সত্তার অবিসংবাদিত পরিচয়—এই তত্ত্বের 'পরে জোর দিয়েছেন বিশেষ করে। তাঁর আহরিত তথ্য উদ্ভিদের জীবনরহস্যের 'পরে করেছে বিশেষ আলোক-পাত, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সকল প্রবৃত্তিরই নিয়েছে নিবিড় পরিচয়। শুধু তাই নয় ; যেমন উদ্ভিদে তেমনি ধাতুখণ্ডেও আবিষ্কার করেছেন তিনি প্রাণের সেই একই লক্ষণ—তারও সাড়া দেয় অভিঘাতে ; প্রাণের যে অনুপ ছন্দকে বলি জীবন আর প্রতীপ ছন্দকে বলি মরণ, তারও দোলা আছে তাদের মধ্যে।*

* Life Divine গ্রন্থে Life অধ্যায় থেকে।